শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী



রবীন্দ্র-রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



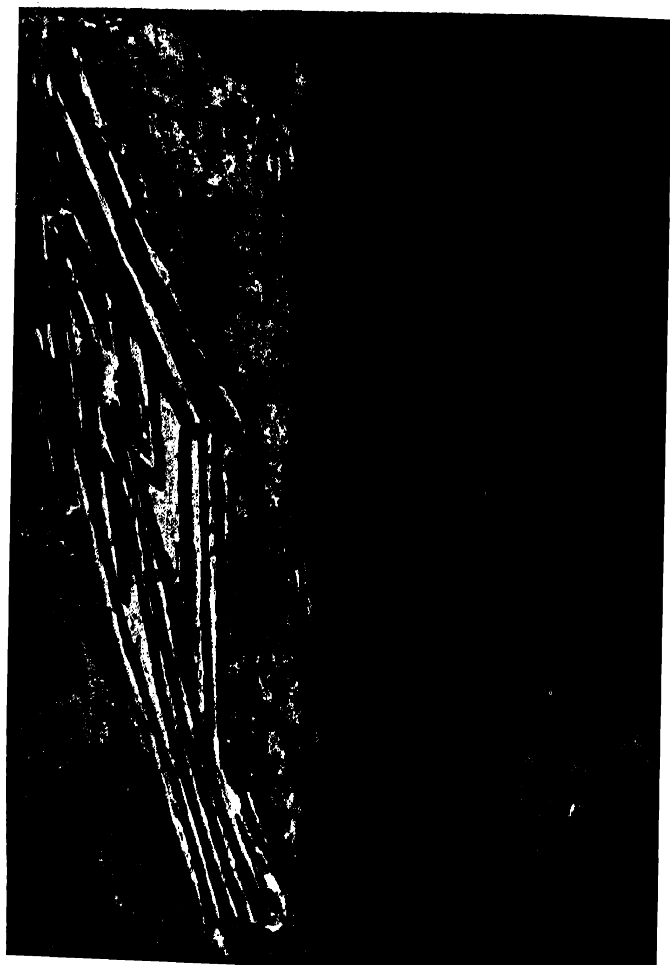
বিশ্বভারতী

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৫
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২
বৈশাখ ১৪০৯

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৬৬ গ্রে স্ট্রীট। কলকাতা ৬



চিত্রসূচী

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধুলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
জানিনা তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা ও গান

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি ;
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্রনির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্‌বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

[শান্তিনিকেতন]
[ভাদ্র ?] ১৩৩৬

মহুয়া

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এল চলি,
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করুণ কুন্দকলি ।
উত্তর বায় একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল—
গেল তারে দলি দলি ।

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান' ।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জানো ।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি 'কে আসে কী জানি',
বলে মর্মরে 'অতিথির তরে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনো' ।

নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে ।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে ।
ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে ।

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি ।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি ।

অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি ।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে ।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে ।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় করে নিতে ।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
সৃষ্টি তাহার খেলা ।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা ।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা ।

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়' ;
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে ।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থরথর করি উঠুক পরান
প্রান্তরে পর্বতে ।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়—
'করো ত্বরা, করো ত্বরা ।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা ।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে
মধুপের মনোহরা ।'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন-ভরে—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয়সংগীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী।

[শান্তিনিকেতন]
দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব 'মাভৈঃ মাভৈঃ',
বন্দীরা পেল ছাড়া।
দিগন্ত হতে শুনি তব সুর
মাটি ভেদ করি উঠে অঙ্কুর,
কারাগারে দিল নাড়া।
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমের মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া।

কিশলয়দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে।
মুক্তির গানে কাঁপে চারি ধার,
কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেল সব টুটে।

মরুযাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে
জাগে মৌমাছিপাড়া ।

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ ।
মৃত্যুদমন শৌর্য আপন
কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,
তূণ তব নিঃশেষ ।
বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া ।

জড়দৈত্যের সাথে অনিবার
চিরসংগ্রামঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে—
মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে
সিন্ধুর তটে তটে ।
হে অজেয়, তব রণভূমি-'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণবায়ু মর্মর স্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া ।

[শান্তিনিকেতন]
দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪

বরযাত্রা

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে ।
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে ।

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি ।

ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি।

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকরগুঞ্জিত
কিশলয়পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

কিংশুককুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গিতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

[শান্তিনিকেতন]
দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪

মাধবী

বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
অজানা পান্থের লাগি
নিশি নিশি ছিল জাগি,
দিনে দিনে ভরেছিল অর্ঘ্য।
কাননের একভিতে
নিভৃত পরানটিতে
রেখেছিল মাধুরীর স্বর্গ।
ফাল্গুন পবনরথে
যখন বনের পথে
জাগালো মর্মর-কলছন্দ,
মাধবী সহসা তার
সঁপি দিল উপহার,
রূপ তার, মধু তার, গন্ধ।

[শান্তিনিকেতন]
দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে।
নীরবে রয় অলস মন,
আঁধারময় ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে!
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বিপুল বিদ্রোহে।

কানন-'পব ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।
যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ওই বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনাদান বহে।

বৈশাখ ১৩৩৩ ?

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উল্লাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে,
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি,
আসে নি কি।'

আবার কখন্‌ এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণশব্দে মেতে ।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে,
'সে কি আসে ।'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষগণন হয় না কি মোর সারা ।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
'সে কি এল ।'

চৌরঙ্গি [কলিকাতা]
২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫

অর্ঘ্য

সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙায়ে,
অরুণ আলোর ঝংকার মোর
লাগলো গায়ে ।
অঞ্চলে মোর কদমফুলের ভাষা
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্‌ আশা,
কৃষ্ণকলির হেমাঞ্জলির
চঞ্চলতা
কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায়
মিলায় কথা ।

আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা ।
আজ আসে দিন প্রথম দেখার
দোলন-লাগা ।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগলপ্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায়
নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থপাখির
ডানার ডাকে ।

চলব ডালায় আলোকমালায়
প্রদীপ জ্বেলে,
ঝিল্লিঝনন অশোকতলায়
চমক মেলে।
আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে
আপনাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
ফাগুনবনের গুপ্ত ধনের
আভাস-ভরা,
রক্তদীপন প্রাণের আভায়
রঙিন-করা।

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম
অগ্নিশিখা,
প্রথম ধরায় সেই যে পরায়
আলোর টিকা।
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্‌বোধনী,
প্রাণদেবতার মন্দিরদ্বার
যাক রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।

[কলিকাতা]
২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫

দ্বৈত

আমি যেন গোধূলিগগন
ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হয়ে ধরা-পানে চাই ;
কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তরভূমি।
তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি
বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া।
স্তব্ধ হিয়া
শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা,
বিস্মরিল আপনার সূর্যচন্দ্রতারা।

তোমার মঞ্জরী
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝরি ;
তোমার পল্লবদল
কভু স্তব্ধ, কভু-বা চঞ্চল।

একেলার খেলা তব
আমার একেলা বক্ষে নিত্যনব ।
কিশলয়গুলি
কম্পমান করুণ অঙ্গুলি—
চায় সন্ধ্যারক্তরাগ,
আলোর সোহাগ ;
চায় নক্ষত্রের কথা,
চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা ।

[কলিকাতা]
২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে ।
সেথায় কখন্ অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে ।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে,
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় ম'জে ।

আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে ।

শ্রাবণ ১৩৩৫ ?

উপহার

মণিমালা হাতে নিয়ে
দ্বারে গিয়ে
এসেছিনু ফিরে
নতশিরে ।

ক্ষণতরে বুঝি
বাহিরে ফিরেছি খুঁজি
হায় রে বৃথাই
বাহিরে যা নাই।
ভীরু মন চেয়েছিল ভুলায়ে জিনিতে,
হীরা দিয়ে হৃদয় কিনিতে।

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ;
কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তারে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাতসম।
পায়ে দিব তার
যে-এক মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।

[কলিকাতা]
২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫

শুভযোগ

যে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরণী,
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধন্য-ধন্য ধ্বনি
মন্দ্রিয়া উঠিল কূলে কূলে ;
নদীর গদ্‌গদ বাণী অশ্রুবেগে উঠে ফুলে ফুলে
কোটালের বানে,
কী চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে ;
সে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে।

যে বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে ;
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,

পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা।
উচ্ছ্বসিত সে এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে।

চৌরঙ্গি [কলিকাতা]
২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫

মায়া

চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব
চুপে চুপে।
সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের
ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে।

সেথায় নিয়ে যাব আমার
দীপশিখা,
গাঁথব আলো-আঁধার দিয়ে
মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
পরিয়ে দেব চুলে—
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
কী বিস্মৃতির।

পরশ মম লাগবে তোমার
কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
বসন্তবাহার,
পূরবী কি ভীমপলাশি
রক্তে দোলে—
রাগরাগিণী দুঃখে সুখে
যায়-যে গ'লে।

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর।

[কলিকাতা]
২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ঝরিণী

ঝর্‌না, তোমার স্ফটিকজলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।
তারি এক ধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে, দুলায়ো তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি—
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।

[বাঙ্গালোর
আষাঢ় ১৩৩৫]

শুকতারা

সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য,
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ন।

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।

যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

Ballabrooie
বাঙ্গালোর
২৩ জুন ১৯২৮

প্রকাশ

আচ্ছাদন হতে
ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে।
অজ্ঞাত ছিলাম এতদিন
পরিচয়হীন—
সেই অগোচরদুঃখভার
বহিয়া চলেছি পথে ; শুধু আমি অংশ জনতার।
উদ্ধার করিয়া আনো,
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
যেথা আমি একা
সেথায় নামুক তব দেখা।
সে মহানির্জন
যে গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন,
সেইখানে আনো আলো,
দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
যাক লজ্জা ভয়,
আমার সমস্ত হোক তব দৃষ্টিময়।

ছায়া আমি সবা-কাছে, অস্ফুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে।
তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ।
সত্য যদি হই তোমা-কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে,
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার।
বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে।

[কলিকাতা]
২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার
অঙ্গমাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-
মালার সাজে ।
নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে,
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
মরিব লাজে—
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে ।

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া
বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে ।
মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হোক-না সারা ।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে—
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে ।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫

মুক্তি

ভোরের পাখি নবীন আঁখিদুটি
পুরানো মোর স্বপনডোর
ছিঁড়িল কুটিকুটি ।
রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি,
বিজুলি হানি দৈববাণী
বক্ষে উঠে দুলি ।

ঘাসের ছোঁওয়া তৃণশয়নছায়ে
মাটির যেন মর্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে ;
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি
মিলি সকলে কী কোলাহলে
বক্ষে এল জুটি ।

ভোরের পাখি নবীন আঁখিদুটি
গুহাবিহারী ভাবনা যত
নিমেষে নিল লুটি ।
কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিল লীলাভরে ।
দুয়ারখোলা পুরানো খেলাঘরে—
যেখানে বসে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি ।
প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
খেপামি এল ছুটি,
লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ
সকলি গেল টুটি ।

ভোরের পাখি নবীন আঁখিদুটি
শুকতারাকে যেমনি ডাকে
প্রাণে সে উঠে ফুটি ।
অরুণরাঙা চেতনা জাগে চিতে—
ঝুমকোলতা জানায় কথা
রঙিন রাগিণীতে ।
মনের 'পরে খেলায় বায়ুবেগে
কত-যে মায়া-রঙের ছায়া
খেয়ালে-পাওয়া মেঘে ;
বুলায় বুকে ম্যাগ্‌নোলিয়া
কৌতূহলী মুঠি,
অতি বিপুল ব্যাকুলতায়
নিখিলে জেগে উঠি ।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

উদ্‌ঘাত

অজানা জীবন বাহিনু,
রহিনু আপন মনে,
গোপন করিতে চাহিনু—
ধরা দিনু দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে ছিনু কেবলি,
তুমি কেন এসে সহসা
দেখে গেলে আঁখিকোণে
কী আছে আমার মনে।

গভীর তিমিরগহনে
আছিনু নীরব বিরহে,
হাসির তড়িৎ-দহনে
লুকানো সে আর কি রহে।
দিন কেটেছিল বিজনে
ধেয়ানের ছবি সৃজনে
আনমনে যেই গেয়েছি
শুনে গেছ সেইখনে
কী আছে আমার মনে।

প্রবেশিলে মোর নিভৃতে,
দেখে নিলে মোরে কী ভাবে,
যে দীপ জ্বেলেছি নিশীথে
সে দীপ কি তুমি নিভাবে।
ছিল ভরি মোর থালিকা,
ছিঁড়িব কি সেই মালিকা।
শরম দিবে কি তাহারে
অকথিত নিবেদনে
যা আছে আমার মনে।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।
বনের মন্দির-মাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে,

অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল বহে যায়,
নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ ।

দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখেছে আকাশ-পাতে
এ দেখার আশ্বাস-অক্ষর ।
অস্তিত্বের পারে পারে
এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে ।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি
আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে ।

বোলো আজি তারে,
'চিনিলাম তোমারে আমারে ।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারংবার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে ।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি
আমার গুণ্ঠনখানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার ।'

বোলো তারে আজ—
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে
সেদিন দেখেছ শুধু অমা ।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য কোরো ক্ষমা ।'

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খনির নূতন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
বেঁধেছি তার।
যেমন নূতন বনের দুকূল,
যেমন নূতন আমের মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের
নূতন দ্বার—
তেমনি আমার নবীন রাগের
নবযৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া
বীণার তার।
যে বাণী আমার কখনো কারেও
হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন
নৃত্যকলা।
আজি অকারণ মুখর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল
মনের ভার—
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?
কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু-'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে ?
তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।

করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী ;
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে ।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর ।

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না ;
মহা-আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক্‌,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন-অঞ্জলি ।

[বাঙ্গালোর]
আষাঢ় ১৩৩৫

অপরাজিত

ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ ?
আমি কি করি ভয় ।
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি জয় ।
বিঘ্নভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল,
তোমার আঁখি-বিজুলি-ঘাতে হবে না নিষ্ফল ।

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে,
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল,
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে ।
দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাতি,
শ্রবণ রহে পাতি ।

কঠিনতর যবে সে পণ দারুণ উপবাসে
এমনকালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভক্ষণ ;
পূর্ব গিরি-আড়াল হতে বাড়ায় তার পাণি,
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী,
নমিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি,
অশ্রুবারিবন্যা নামে ধরণী যায় ভাসি ।

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক ।
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার ।
অচল গিরিশিখর-'পরে সাগর করে দাবি,
ঝর্না পড়ে নাবি ;
সুদূর দিক্‌রেখার পানে চায়,
অকূল অজানায়
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
নহে গো, নহে নহে ;
এড়ায়ে যাবে বলি
কত-না আঁকাবাঁকার পথে চলে সে ছলছলি ;
বিপুলতর হয় সে ধারা, গভীরতর সুরে,
যতই আসে দূরে ;
উদারহাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা—
একদা শেষে পলাতকার খেলা
বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা—
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা ।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে ।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি ।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি ।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—
তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন-মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—
তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেন্‌ড্রন্-গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।

পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত ।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত ।

[বাঙ্গালোর]
আষাঢ় ১৩৩৫

দূত

ছিনু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে ।
হেনকালে নির্জন কুটিরদ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি, দ্বার-খোলো ।

মনে হল
ওই যেন তোমারি স্বর শুনি,
ওই যেন দক্ষিণবায়ু দূরে ফেলি মদির ফাল্‌গুনী
দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে,
পাঠালো নির্ঘোষ তার বজ্রধ্বনিমন্দ্রিত মল্লারে ।
কেঁপেছিল বক্ষতল
বিলম্ব করি নি তবু অর্ধ পল্‌ ।

মুহূর্তে মুছিনু অশ্রুবারি,
বিরহিণী নারী,
ছাড়িনু ধেয়ান তব তোমারি সম্মানে,
ছুটে গেনু দ্বার-পানে ।
শুধালেম, তুমি দূত কার ।
সে কহিল, আমি তো সবার ।
যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে ।
আনিলাম অর্ঘ্যথালি,
দীপ দিনু জ্বালি ।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে ।

[কলিকাতা]
২০ অগস্ট ১৯২৮

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে ;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায় ;
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষুকটাক্ষচ্ছটায় ।

সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী,
কদম্বের ডালি ।
বাদলের বিষণ্ণ ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে ।

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে,
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধুলায় ।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার ।

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী,
একটি কেতকী !
তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা ।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে ।

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া ।
শুধালেম আমি কৌতূহলী
'কী এনেছ' বলি ।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত ।

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে ।

চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।
সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে সম্মান
তাই তব দান।

চৌরঙ্গি [কলিকাতা]
২০ অগস্ট ১৯২৮

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল,
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল ;
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দু দিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাসো যদি বেসো।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী ;
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতিতলে।

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
মার্জনা করো যদি পাব তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তার বেশি দিলে।

দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে ।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে ।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে ।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয় ।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয় ।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে ।

শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গাপাশে ।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ ।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী ।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে ।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা ।

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে ;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র-পাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি,
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে-নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্যপ্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান ;
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্নতাপিত,
অনিদ্রায় রজনী যাপিত।
শুষ্কবাক্যবালুকার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে
পথিক ধুলায় শুয়ে পড়ে।

নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।

ধূসর প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে
নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো-আঁধারের পাকে না মিলে কিনারা,
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।
যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক বিধির ধিক্কারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধূলিতে-খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে-ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য ব'লে জানি,
ভাবি, দুর্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি,
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

১৭ অগস্ট ১৯২৮

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে
যেদিন গৈরিকবস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা ?
প্রাঙ্গণের চারি ধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে

ছায়ার আসন মেলি ;
পরি লয় নূতন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন ।
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে ।
যেদিন প্রণয়ীবক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে ।—
নহে নহে, সেদিন তো নহে ।

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে,
শুধায় সে মল্লিকারে কাঞ্চন-রঙ্গনে,
তুমি কবে এলে ।
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্যগৌরবে ।
কলরবে
অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের সঙ্গে ধ্বনির সংগম ;

অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতিসংঘ আনে পাখায় পাখায়
চিত্রলিপি, কুসুমেরি বিচিত্র অক্ষরে ;
ধরণী যৌবনগর্বভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবির বীণার তন্ত্র যে বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে ।
আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্চহাসে
ধৈর্য নাহি রহে ।—
নহে নহে, সেদিন তো নহে ।

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হয় ধনে ।
প্রাচুর্যপ্রশান্ত তট পেয়েছে সঙ্গিনী
তরঙ্গিণী—
তপস্বিনী সে-যে, তার গম্ভীর প্রবাহে
সমুদ্রবন্দনাগান গাহে ।

মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ
বন্ধমুক্ত নির্মল আলোক ।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে ।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
অপ্রগল্‌ভা ধরিপূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে ।
দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি ।
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে ।

১৯ অগস্ট ১৯২৮

সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে ।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে ।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী ।'

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে,
শুধালে, 'কেন এলে ।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে ।'
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল ।

দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
'অতিথি আমি', কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিতকরে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে, কহিলে, 'কেন এলে।'
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।'
চাহিলে হাসিমুখে,
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণচাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোকছায়া শিবশিবানী সাগরজলে দোলে।

ফুরালো দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতনভরা তরী।
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।

দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিত কল্লোলে ।

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি ।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে ;
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে ।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না ।

মায়ার জাহাজ
১ অক্টোবর ১৯২৭

বরণ

পুরাণে বলেছে
একদিন নিয়েছিল বেছে
স্বয়ম্বরসভাঙ্গনে দময়ন্তী সতী
নল-নরপতি
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে ।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে ।
দেবমূর্তি চিনেছে সেদিন,
তারা যে ফেলে না ছায়া, তারা অমলিন ।
সেদিন স্বর্গের ধৈর্য গেল টুটি,
ইন্দ্রলোক করিল ভ্রূকুটি ।

তাই শুনে কত দিন একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে,
আমি হব স্বয়ম্বরা বিশ্বসভাতলে,
দেবতারই গলে
দিব মালা তপস্বিনী,
মানবের মাঝখানে একদিন লব তারে চিনি ।
তারি লাগি সর্ব দেহে মনে
দিনে দিনে বরমাল্য গাঁথিব যতনে ।

কঠিন সে পণ,
ভাবি নি কেমনে তারে করিব সাধন ।
মানুষ-যে দেশে দেশে
কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে ;

ললাটে তিলক কারো লেখা,
দেখিতে দেখিতে ওঠে কালো হয়ে তার স্বর্ণরেখা।
কারো-বা কটিতে বাঁধা শরশূন্য তূণ,
কেহ করে বজ্রধ্বনি, নাহি তাহে বজ্রের আগুন।
বাতায়নে বসে থাকি,
কতদিন কী দেখিয়া আশ্বাসে চমকি উঠে আঁখি;
চেয়ে চেয়ে দ্বিধা লাগে শেষে
বৃষ্টি হতে হতে দেখি শিলা পড়ে এসে।

একদিন রৌদ্রের বেলায়
মধ্যাহ্নের জনতার মুখর মেলায়
রাজপথ-পাশে
দাঁড়াইনু— দেখিলাম যারা যায় আসে
তাহাদের কায়া
সম্মুখে ফেলিয়া চলে দীর্ঘতর ছায়া।
শুনিলাম স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর
ছিন্ন করে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর।
উজ্জ্বল সজ্জায়
দীন অঙ্গ সমাচ্ছন্ন ধনের লজ্জায়।
ছুটে চলে অশ্বরথ,
তার চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

যখন সেদিন সেই ঊর্ধ্বশ্বাস লুব্ধ ঠেলাঠেলি
নানা শব্দে উঠিছে উদ্‌বেলি
তুমি দেখি পথপ্রান্তে একা হাস্যমুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে
চেয়ে আছ—হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।
তুমি যেন মহাকালসমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান-মাঝে উমার ভৈরবী।
রহে গেল জনতার ঢেউ,
কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ।
একা আমি দেখেছি তোমারে—
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার পানে চেয়ে।
মোর স্বয়ম্বরে
সেদিন মর্তের মুখ ভ্রূকুটিল অবজ্ঞার ভরে।

২৬ অগস্ট ১৯২৮

পথবর্তী

দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি ।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি ।
হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার,
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে ।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে ।

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে ।
ক্লান্তি কিছু-বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল-ঘেরে ।
যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
আমি তারি মাঝে থেকে
দিনু পথ-'পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে ।
মোর পরিচয়ে তোমার পথের
কিছু রহে পরিচয় ।
তব রচনায় তব ভকতের
কিছু বাণী মিশে রয় ।
তোমার মধ্যদিবসের তাপে
আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
মোর পল্লব সে মন্ত্র জাপে
গভীর যা তব মনে,
মোর ফলভার মিলানু তোমার
সাধনফলের সনে ।

বেলা চলে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথাই দাঁড়ায়ে রব ।
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চিরবরণীয়,

তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়,
না মানিব পরাভব।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা-কিছু আমার সব।

২৭ অগস্ট ১৯২৮

মুক্তরূপ

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।
তোমার পাখারে আমি রুদ্ধ করি বুঝি,
সে বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি,
তুমি তো ছায়ার নহ, প্রভাতবিলাসী,
আলোতেই তোমার প্রকাশ,
তোমার ডানার ছন্দে তব উচ্চ হাসি
যাক চলে ভেদিয়া আকাশ।

জানি, যদি লুব্ধ মনে কৃপণতা করি,
ঐশ্বর্যেও দৈন্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাণ্ডারের তবে রহিব প্রহরী,
বঞ্চনা করিব আপনায়।
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কি আমার জীবন।
গাঁথিব কি বুদ্‌বুদের হার।
তোমারে আড়াল ক'রে তোমার স্বপন
মিটাবে কি আকাঙ্ক্ষা আমার।

বিরাজে মানবশৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্তে সে তিমিরজয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন, সে তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারও জীবনজয়লিখা।

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো,
মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়
জ্বালিবে মশাল তব, আতঙ্কদুঃসহ
রাত্রিরে দহি সে যেন যায় ।
তোমারে করিনু দান শ্রদ্ধার পাথেয়,
যাত্রা তব ধন্য হোক, যাহা কিছু হেয়
ধূলিতলে হোক ধূলি, দ্বিধা যাক মরি,
চরিতার্থ হোক ব্যর্থতাও,
তোমার বিজয়মাল্য হতে ছিন্ন করি
আমারে একটি পুষ্প দাও ।

২৯ অগস্ট ১৯২৮

স্পর্ধা

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না ।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে, বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার
কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ সে প্রার্থনা জানায় ;
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া— ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু । গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনাবিকার তার শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি ।— যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কশাঘাত ! জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
অসহ্য সে অপমানে । নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান ।

জোড়াসাঁকো
৩০ অগস্ট ১৯২৮

রাখিপূর্ণিমা

কাহারে পরাব রাখি যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়,
হে মোর ভাগ্যের দেব ? লগ্ন যেন বহে নাহি যায় ।
মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর, ঘনবৃষ্টি-আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে,
বুঝিতে পারে না ভালো । আমি ভাবিতেছি একা বসে,
আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে

চিহ্নহীন পথে । এসেছিল দ্বারের সম্মুখে মোর
ক্ষণতরে । তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর,
হৃদয় অস্ফুট ছিল অর্ধ জাগরণে । ডাকে নি সে
নাম ধরে, দুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
সমুদ্রতরঙ্গরবে তাহার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ।
হে বীর অপরিচিত, শেষ হল আমার রজনী,
জানা তো হল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্ঝনি । আমি রহিনু জাগিয়া ।

৩১ অগস্ট ১৯২৮

আহ্বান

কোথা আছ ! ডাকি আমি । শোনো, শোনো, আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব । আমি নহি তোমার বন্ধন—
পথের সম্বল মোর প্রাণে । দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে— উপবাসহিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন ; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে ঊর্ধ্ব-পানে । আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে—
যথা রুক্ষ রিক্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্দাম নির্ঝরে ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,
শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তরমুষ্টিতলে দৃঢ়বলে রাখে সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি । সহাস্য উজ্জ্বল গতি তার
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্যের আধার ।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

বাপী

একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে ।
আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি,
শুধালেম, কাছে বসিতে দিবে কি ।
সেদিন তোমার ঘরে ফিরিবার বেলা
বহে গেল বুঝি, কাজে হয়ে গেল হেলা ।

অদূরে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে
পূর্ব যুগের পূজাহীন দেবতারে
প্রভাত-অরুণ প্রতিদিন খোঁজে,
শূন্য বেদির অর্থ না বোঝে,
দিন শেষ হলে সন্ধ্যাতারার আলো
যে পূজারী নাই তারে বলে, দীপ জ্বালো।

একদিন বুঝি দূরে কোন্ রাজধানী
রচনা করেছে দীর্ঘ এ পথখানি।
আজি তার নাম নাই ইতিহাসে ;
জীর্ণ হয়েছে বালুকার গ্রাসে,
প্রান্তরশেষে শীর্ণ বনের কোলে
জনপদবধূ জল নিয়ে যায় চলে।

লুপ্তকালের শুষ্কসাগর-ধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
হারানো ভাষার নিশার স্বপ্নছায়ে
হেরিনু তোমায়, আসিনু ক্লান্ত পায়ে।

শুধু দুটি তরু মরুর প্রাণের কথা,
লুকানো কী রসে বাঁচে তার শ্যামলতা।
সেদিন তাহারি মর্মর-সনে
কী ব্যথা মিশানু, জানে দুইজনে ;
মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্ পাখি
হতাশ পাখার হাহাকার-রেখা আঁকি।

তপ্ত বালুরে ভর্ৎসিয়া মুহু মুহু
তাপিত বাতাস চিৎকারি উঠে হুহু ;
ধূলির ঘূর্ণি, যেন বেঁকে বেঁকে
শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে ;
রূঢ় রুদ্র রিক্তের মাঝখানে
দুইটি প্রহর ভরেছিনু প্রাণে গানে।

দিন শেষ হল, চলে যেতে হল একা,
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা।
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি ম্লান,
তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জান
অসীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি।

তার পরে কত দিন চলে গেল মিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে।

বহু পরে যবে ফিরিলাম প্রিয়ে,
এ পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগলতরু।
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু।

এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
একটি দিনের দুর্লভ সেই ক্ষণ
চিরকাল ভরি রহিল লুকানো,
ওগো অগোচরা জান নাহি জান ;
আর কোনো দিনে অন্য যুগের প্রিয়া
তারে আর-কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

মহুয়া

বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি।
নাহি ঘুচিবে কি
অশোকের অতিখ্যাতি, বকুলের মুখর সম্মান।
ক্লান্ত কি হবে না কবিগান
মালতীর মল্লিকার
অভ্যর্থনা রচি বারংবার ?
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধ্বে ধরে।
আমি তো দেখেছি তোরে
বনস্পতিগোষ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভায়
অকুণ্ঠিত মর্যাদায়
আছিস দাঁড়ায়ে ;
শাখা যত আকাশে বাড়ায়ে

শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস গম্ভীর বন্দন।
অপ্রসন্ন আকাশের ভ্রূভঙ্গে যখন
অরণ্য উদ্‌বিগ্ন করি তোলে,
সেই কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে
শাখাব্যূহে ঘিরে
আশ্বাস করিস দান শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে।

অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দিনে,
বিশীর্ণ বিপিনে,
বন্যবুভুক্ষুর দল ফেরে রিক্ত পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে।

বহুদীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত
তপস্বীর মতো
বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীন,
সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস মদিরা
পুষ্পপুটে;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পূর্ণিমার নৃত্যমত্ততারই।
রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে—
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব 'মহুয়া' নাম ধরে।

[জোড়াসাঁকো]
৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

দীনা

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।
মোর স্পর্শে বাজে
যে-তন্ত্রটি তোমার বীণায়,
তাহারি পঞ্চম স্বরে তোমারে কি নিঃশেষে চিনায়
তোমার বসন্তরাগে,
নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে।
সে তন্ত্র সোনার বটে— বিভাসে ললিতে
যে কথা সে চেয়েছে বলিতে
তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন-অঞ্জলি।
তবু সত্য করে বলি,
ব্যথা লাগে বুকে
যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে
নিভৃতে তোমার ঘরে
স্বপ্নভাঙা প্রথম প্রহরে—

যখন জাগে নি পাখি, রক্তিম আকাশে
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্যোদয়-আশে
রয়েছে স্তম্ভিত,
পিঙ্গল আভায় দীপ্ত জটা-বিলম্বিত
অরুণ সন্ন্যাসী
করজোড়ে আছে স্থির আলোকপ্রত্যাশী—
তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে,
জেনেছি হৃদয়ে
তুমিই অচেনা।
কোনো দিন ফুরাবে না
পরিচয়; তোমারে বুঝিব আমি করি না সে আশা,
কথায় যা বল নাই, আমি-যে জানি না তার ভাষা।

ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা,
দেখ দূর হতে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা।
তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর,
হোয়ো না কঠোর।
তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক, তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করি নি আমি কভু।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কি মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।
নহে নহে, হে রাজন, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি;
যদি তাই পূর্ণ হয়, তবে আমি নহি তো অভাগী।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

সৃষ্টিরহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব,
নিখিলের অস্তিত্বগৌরব।
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলালো।

যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।
সেই সৃষ্টিতপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে
স্পর্শ করে যবে তব মুখে মেলি আঁখি
সম্মুখে তোমার বসে থাকি।

২০ অগস্ট ১৯২৮

নাম্নী

শামলী

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে;
তরঙ্গের ভঙ্গি নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোটো করে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-'পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাঙ্গ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।
মধ্যদিনে বাতায়নতলে
চেয়ে দেখে নিম্নে দিঘিজলে
শৈবালের ঘন স্তর,
পতঙ্গের খেলা তারি 'পর।
আবছায়া কল্পনায়
ভাষাহীন ভাবনায়
মন তার ভরে
মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্মরে।

সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট-কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি—
নাম কি শামলী ।

কাজলী

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা ।
সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,
অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী ।
যে-পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
ক্লিষ্ট ক্লান্তিভারে,
সেই অজানার লাগি গৃহকোণে আনতনয়ন
বুনিছে শয়ন ।
সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘিজল
অচঞ্চল
কানায়-কানায়-ভরা,
শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা ।
কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে
স্তব্ধ ছায়া পাতি
হাসির খেলার সাথি
সুগভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা-অঞ্জলি—
নাম কি কাজলী ।

হেঁয়ালি

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায় ।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলই আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায় ;
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায় ।

সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া।
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে।
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।
তার পরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;
আপনার অভিমানে করে খানখান।

কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা।
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে।
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে
আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ,
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি—
নাম কি হেঁয়ালি।

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের খেতের পরপারে—
নিরালা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অন্ধকারে
যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
প্রসারিয়া চলেছে সংকেত
অজানা গ্রামের,
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের।
অপরাহ্নে ছাদে বসি
এলোচুল বুকে পড়ে খসি,
গ্রন্থ নিয়ে হাতে
উদাস হয়েছে মন সে যে কোন্ কবিকল্পনাতে।
সুদূরের বেদনায়
অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।
বীরের কাহিনী
না-দেখা জনের লাগি তারে যেন করে বিরহিণী।

পূর্ণিমানিশীথে
স্রোতে-ভাসা একা তরী যবে সকরুণ সারিগীতে
ছায়াঘন তীরে তীরে সুপ্তিতে সুরের ছবি আঁকে
উৎসুক আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে
নিষুপ্ত প্রহরে,
অহৈতুক বারিবিন্দু ঝরে
আঁখিকোণে ;
যুগান্তরপার হতে কোন্ পুরাণের কথা শোনে ।
ইচ্ছা করে সেই রাতে
লিপিখানি লেখে ভূর্জপাতে
লেখনীতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালি—
নাম কি খেয়ালী ।

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ—
নিত্য বহমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
চারি ধারে
প্রত্যহের জড়তারে ;
সংগীতের তরঙ্গ তুলি
হাসিতে ফেনিল তার ছোটো দিনগুলি ।
আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গি কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—
যে কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায় ;
যে কথাটি ঢেউ তোলে
আশ্বিনে ধানের খেতে, প্রান্ত হতে প্রান্তে যায় চলে ;
যে কথাটি নিশীথতিমিরে,
তারায় তারায় কাঁপে অধীর মির্মিরে ;
যে কথাটি মহুয়ার বনে
মধুপগুঞ্জনে
সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি—
নাম কি কাকলী ।

পিয়ালী

চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায়ে লতায়ে যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে;
নির্বাক চাহিয়া থাকে, নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কী-যে দেবে।
দুয়ারবাহিরে
আসে ধীরে,
ক্ষণেক নীবর থেকে চলে যায় ফিরে।
নাও যদি কয় কথা
মনে যেন ভরি দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা।
পায়ের চলায়
কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়।
তারে কিছু করিলে জিজ্ঞাসা
কিছু বলে, কিছু তবু বাকি থাকে ভাষা।
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি—
নাম কি পিয়ালী।

দিয়ালী

জনতার মাঝে
দেখিতে পাই নে তারে, থাকে তুচ্ছ সাজে।
ললাটে ঘোমটা টানি
দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী।
রজনীর অন্ধকার
তুলে দেয় আবরণ তার।
রাজরানীবেশে
অনায়াসগৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে।
বক্ষে হার ঝলমলে,
সীমন্তে অলকে জ্বলে
মাণিক্যের সিঁথি।
কী যেন বিস্মৃতি
সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
মনে পড়ে আপন মহিমা।
ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
বরমাল্য তার
আপন সহস্র দীপ জ্বালি—
নাম কি দিয়ালী।

নাগরী

ব্যঙ্গসুনিপুণা,
শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা !
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রূপবিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে ।
সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খানখান
অট্টহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ;
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে ;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে ;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয় ;
মোহমন্ত্রে যে হৃদয়
করে জয়
তারি' পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয় ।
আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে ;
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে ।
বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময় ;
বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা ;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার,
বিদ্যারে করেছে অলংকার ।
প্রসাধনসাধনে চতুরা—
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গিতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে ।
জাদুকরী বচনে চলনে ;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে ;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর ;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন ।
আঁধার-আলোরি কোলে রয়েছে জাগরি—
নাম কি নাগরী ।

সাগরী

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে—
উচ্চহাস্যতরঙ্গ সে হানে
সূর্যচন্দ্র-পানে।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক।
কভু অন্ধকারপুঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।
গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি—
নাম কি সাগরী।

জয়তী

যেন তার চক্ষু-মাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।
ইন্দ্রের অশনি
মৌনে তার ঢাকা;
প্রাণ তার অরুণের পাখা
মেলিল দিনের বক্ষে তীব্র অতৃপ্তিতে
দুঃসহ দীপ্তিতে।
সাধক দাঁড়ায় তার কাছে,
সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে;
দুঃসাধ্যসাধন-তরে
পথ খুঁজে মরে।
তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন;
এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মাল্য; দিবে কণ্ঠে তার
কার্মুকে যে দিয়েছে টংকার,
কাপট্যেরে হানিয়াছে, সত্যে যার ঋণী বসুমতী—
নাম কি জয়তী।

ঝামরী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্ত্যের প্রদীপে নিল মৃত্তিকার কারা।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গিহীন তরু,
তারে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়।
মন পাখা মেলিবারে চায়,
চারি দিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তার ;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
পথ রুদ্ধ চারি ধারে—
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা।
সে যেন অশোকবনে-সীতা,
চারি দিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয় ;
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
বিচ্ছেদের অতল সমুদ্র-পারে।
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে।

কোন্ দেব নিত্যনির্বাসনে
পাঠালো তাহারে !
স্বর্গের বীণার তারে
সংগীতে কি করেছিল ভুল।
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু ?
আজও তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
অধরে রয়েছে তার ম্লান—
সন্ধ্যার গোলাপ-সম—
মাঝখানে-ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।
অদৃশ্য যে অশ্রুধারা
আবিষ্ট করেছে তার চক্ষুতারা,
তাহা দিব্য বেদনার করুণানির্ঝরী—
নাম কি ঝামরী।

মুরতি

যে শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা,
যে গুণী প্রজাপতির পাখা
যুগ যুগ ধ্যান করি একদা কী খনে
রচিল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে—
এই নারী
রচনা তাহারি।
এ শুধু কালের খেলা
এর দেহ কী আলস্যে বিধাতা একেলা
রচিলেন সন্ধ্যাকালে
আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেয়ালে—
যে-লগনে
কর্মহীন ক্লান্তক্ষণে
মেঘের মহিমামায়া মুহূর্তেই মুগ্ধ করি আঁখি
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি।
শরতে নদীর জলে যে-ভঙ্গিমা,
বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে-রাগরঙ্গিমা
যৌবনের দাপে
অবজ্ঞাকটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,
শ্রাবণের বন্যাতলে হারা
ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে নৃত্যের ধারা,
মাঘশেষে অশ্বত্থের কচি পাতাগুলি
যে চাঞ্চল্যে উঠে দুলি,
হেমন্তের প্রভাতবাতাসে
শিশিরে যে ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
প্রথম আষাঢ়দিনে গুরু গুরু রবে
ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে গৌরবে
তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী—
লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি।

রঙিন বুদ্‌বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে-না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে।
মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।
ভুবনে যেখানে যত নয়নের আনন্দলহরী
তাই দেখা দিতে এল নারীমূর্তি ধরি।

সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন্ অবসরে
রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে ;
অমৃতে-মাটিতে-মেশা সৃজনের এ কোন্ সুরতি—
নাম কি মুরতি ।

মালিনী

হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে ।
প্রসন্নতা তার অন্তহীন
রাত্রিদিন
গভীর কী উৎস হতে
উচ্ছলিছে আলোঝলা কথাবলা স্রোতে ।
মর্তের ম্লানতা তারে
পারে নি তো স্পর্শ করিবারে ।
প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্যমুখী
রক্তারুণ উল্লাসে কৌতুকী ।
মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম অমলিন রাগে
প্রফুল্ল সে সূর্যের সোহাগে,
সায়াহ্নের জুঁই সে-যে,
গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতায় বাঁশি ওঠে বেজে ।
মৈত্রীসুধাময় চোখে
মাধুরী মিশায়ে দেয় সন্ধ্যাদীপালোকে ।
রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি
আনন্দহিল্লোল রাশি রাশি ;
সঙ্গহীন আঁধারের নৈরাশ্যক্ষালিনী—
নাম কি মালিনী ।

করুণী

তরুলতা
যে ভাষায় কয় কথা
সে ভাষা সে জানে—
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বলি মানে ।
পুষ্পপল্লবের 'পরে তার আঁখি
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি ।
স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন
কাননের অন্তরবেদন
দূর করিবার লাগি
নিত্য আছে জাগি ।

শিশু হতে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর ;
বাতাসে বৃষ্টিতে
চঞ্চলিয়া জাগে তারা অর্থহীন গীতে,
ধরণীর যে গভীরে চিররসধারা
সেইখানে তারা
কাঙাল প্রসারি ধরে তৃষিত অঞ্জলি,
বিশ্বের করুণারাশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি—
সে তরুলতারই মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তার ;
শ্যামল উদার
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারি ভিতে ;
তাহার মমতা
সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ;
পশু পাখি তার আপনার ;
জীববৎসলার
স্নেহ ঝরে শিশু-'পরে, বনে যেন নত মেঘভার
ঢালে বারিধার ।
তরুণ প্রাণের 'পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী—
নাম কি করুণী ।

প্রতিমা

চতুর্দশী এল নেমে,
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে ।
অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তারে মর্তভূমি শঙ্কা নাহি বাসে ।
এ ধরার নির্বাসনে
কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইকো তার মনে,
সংসারজনতা-মাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে ।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা,
সকল উদ্‌বেগভারহরা ।
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে ।
দুর্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে বহে যায় কত
বারে বারে,
প্রভা তার মুছিতে না পারে ।

তবু তার মহিমায় কিছু আছে বাকি,
সেইখানে রাখে ঢাকি
অশ্রুজল
বিষাদ-ইঙ্গিতে-ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল।
কণামাত্র সে-ক্ষীণতা
নাহি কহে কথা,
কেহ না দেখিতে পায়
নিত্য যারা ফিরে আছে তায়।
অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা—
নাম কি প্রতিমা।

নন্দিনী

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি।
বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু
মর্তে নিল তনু।
দিগ্‌বধূর মায়াবী অঙ্গুলি
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।
সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি
যেন শুভ্র কমলকলিকা ;
আঁখিদুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।
অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,
সে আনিয়া দেয় চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।
বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী—
নাম কি নন্দিনী।

উষসী

ভোরের আগের যে প্রহরে
স্তব্ধ অন্ধকার-'পরে
সুপ্তি-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয়
বনময়
পাঠায় নূতন জাগরণী,
অতি মৃদু শিহরণী
বাতাসের গায়ে ;
পাখির কুলায়ে

অস্পষ্ট কাকলি ওঠে আধোজাগা স্বরে,
স্তম্ভিত আগ্রহভরে
অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে—
ও কোন্ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর,
অন্তর্গূঢ় সে প্রহর
আত্ম-অগোচর।
চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তি-মাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
নির্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।
কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা আবিষ্কার।
প্রভাতমহিমা ওর সম্বৃত রয়েছে নিশ্চেতনে,
তাহারি আভাস পাই মনে।
আমি ওই রথশব্দ শুনি,
সোনার বীণার তারে সংগীত আনিছে কোন্ গুণী।
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময়;
মানসকমল একমনা
নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।
জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উল্লাসে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারি পাশে।
নিরুদ্ধ চেতনা হতে হব চ্যুত
লালসা-আবেশে জড়ীভূত
স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশ।
বিলুপ্ত করিবে দূরে উন্মুক্ত বাতাস
দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলুষনিশ্বাস।
আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি—
নাম কি উষসী।

[শ্রাবণ ?-আশ্বিন ১৩৩৫]

ছায়ালোক

যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি,
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।

সেথায় তোমার বুদ্ধি সদাই জাগে,
চক্ষে তোমার আবেশ নাহি লাগে,
আমার ভীরু হৃদয় ছায়া মাগে,
তোমার সেথায় আলোক খরতর,
যখন সেথা চাহ আমার বাগে
সংকোচে প্রাণ কাঁপে থর থর ।

মোহভাঙা দৃষ্টি তোমার যখন আঘাত হানে,
যায় নিখিলের রহস্যদ্বার টুটে,
এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে
অস্থি যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে উঠে ।
বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা
রূঢ় পাথর গোপন ক'রে রাখা,
ভিতরে তার কতই আঁকাবাঁকা
কতকালের দাহন-ইতিহাসে,
ফাটল-ধরা কত-যে দাগ আঁকা
তোমার চোখে বাহির হয়ে আসে ।

তেমনি করে যখন কভু আমার পানে চাবে
মর্মভেদী কৌতূহলের আঁখি,
বিধাতা যা লুকান লাজে দেখতে-যে তাই পাবে
মোর রচনায় যা আছে তাঁর বাকি ।
আমার মাঝে তোমার অগোচরে
আদিম যুগের গোপন গভীর স্তরে
অপূর্ণতা রয়েছে অন্তরে,
সৃষ্টি আমার অসমাপ্ত আছে,
সামনে এলে মরি-যে সেই ডরে
ভাঙাচোরা চক্ষে পড়ে পাছে ।

তোমার প্রাণে কোনোখানে নাই কি মায়ার ঠাঁই
মত্ততাহীন তত্ত্বপরপারে,
যেথায় তীক্ষ্ণ চোখের কোনো প্রশ্ন জেগে নাই
অসতর্ক মুক্ত হৃদয়দ্বারে ?
যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্তা নহ,
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি লয়ে রহ,
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
যেথা নানা মূর্তিতে মন মাতে,
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
আপন-ভোলা রসের রচনাতে ।

সেথায় আমি যাব যখন চৈত্ররজনীতে
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা,
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা ।

দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে,
চমকে উঠে বলবে তুমি, 'ও কে,
কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে,
এল আমার গানের ডাকে ডাকা।'
সে রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে
যে রূপ তোমার পরান দিয়ে আঁকা।

৯ আশ্বিন ১৩৩৫

প্রচ্ছন্না

বিদেশে ওই সৌধশিখর-'পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হতে যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক-দেখা
মনে হল তুমি অসীম একা
দাঁড়িয়েছিলে যেন আমার একটি বিজন ক্ষণে
আর কিছু নাই সেথায় ত্রিভুবনে।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নীচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের 'পরে বেণীটি লুটায়।
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আধখানি ওই দেহ,
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কী যেন সন্দেহ।
বন্দিনী কি ভোগের কারাগারে,
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে ?
সোনার বরন শস্যখেতে, কোন্-সে নদীতীরে
পূজারীদের চলার পথে, উচ্চচূড়া দেবতামন্দিরে
তোমার চিরপরিচিত প্রভাত-আলোখানি,
তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি।

কিংবা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
সেই বহুবল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি,
প্রশ্ন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে
সপ্তঋষির কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে।
হয়তো বৃথাই সাজ',
তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজও ;
তাই কি শূন্য আকাশ-পানে চাও,
উপেক্ষিত যৌবনেরি ধিক্কার জানাও ?

কিংবা আছ চেয়ে
আসবে সে কোন্ দুঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে,
বক্ষ তোমার দোলে,
রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।

স্তব্ধ আছে তরুশ্রেণী মরণছায়া ঢাকা,
শূন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্ পাখা।
আমি পথিক যাব-যে কোন্ দূরে ;
তুমি রাজার পুরে
মাঝে মাঝে কাজের অবসরে
বাহির হয়ে আসবে হেথায় ওই অলিন্দ-'পরে,
দেখবে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে
গোধূলিবেলাতে
বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
নদীর প্রান্তরেখায় যে পথ গিয়েছে হারায়ে।
তোমার ইচ্ছা চলবে কল্পনাতে
সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে
পান্থ যে জন নিত্য চলে যায়।
আমি পথিক হায়,
পিছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,
যে মুখ তোমার লুকিয়ে ছিল সে মুখ আঁকি মনে।

১০ আশ্বিন ১৩৩৫

দর্পণ

দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে
হে সুন্দরী, কী সংশয় জাগে তব উদ্বিগ্ন নয়নে।
নিজেরে দেখিতে চাও বাহিরে রাখিয়া আপনারে
যেন আর কারো চোখে ; আর কারো জীবনের দ্বারে
খুঁজিছ আপন স্থান। প্রেমের অর্ঘ্যের কোনো ত্রুটি
দেখ কি মুখের কোনোখানে। তাই তব আঁখিদুটি
নিজেরে কি করিছে ভৎসনা। সাজায়ে লইয়া সর্বদেহে
স্বর্গের গর্বের ধন, তবে যেতে চাও তার গেহে ?
জান না কি হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
পার না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া।
তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে
কঙ্কণঝংকারে আর নৃত্যালোল নূপুরনিক্বণে
নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লয়ে আত্মনিবেদন
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

ভাবিনী

ভাবিছ যে ভাবনা একা-একা
দুয়ারে বসি চুপে চুপে,
সে যদি সম্মুখে দিত দেখা
মূর্তি ধরি কোনো রূপে—
হয়তো দেখিতাম শুকতারা
দিবস পার হয়ে দিশাহারা
এসেছে সন্ধ্যার কিনারাতে
সাঁঝের তারাদের দলে,
উদাস স্মৃতিভরা আঁখিপাতে
উষার হিমকণা জ্বলে।

হয়তো দেখিতাম, বাদলে যে
শ্রাবণে এনেছিল বাণী
শরতে জলভার এল ত্যেজে
শুভ্র সেই মেঘখানি।
চলে সে সন্ন্যাসী দিশে দিশে
রবির আলোকের পিয়াসী সে,
আকাশ আপনারই লিপি লিখে
পড়িতে দিল যেন তারে,
সে তাই চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
বুঝিতে বুঝি নাহি পারে।

হয়তো দেখিতাম রজনীতে
সে যেন সুরহারা বীণা
বিজন দীপহীন দেহলিতে
মৌন-মাঝে আছে লীনা।
একদা বেজেছিল যে রাগিণী
তারে সে ফিরে যেন নিল চিনি
তারার কিরণের কম্পনে
নীরব আকাশের মাঝে,
সুদূর সুরসভা-অঙ্গনে
সুরের স্মৃতি যেথা বাজে।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

একাকী

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী—
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারই শূন্য দিল ঢাকি ।
অয়ি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথরাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে,
যে রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার ।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী,
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে আসা
দীর্ঘনিশ্বাসের ভাষা ।
মিলায়েছ, সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
যে মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে ।
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য তুষারশিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা, কোন্ তপস্বিনী বিছালো অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে উর্ধ্বে তুলি আঁখি,
তুমিও একাকী ।

১৮ আশ্বিন ১৩৩৫

আশীর্বাদ

জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে
হে নবীনা, নবরাগরক্তিম শোভাতে ।
সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু তব
জ্যোতি আজি পেল অভিনব,
চেলাঞ্চলে উদ্ভাসিল অন্তরের দীপ্যমান প্রভা,
শরমের বৃন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা ।

সাহানা রাগিণীরসে জড়িত আজি এ পুণ্যতিথি,
তোমার ভুবনে আসে পরম অতিথি ।
আনো আনো মাঙ্গল্যের ভার,
দাও বধূ, খুলে দাও দ্বার,
তোমার অঙ্গনে হেরো সগৌরবে ওই রথ আসে,
সেই বার্তা আজি বুঝি উদ্‌ঘোষিল আকাশে বাতাসে ।

নবীন জীবনে তব নববিশ্ব রচনার ভাষা
আজি বুঝি পূর্ণ হল লয়ে নব আশা।
সৃষ্টির সে আনন্দ-উৎসবে
তব শ্রেষ্ঠধন দিতে হবে,
সেই সৃষ্টিসাধনায় আপনি করিবে আবিষ্কার
তোমার আপনা-মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার।

পথ কে দেখালো এই পথিকেরে তাহা আমি জানি,
ওই চক্ষুতারা তারে দ্বারে দিল আনি।
যে সুর নিভৃতে ছিল প্রাণে
কেমনে তা শুনেছিল কানে,
তোমার হৃদয়কুঞ্জে যে ফুল ছায়ায় ছিল ফুটে
তাহার অমৃতগন্ধ গিয়েছিল বন্ধ তার টুটে।

যদি পারিতাম আজি অলকার দ্বারীরে ভুলায়ে
হরিয়া অমূল্য মণি অলকেতে দিতাম দুলায়ে।
তবু মোর মন মোরে কহে
সে-দান তোমার যোগ্য নহে,
তোমার কমলবনে দিব আনি রবির প্রসাদ,
তোমার মিলনক্ষণে সঁপিব কবির আশীর্বাদ।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী!
উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মুলতানে,
তোমারে পরালো সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল।

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে—
'কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি
তীরপানে চাহি।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
তরুণী কন্যার পানে, তরী-'পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে।'

কোন্‌ টানে জানা হতে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে।
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
অচেনার ধারে।
ওপারের গ্রাম দেখো আছে ওই চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি
ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীরু তরী।

জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিণী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
রেখে গেল তার।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগ যুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত।

তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছালো আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ
যদি বলে যাও বধূ, 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।'

১৯ আশ্বিন ১৩৩৫

পরিণয়

শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে,
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে।
একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাঁই,
সে একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে।

আপনার দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।
ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে,
নিশীথে তারায় আলোর ধেয়ান জাগে,
উদয়সূর্য গাহে জাগরণী গান।

নীরবে গোপনে মর্তভুবন-'পরে
অমরাবতীর সুরসুরধুনী ঝরে।
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার-বাঁধন-হারা,
স্বর্গের দীপ জ্বলিল মাটির ঘরে।

আজি বসন্ত চিরবসন্ত হোক,
চিরসুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে রাতে দিক আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা।
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়,
পাখির সংগীত-সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা।

সৃষ্টির সে রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
দুজনায় গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙিন বসনে ওরা সেজে
চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে,
পুরানো সংসার হতে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন।

যাহা সবচেয়ে সত্য সবচেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুনকলোল্লাস।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্তের ম্লানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস।
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে,
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ।

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত নাচের নেশা পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরুগুলি ওই দেখ্ আছে কান পেতে,
ওই সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।
নিবি তোরা তীর্থবারি সে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিত সংগীত উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মত্ত হাওয়া।

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন।

২০ আশ্বিন ১৩৩৫

বন্দিনী

তুমি বনের পুব পবনের সাথি,
বাদল মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি।
হায় অজানা, জানি না সে
উধাও তুমি কোন্ আকাশে,
কোন্ তমালের কাননতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমারই সুর কাঁপে।

কোন্ রঙনে রঙিন তোমার পাখা?
তোমার সোনার বরনখানি ভাবনাতে মোর আঁকা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মুক্তরূপের ধ্যানের ছায়ায় মগ্ন আমার আঁখি।
বন্দী মনের বদ্ধ ডানা,
চতুর্দিকে কঠোর মানা,
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে—
শূন্যে সদাই গান ফেরে তাই অসীম অন্বেষণে।
গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা,
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন-পাখা মেলা।

ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখী।
আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পথিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে,
বিরহেরই আকাশতলে নিল আমায় তুলে।

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে—
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি।
বাঁধনে তাই জাদু লাগে,
বীণার তারে মূর্তি জাগে,
রাগিণীতে মুক্তি সে দেয়, ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সুর।

৫ কার্তিক ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তর-পারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজও প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা,
জানি না কী নিয়ে যাবে-যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষবিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো।

১৪ কার্তিক ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি, বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব ; আমার বরণপুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে,
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জগৃহদ্বার
এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতিসন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ লিখন—
আমারে আড়াল করে আমারে করিবে অন্বেষণ :
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।
হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায় ;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ, আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর ; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

২৭ পৌষ ১৩৩৫

পুরাতন

যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে। সেদিনের সাহানার সুর
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশেরে ; দিগন্তের অরণ্যরেখায়
দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জনে
মধু আহরিতে ফিরে, সেদিনের অকৃপণ বনে
যে চামেলিবল্লী ছিল তারি শূন্য দানসত্র হতে।
ছায়াতে যা লীন হল তারে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে।
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে সিন্ধুপারে চলি,
তারি কুলায়ের কাছে সে কালের বিস্মৃত কাকলি
বৃথাই জাগাতে আসে। যে তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও-যে ধরিয়া এনেছে নিজ সুরে।

পৌষ ? ১৩৩৫

ছায়া

আঁখি চাহে তব মুখ-পানে,
তোমারে জেনেও নাহি জানে।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপনকায়া
তোমার মর্মের মাঝখানে।

হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে।
বসন্তকূজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে।

মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে।
বসন্তপঞ্চম রাগে
বিচ্ছেদের ব্যথা লাগে
সুগভীর ভৈরবীর মিড়ে।

তোমার শ্রাবণপূর্ণিমাতে
বাদল রয়েছে সাথে সাথে।
হে করুণ ইন্দ্রধনু,
তোমার মানসী তনু
জন্ম নিল আলোতে ছায়াতে।

অদৃশ্যের বরণের ডালা,
প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জ্বালা।
মিলননিকুঞ্জতলে
দিয়েছ আমার গলে
বিরহের সূত্রে গাঁথা মালা।

তব দানে ওগো আনমনা,
দিয়ো মোরে তোমার বেদনা।
যে বন কুয়াশা-ছাওয়া
ঝরা ফুল সেথা পাওয়া,
থাক্ তাহে শিশিরের কণা।

৫ ভাদ্র ১৩৩৬

বাসরঘর

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙেচোরে
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন ক'রে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে'
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

[বাঙ্গালোর
আষাঢ় ১৩৩৫]

বিচ্ছেদ

রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে ।
আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান ।
তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি ।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ ।

[বাঙ্গালোর
আষাঢ় ১৩৩৫]

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন ।

ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহুদূরে ।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম ।
ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,

সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি ।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম ।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে ।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি—
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা ।
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে ।
তোমার মানসভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে ।
আজও তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন ।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক ।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই ।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে ।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ-রাতে,

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি ।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার ।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম ।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ।

ব্যালাব্রুয়ি । বাঙ্গালোর
২৫ জুন ১৯২৮

প্রণতি

কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী ।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে ।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান ।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী ।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে ।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে ।
এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে ।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে ।

আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম—
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি'-পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।

[বাঙ্গালোর
আষাঢ় ১৩৩৫]

নৈবেদ্য

তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে ; কিছু আর নাহি বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীনকান্না, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।

[বাঙ্গালোর
আষাঢ় ১৩৩৫]

অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।

[বাঙ্গালোর
আষাঢ় ১৩৩৫]

অন্তর্ধান

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন ।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন ।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি ।

জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ অন্তরে রাখিয়া গেছ দান ।
বিচ্ছেদেরই হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে ।

[শান্তিনিকেতন]
২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

বিরহ

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ বাক্য বলিবার কাল ।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
শান্ত হল শেষ দেখা— নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে ।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো ।

যে দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে ।
কান পাতি রবে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে—
তোমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া ।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্‌ কানে-কানে কথা ।
মোর নাম তব-কণ্ঠে-ডাকা
শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা ।

সঙ্গহীন স্তব্ধতার সুগম্ভীর নিবিড় নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্মমাঝে পশি
আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী ।

[শান্তিনিকেতন]
২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

বিদায়সম্বল

যাবার দিকের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকার স্নেহখানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি।
'ভুলিব না কভু, রবে মনে মনে'
এই মিছে আশা দেয় খনে খনে,
ছলছল ছায়া নবীন নয়নে
বাধোবাধো মৃদু বাণী।

যাবার দিকের পথিক সে কথা
ভরি লয় তার প্রাণে।
পিছনের এই শেষ আকুলতা
পাথেয় বলি সে জানে।
যখন আঁধারে ভরিবে সরণী,
ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী,
'ভুলিব না কভু,' এই ক্ষীণধ্বনি
তখনো বাজিবে কানে।

যাবার দিকের পথিক সে বোঝে—
যে যায় সে যায় চ'লে,
যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,
যে যায় তাহারে ভোলে।
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে,
'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে।

সিঙাপুর
১৯ অগস্ট ১৯২৭

দিনান্তে

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে,
তাহাতে মোর যা হয় হোক ক্ষতি,
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে,
চরণে তব গোপনে তার গতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি,
প্রদীপ ছিল মলিনশিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালি,
দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি।

বাহির হতে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তার গতি ।

নাহয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি
নীরব এই নীরস মরুতীরে,
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে ।
ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এপার হতে বহিয়া মোর নতি ।
যে বীণা তব মন্দিরেতে বাজে নি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি ।

আম্বোয়াজ জাহাজ
১ শ্রাবণ ১৩৩৪

অবশেষে

বাহির-পথে বিবাগী হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয় ।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া
ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায় ।
সারাটা বেলা সাগর-ধারে
কুড়ালি যত নুড়ি,
নানা রঙের শামুক-ভারে
বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণ-পারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায় ;
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায় ।
আয় রে ফিরে আয় ।

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,
না যদি রয় সাথি,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বালে বাতি ;

তবু তো আছে আঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপনমনে
মুছিবি তার ধূলি,
গাঁথিবি তারে রতনহারে
বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়।
কাননবীথি ফুলের রীতি
নাহয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগন-কিনারায়।
আয় রে ফিরে আয়।

[শান্তিনিকেতন]
২৯ চৈত্র ১৩৩৪

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়
চৈত-ফসলের শূন্য খেতে,
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে—

আয় রে ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্রঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।
সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরে নি,
কুঞ্জবনের প্রান্ত-ধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয় রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আসবে কখন শুকনো খরা,
প্রেতের নাচন নাচবে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা।

শুনি যেন কাননশাখায়
বেলাশেষের বাজায় বেণু ;
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধরেণু।
কাল যে কুসুম পড়বে ঝরে
তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে।

নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাই রে দেরি, করিস ত্বরা,
শেষের দানে ওই রে সাজায়
বিদায়দিনের দানের ভরা।

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে জানি।
যা কিছু তার আছে দেবার
শেষ করে সব নিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক চলে যাক
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।
আয় রে ওরে মৌমাছি, আয়,
আয় রে গোপন-মধু-হরা,
চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
ওই মরণের স্বয়ম্বরা।

[শান্তিনিকেতন]
১২ চৈত্র ১৩৩৩

বনবাণী

ভূমিকা

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে ; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয় ; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়— তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে ; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তা হলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন— দুই-এ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' ; শুনেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'— প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গি, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কতদিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায় ; প্রথম-প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়— তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ— অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে, তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ— আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

[হোটেল ইম্‌পীরিয়ল]
ভিয়েনা
২৩ অক্টোবর ১৯২৬

বনবাণী

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে ।

সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্তের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা । যে জীবন
মরণতোরণদ্বার বারংবার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে । তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে— দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে ।

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা ।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন—
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির;
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
শুনিতে মৌনের মহাবাণী; দুশ্চিন্তার গুরুভারে
নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ ধরণীর, বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী— সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।

[শান্তিনিকেতন]
৯ চৈত্র ১৩৩৩

জগদীশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
প্রিয়করকমলে

বন্ধু,
যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিমভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্যকোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে ; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝংকারগীতি ; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাতপবনে।
প্রাণের প্রথমবাণী এইমতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে—
কাছে থেকে শুনি নাই ; হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মর-সাথে মানব-মর্মের আত্মীয়তা ;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপ্তহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে

ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদি
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্তের চূড়ায় উড়ে ।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত । সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে ।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে ও কূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্মমাঝে ।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্রদীপ জ্বলে আজি দীপালি-উৎসবে !
আমারও একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা,
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে-বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন-তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি-'পরে ।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, 'ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি ।'

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

দেবদারু

আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ঐ একটি দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ঐ দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্যের যে জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য-উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী— তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে বাণী ধরিল শ্যামকায়া ; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান ; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।
ঋজু দীর্ঘ দেবদারু— গিরি এরে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
আপন মহিমা চেয়ে ; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হল ; ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ,
ঊর্ধ্বপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিল একদিন।
আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
সূর্যের সংগীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর।

শিলঙ
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আম্রবন

সে বৎসর শান্তিনিকেতন-আম্রবীথিকায় বসন্ত-উৎসব হয়েছিল। কেউ-বা চিত্রে কেউ-বা কারুশিল্পে কেউ-বা কাব্যে আপন অর্ঘ্য এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন করেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সেদিন উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন— সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের পরাহ্নে প্রকাশ করে গেলেম। এই আম্রবনের যে নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মিত হৃদয়ে এসে পৌঁচেছিল আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলিবিক্ষুব্ধ অপরাহ্নের অবকাশ নিয়ে।

তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরিতে যে বাজালো আজি
মর্মে তব অশ্রুত রাগিণী,
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি রহি আমারও হৃদয় উঠে বাজি—
চিনি তারে কিংবা নাহি চিনি,
কে জানে কেমন!

অন্তরে অন্তরে তব যে চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি,
ওগো আম্রবন ।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারই মতন চাহে কথা—
মঞ্জরিতে মুখরিয়া আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা ;
অজানারে খুঁজি
আমারই মতন আন্দোলন ।

সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি
সর্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে,
ওগো আম্রবন ।
আমিও তো আপনার বিকশিত কল্পনায় সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে
অমনি নূতন ।
প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায়
অদৃশ্যের নিশ্বসিত ধ্বনি,
ওগো আম্রবন ।
আমার যে পুষ্পশোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,
নূতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়
সুরের গাঁথনি—
গীতঝংকারের আবরণ ।

যে অজস্র ভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি
ভূতলের চিরন্তনী কথা,
ওগো আম্রবন,
তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি,
ধরণীর বিরহবারতা
গভীর গোপন ।
সে ভাষা সহজে মিশে বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে,
মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে,
ওগো আম্রবন ।
আমার নিভৃত চিত্তে সে ভাষা সহজে চলে আসে,
মিশে যায় সংগোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
স্বপনে বেদনে,
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ ।

সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত,
ওগো আম্রবন ।
যেন নাম ধ'রে কোন্ কানে-কানে গোপন মর্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ ।

আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ-সনে
জনমমরণপরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউলপ্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য-আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতিক্ষণে
দীপ জ্বালি তার
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

বহুকাল চলিয়াছে বসন্তের রসের সঞ্চার
ওই তব মজ্জায় মজ্জায়,
ওগো আম্রবন।
বহুকাল যৌবনের মদোৎফুল্ল পল্লীললনার
আকুলিত অলকসজ্জায়
জোগালে ভূষণ।
শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস কর তুমি পান,
ওগো আম্রবন,
সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির—
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
পথ-চলা গান,
কালি তার হবে সমাপন।

[শান্তিনিকেতন]
৫ ফাল্গুন ১৩৩৪

নীলমণিলতা

শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত, কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সেদিন রূপের স্মৃতি নামের দাবি করলে। ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে, সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণিমঞ্জরির গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে।
আকাশ যে মৌনভার
বহিতে পারে না আর,
নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণিলতা।

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নকায়া ।
যে মৌন নিজেরে চায়
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে ।

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর-অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী ।
মর্মের নির্বাক কথা
পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্মল নীলে ; আনন্দের সেই নীল দ্যুতি
নীলমণিমঞ্জরির পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকূতি ।

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে,
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে হে লতা, চিনালে আপনাকে ।
বেল জুঁই শেফালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে,
কত ফাল্গুনের, কত শ্রাবণের, আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা !

চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা ।
বাদলের চামেলি-যে
কালো আঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণঝংকারসুরে মাখা,
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা ।

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি ।
যেন ইতিহাসজালে
বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে ।

'কেন এ কে জানে'— এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে ;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে ।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে ;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে ।

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধরসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানচ্ছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে।'

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে,
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে;
বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে।'

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা-মাঝে।
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে,
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে।

ভরতপুর
১৭ চৈত্র ১৩৩৩

কুরচি

অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলেম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়ালঘেঁষা এক কুরচিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্চর্যে মহিমান্বিত। চারি দিকে হাটবাজার; এক দিকে রেলের লাইন, অন্য দিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি·ডব্লু·ডি-র স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুরচিগাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা করছে— উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়,
ছিল প্রীতি কুমুদিনী পানে।
সহসা বিদেশে আসি, হায়, আজ কি ও
কূটজেও বহু বলি মানে!

—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।

আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা ; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা
তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকারঝংকারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত,
বিশ্বলক্ষ্মী করেছেন আমন্ত্রণ যে প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে,
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে ; শুভদৃষ্টি কোনো সুলগনে
ঘটিতে পারে নি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হয়ে।

তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে জনতার নিত্যকলরবে,
ইঁটকাঠপাথরের শাসনের সংকীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে। সূর্যপানে চাহিয়া দাঁড়ালে
সকরুণ অভিমানে ; সহসা পড়েছে যেন মনে
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দনকাননে
পারিজাতমঞ্জরির লীলার সঙ্গিনীরূপ ধরি
চিরবসন্তের স্বর্গে, ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী ;
অপ্সরীর নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
পেতে দোল তালে তালে ; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
মাখা হয়ে নিঃশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার-'পরে।
অদূরে কঙ্কররুক্ষ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
চলেছে আগ্নেয়রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
ঔদ্ধত্য বিস্তারি বেগে ; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায়
অর্থমূল্যহীন তোমা-পানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমন্দিরের পথ দিয়া
বেসুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
দক্ষিণবায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঙ্কিণী
বসন্তবন্দনানৃত্যে— অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,
ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহংকারে
হানিয়া মধুর হাস্য ; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
ক্লান্তিহীন সৌন্দর্যের আত্মহারা অজস্র অমৃত
করেছ নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মুগ্ধ চিত্তময়
সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
তোমা-সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহনগীতে
প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে
পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,

হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে, পণ্ডিতের পুঁথির পাতায় ;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয় নি আজও লেখা,
গানে পায় নাই সুর। সে নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোকবীণায়
সে নামে ঝংকার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ; সে সুরে গোপন বার্তা জানি
সন্ধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হতে চুরি করে আনি
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটির-কানাচে
কটুনামে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস ধরা পাছে।
পণ্যের কর্কশধ্বনি এ নামে কদর্য আবরণ
রচিয়াছে ; তাই তোরে দেবী ভারতীর পদ্মবন
মানে নি স্বজাতি বলে, ছন্দ তোরে করে পরিহার—
তা বলে হবে কি ক্ষুণ্ণ কিছুমাত্র তোর শুচিতার।
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুরচি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

শান্তিনিকেতন
১০ বৈশাখ ১৩৩৪

শাল

প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সেদিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রিয়সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ দিয়ে চলেছে। এই স্তব্ধ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে। আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি— তেমনি ঐ শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।

বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা ; যবে কিংশুকের বন
উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্ধায় উদ্যত ; দিশিদিশি
শিমুল ছড়ায় ফাগ ; কোকিলের গান অহর্নিশি
জানে না সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি
পুঞ্জিত করেছ অভ্রভেদী, যেথা রয়েছ বিকাশি
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ ঊর্ধ্বশিরে ;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ি বেয়ে শাখায় সঞ্চারে ;

সে অমৃত মন্ত্রতেজ নিলে ধরি সূর্যলোক হতে
নিভৃত মর্মের মাঝে ; স্নান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী ; তার পরে
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি— বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে বারংবার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হতে অফুরান
পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল ঊর্মি উচ্ছ্বাসিয়া দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্মর আশীর্বাণী । রাজার সাম্রাজ্য কতশত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্‌বুদের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর যায়, আর বারংবার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি । তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি :
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মরসংগীতে,
মঞ্জরির গন্ধের গণ্ডূষে । যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি ; যায় তারা পথ বাহি
আসন্ন বিস্মৃতি-পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি ।
নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগুটি
অস্তিত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি ;
মর্তপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তারা জপনাম, তার পরে আর তারা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে । সেই চলে-যাওয়া দল
রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণিকের কলকোলাহল
দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
শাখার দোলায় । ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর । কতদিন এই পাতাঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে । তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা ;
যৌবন-তুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা ।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরিতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে ।



শান্তিনিকেতন শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ

প্রীতিমিলনের ক্ষণে
সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
তোমার বীথিকাতলে তার মুক্ত জীবনপ্রবাহ
আনন্দচঞ্চল গতি মিলায়েছে আপন উৎসাহ
পুষ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজি তব পত্রদোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্তকল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্তের বেদনা মেশে।

চাহি আজ দূর-পানে
স্বপ্নচ্ছবি চোখে ভাসে— ভাবী কোন্ ফাল্গুনের রাতে
দোলপূর্ণিমায়, সাজাতে আসিছে কারা পদ্মপাতে
পলাশ বকুল চাঁপা, আলিম্পনলেখা এঁকে দিতে
তব ছায়াবেদিকায়, বসন্তের আবাহনগীতে
প্রসন্ন করিতে তব পুষ্পবরিষন। সে উৎসবে
আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
কোলে তার পড়ে আছে এ রাত্রির উৎসবের ডালা।
আজিকার অর্ঘ্যে আছে যতগুলি সুরে-গাঁথা মালা,
কিছু তার শুকায়েছে, কিছু তার আছে অমলিন ;
দুয়েকটি তুলে নিল যাত্রীদল ; সে দিন এ দিন
দোঁহে দোঁহা-মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা।

[শান্তিনিকেতন]
৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

মধুমঞ্জরি

এ লতার কোনো-একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে— জানি নে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরে যে দেবতা মুক্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এদেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশী নামে একে আপন করে নিলেম।

প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি,
বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি মরি,
ফুলমাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি
মধুমঞ্জরিলতা।
কতদিন আমি দেখিতে এসেছি প্রাতে
কচি ডালগুলি ভরি নিয়ে কচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
কহিতে চেয়েছে কথা।

কতদিন আমি দেখেছি গোধূলিকালে
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু-কাঁপনের তালে
কী যেন ছন্দ শোনে।
গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া জড়িত ডালের ফাঁকে
কালপুরুষের ইঙ্গিত যেন কাকে
দূর দিগন্তকোণে।

শ্রাবণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর,
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে থরথর,
মনে হয় ওর হিয়া যেন ভরভর
বিশ্বের বেদনাতে।
কতবার ওর মর্মে গিয়েছি চলি,
বুঝিতে পেরেছি কেন উঠে চঞ্চলি,
শরৎশিশিরে যখন সে ঝলমলি
শিহরায় পাতে পাতে।

ভুবনে ভুবনে যে প্রাণ সীমানাহারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি লয় তারি ধারা,
মজ্জায় লহে ভরি।
কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
সে পুলকখানি কত-যে, সে মোর মনে
বুঝিব কেমন করি।

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে—
ঋতুর হাতের মায়ামন্ত্রের টানে
কী-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ওই জানে,
মন তা জানিবে কিসে।
যে ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া,
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
চেয়ে থাকি অনিমিষে।

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিলবাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত,
ধরিতে না পারে তারে।

ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
ধরণীর ধন গগনের মন-হরা,
শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝংকারে ঝংকারে।

আমার দুয়ারে এসেছিল নাম ভুলি
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি
মোর আঁখিপানে চেয়েছিল দুলি দুলি
করুণ প্রশ্নরতা।
তার পরে কবে দাঁড়ালো যেদিন ভোরে
ফুলে ফুলে তার পরিচয়লিপি ধরে
নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন ক'রে—
মধুমঞ্জরিলতা।

তার পরে যবে চলে যাব অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল-ফোটাবার ব্যথা।
বরষে বরষে সেদিনও তো বারে বারে
এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা।

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।
অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে ;
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্ ওর ফুলে
মধুমঞ্জরিলতা।

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৩৩]

নারিকেল

সমুদ্রের ধারের জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আশ্রমের মাঠ সেই সমুদ্রকূল থেকে বহুদূরে। এখানে অনেক যত্নে একটি নারিকেলকে পালন করে তোলা হয়েছে— সে নিঃসঙ্গ নিষ্ফল নিস্তেজ। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন প্রাণপণে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অতিক্রম করে কোনো-এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেষ্টা করছে। নির্বাসিত তরুর মজ্জার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা। এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই, গাছের শিকড় তার বাঞ্ছিত রস এখানে সন্ধান করছে, পাচ্ছে না; সে উপবাসী, ধরণীর কাছে তার কান্নার সাড়া মিলছে না। আকাশে উদ্যত হয়ে উঠে তার যে সন্ধানদৃষ্টিকে সে দিগন্তপারে পাঠাচ্ছে দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তার সন্ধানেরই সজীব মূর্তির মতো পাখি তার দোদুল্যমান শাখায় প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে।

আজ বসন্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠল। দক্ষিণ হাওয়ায় আজ কি সমুদ্রের বাণী এসে পৌঁছল, যে বাণী সমুদ্রের কূলে কূলে বধির মাটির সুপ্তিকে নিয়তই অশান্ত তরঙ্গমন্দ্রে আন্দোলিত করে তুলছে। তাই কি আজ সেই দক্ষিণসমুদ্র থেকে তার তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চঞ্চল। সমুদ্রের রুদ্রডমরুর জাগরণী কি এরই পল্লবমর্মরে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে। বিরহী তরু কি আজ আপন অন্তরে সেই সুদূরবন্ধুর বার্তা পেল, যে বন্ধুর মহাগানে অভিনন্দিত হয়ে কোন্ অতীত যুগে একদিন কোনো প্রথম নারিকেল প্রাণযাত্রীরূপে জীবলোকে যাত্রা শুরু করেছিল? সেই যুগারম্ভপ্রভাতের আদিম উৎসবে মহাপ্রাণের যে স্পর্শপুলক জেগেছিল তাই আজ ফিরে পেয়ে কি ঐ গাছটির সংবৎসরের অবসাদ আজ বসন্তে ঘুচল। তার জীবনের জয়পতাকা আবার আজ কি ঐ নব উৎসাহে নীলাম্বরে আন্দোলিত। যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, তার মজ্জার মধ্যে প্রাণশক্তির যে আশ্বাসবাণী প্রচ্ছন্ন হয়েছিল তাকেই আজ কি ফিরে পেলে, যে বাণী বলছে— 'চলো প্রাণতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে।'

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব, নারিকেল— দিনরাত্রি কাটে
যে-প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পার না তাহা নিজে।
দিগন্তেরে অতিক্রমি দেখিতে চাহিছ তুমি কী-যে
দীর্ঘ করি দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি
গূঢ় হয়ে। মাটির গভীরে যে রস খুঁজিছ নিতি
কী স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তার কী অভাব আছে,
তাই তো শিকড় উপবাসী, কাঁদে ধরণীর কাছে।
আকাশে রয়েছ চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
বাক্যহারা! বারবার শূন্য হতে ফিরে ফিরে আসে
তোমারি সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখি
লম্বিত শাখায় তব।
ওই শুন উঠিয়াছে ডাকি
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এল প্রাণে
দক্ষিণপবন হতে, যে বাণী সমুদ্র শুধু জানে;
পৃথিবীর কূলে কূলে যে বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
বধির মাটির সুপ্তি কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিক্ষণে
অশান্ততরঙ্গমন্দ্রে, দক্ষিণসাগর হতে একি
তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ শাখার হিল্লোলে তব দেখি
মুহুর্মুহু চঞ্চলিত।

রুদ্রডমরুর জাগরণী
পল্লবমর্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
কান পেতে ছিলে তুমি— হে বিরহী, বসন্তে কি আজি
সুদূরবন্ধুর বার্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি—
যে বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্যের আলোতে
রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে প্রাণযাত্রী, অন্ধকার হতে ?
আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরশহর্ষ সেই
যুগারম্ভপ্রভাতের আদি-উৎসবের। নিমেষেই
অবসাদ দূরে গেল, জীবনের বিজয়পতাকা
আবার চঞ্চল হল নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা,
খুঁজে পেলে যে আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন।'

[শান্তিনিকেতন
১৬ ফাল্গুন ১৩৩৪]

চামেলিবিতান

চামেলিবিতানের নীচের ছায়ায় আমি বসতুম— ময়ূর এসে বসত উপরে, লতার আশ্রয়বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু সৌন্দর্যের যে অর্ঘ্যভার সে বহন করে বেড়াত, তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি প্রতিদিন গ্রহণ করেছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ ছিলুম. সে যে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরো তার কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল, কিন্তু দূরের দুরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেছি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারে নি অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত বাল্মীকির শাপকে এ যুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না।

মা নিষাদঃ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
বটের উঠেছে কচি পাতা,
হোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।

লিখিতেছি নিজ মনে—
হেরি তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি,
বোঝ না, লেখনী ধরি
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি।

সেই ভালো জান যদি তাই,
তাহে মোর কোনো খেদ নাই।
তবু আমি খুশি আছি,
আস তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি কর ত্রাস।
যদিও মানব, তবু
আমারে কর না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।
সুন্দরের দূত তুমি,
এ ধূলির মর্তভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আন,
তবুও বধি না তোরে,
বাঁধি না পিঞ্জরে ধরে,
এও কি আশ্চর্য নাহি মান।

কাননের এই এক কোণা,
হেথায় তোমার আনাগোনা।
চামেলিবিতানতল
মোর বসিবার স্থল
দিন যবে অবসান হয়।
হেথা আস কী যে ভাবি,
মোর চেয়ে তোর দাবি
বেশি বৈ কম কিছু নয়।
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।
কচি পাতা যে বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে,
তোমার তেমনি অধিকার।

বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি লাগি পাছে পাই লাজ,
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীতচিত্র করি।

আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল-সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।
ধরায় যেখানে তাই
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারও ঠাঁই হয়।
সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব লাগে,
মোরে তুমি কর নাই ভয়।

তোমার আমার তরে জানি
মধুরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গি,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।

নাশ করে যে-আগ্নেয় বাণ
মুহূর্তে অমূল্য তোর প্রাণ—
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় নি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।
যে-বসন্তে প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে বসন্ত নহে তার তরে।
ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠে বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
কুটিল সংশয় কদাকার।

সৃষ্টিছাড়া এই-যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে—
তার লজ্জা তুই কি রে
আনিতে পারিবি তোর মনে।
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্যেরে দেয় ব্যথা
কেন যে তা বুঝিবি কেমনে।
কেন যে কদর্য ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে হস্ত দানেরই তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিলজনার।

[শান্তিনিকেতন
বৈশাখ ১৩৩৪]

পরদেশী

পিয়র্সন কয়েক জোড়া সবুজরঙের বিদেশী পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিংবা এখানকার অন্য আশ্রমিক পশু-পাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে নি।

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।
অজানা এই সাগরপারে
হল না তার গানের ক্ষতি।
সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে
বিদেশী পাখি গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে।

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,
বনজামেরে চঞ্চু তার
অচেনা ব'লে দোষী না করে।

শরতে যবে শিশির বায়ে
উচ্ছ্বসিত শিউলিবীথি,
বাণীরে তার করে না ম্লান
কুহেলিঘন পুরানো স্মৃতি।
শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধুকাঙালী লোভীর মেলা,
চিরমধুর বঁধুর মতো
সে ফুল তার হৃদয় হরে।

বেণুবনের আগের ডালে
চটুল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখির সাথে
পরানে তার ভেদ কি আছে।
উষার ছোঁওয়া জাগায় ওরে
ছাতিমশাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে ছবি জাগে
মানে না তারে প্রবাস ব'লে।
আলোতে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চিরজানারই লীলা,
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে।

[শান্তিনিকেতন]
৮ বৈশাখ ১৩৩৪

কুটিরবাসী

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেইসঙ্গে এও মনে হয় বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

তোমার কুটিরের
সমুখবাটে
পল্লিরমণীরা
চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি,
উঠেছে হাসি—
উদাসী বিবাগীর
চলার বাঁশি

আঁধারে আলোকেতে
সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে ।

যা-কিছু আসে যায়
মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে ।
ঘাসের কাঁপা লাগে,
পাতার দোলা,
শরতে কাশবনে
তুফান-তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গুনগুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝি রবে
জাল-বুনানি ।
দেখেছি ভোরবেলা
ফিরিছ একা,
পথের ধারে পাও
কিসের দেখা ।
সহজে সুখী তুমি
জানে তা কেবা—
ফুলের গাছে তব
স্নেহের সেবা ।
এ কথা কারও মনে
রবে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
হৃদয় ঢালি ।

দিনের পরে দিন
যে দান আনে
তোমার মন তারে
দেখিতে জানে ।
নম্র তুমি, তাই
সরলচিতে
সবার কাছে কিছু
পেরেছ নিতে,
উচ্চ-পানে সদা
মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে
দাও নি ফাঁকি ।

চাও নি জিনে নিতে
হৃদয় কারও,
নিজের মন তাই
দিতে যে পার।
তোমার ঘরে আসে
পথিকজন,
চাহে না জ্ঞান তারা,
চাহে না ধন,
এটুকু বুঝে যায়
কেমনধারা
তোমারই আসনের
শরিক তারা।

তোমার কুটিরের
পুকুর পাড়ে
ফুলের চারাগুলি
যতনে বাড়ে।
তোমারও কথা নাই,
তারাও বোবা,
কোমল কিশলয়ে
সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীরব ব'লে।

তোমারই মতো তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে
তালের গাছে
বিরল পাতাকটি
আলোয় নাচে,
সমুখে খোলা মাঠ
করিছে ধূ ধূ,
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।

দেখি যে পথিকের
　　মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার
　　সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
　　পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
　　যাবে না ক্ষত।

নাইকো রেষারেষি
　　পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
　　সহজে করে।
কীর্তিজালে ঘেরা
　　আমি তো ভাবি,
তোমার ঘরে ছিল
　　আমারও দাবি ;
হারায়ে ফেলেছি সে
　　ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর
　　অনেক দায়ে।

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৩৩]

হাসির পাথেয়

তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি চ'ড়ে বেরতুম, অপরাহ্নে ডাকবাংলায় বিশ্রাম হত। আজও মনে আছে এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিল। সেখানে শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝরনা নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝরে পড়ছে। সেই প্রথম-দেখা ঝরনার রহস্য আমার মনকে প্রবল করে টেনেছিল। এ দিকে ডান পাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যখেত হলদে ফুলে ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না— কেবলই ভাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ কেন হয়। সেই ঝরনা কোন্ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানি নে কিন্তু সেই মুহূর্তকালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলব না।

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারে বারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষারনিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন।

সেদিন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রান্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল ; মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।

সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হতে
আসিয়াছি বহুদূরে ; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি
শৈলশিখরের দূর নির্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ শঙ্কায় সংকুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে হাসি দেখেছি বসি
শস্যভরা তটচ্ছায়ে কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বসি
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তারে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্যদিনে বহি যায় অক্লান্ত প্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া— অফুরান হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে।

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিত্রীরে করে দান যে অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত অশ্রান্ত অজেয়।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৩৪

বৃক্ষরোপণ উৎসব

গান

১

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ ।

পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথি,
মাতাও নীলাম্বর ।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ ।

২

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহসঙ্গ নে,
চল্, আমাদের ঘরে চল্ ।
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে
চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল ।

তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে
মর্মরগীত-উপহার ।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল ।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে।
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চিরসখ্যে।
অন্তরে পাক কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক পত্রী
তোমার অন্নসত্রে।

অপ

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরি বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা অভিষেকে।

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হোক।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি
হোক তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি।

মরুৎ

হে পবন কর নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সংগীত দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লবহিল্লোল শিক্ষা।

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামলমূর্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।

দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরুতরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য।

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণবর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষাগীতিকায়
সন্ধ্যাবন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জবীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণমহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক মৃত্যুহীন।
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্বপরিমলে।

[শান্তিনিকেতন]
১৩ জুলাই ১৯২৮

পরিশেষ

আশীর্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন

করকমলে—

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যূষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে
আলোকের স্পর্শমণি । আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পারস্যে জন্মদিনে

তেহেরান। ২৫ বৈশাখ ১৩৩১

পরিশেষ

১

প্রণাম

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা-বর্ণে-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে প্রত্যূষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন-পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে,
তুলিল হিল্লোলদোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনামন্ত্র-জপে— আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোরকোরক-মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা।
চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে

অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়ারৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা-মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি— এই মোর রহিল প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
৬ এপ্রিল ১৯৩১

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে ;
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে।

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইশারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কী বলে তারা কে বলো তাহা জানে।
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত মনে অবাক বাণী,
শিশির যেন তৃণে।
প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বুকে,
বারণহীন নাচিত হিয়া
কারণহীন সুখে।

জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।
প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
বাজালে তুমি বীন,
ব্যথায় মোর জাগায়ে নিয়ে
তারের রিনিরিন।
পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্বেরি কূলে।

চৈত্রমাসে শুক্ল নিশা
জুঁহি-বেলির গন্ধে মিশা ;
জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
যৌবনে সে উতল রাতে
করুণ কার চোখে
সোহিনী রাগে মিলাতে মিড়
চাঁদের ক্ষীণালোকে।
কাহার ভীরু হাসির 'পরে
মধুর দ্বিধা ভরি
শরমে-ছোঁয়া নয়নজল
কাঁপাতে থরথরি।

হঠাৎ কভু জাগিয়া উঠি
ছিন্ন করি ফেলেছ টুটি
নিশীথিনীর মৌন যবনিকা,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হেনেছ তারে বজ্রানলশিখা।
গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ,
'অলস থেকো না গো।'
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ, 'জাগো জাগো।'
বাসরঘরে নিবালে দীপ,
ঘুচালে ফুলহার,
ধূলি-আঁচল দুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার।

বুকের শিরা ছিন্ন করে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি
বক্ষ বিভেদিয়া
কণাকণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।
তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে ;
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব-করা দানে।

[শান্তিনিকেতন]
৭ বৈশাখ ১৩৩৪

জন্মদিন

রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি,
লহো মালাখানি।

উগ্র তব তপের আসন,
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ
করেছিনু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে,
কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো-বা ঝঞ্ঝার পবনে।
এবার তপস্যা হতে নেমে এসো তুমি—
দেখা দাও যেথা তব বনভূমি
ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ
আষাঢ়ের আভাসে করুণ।
অপরাহ্ণ যেথা তার ক্লান্ত অবকাশে
মেলে শূন্য আকাশে আকাশে
বিচিত্র বর্ণের মায়া ; যেথা সন্ধ্যাতারা
বাক্যহারা
বাণীবহ্নি জ্বালি
নিভৃতে সাজায় ব'সে অনন্তের আরতির ডালি।

শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা
সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা
যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময়,
যেথা তার অফুরান মাধুর্যসঞ্চয়
প্রাণে প্রাণে
বিচিত্র বিলাস আনে রূপে রসে গানে ;
বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর ।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধুলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে সহজ গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে ;
এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে—
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায় ।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরসসরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা ।'

[শান্তিনিকেতন]
২৩ বৈশাখ ১৩৩৮

পান্থ

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই ।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায় ।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভক্ষতি কান্নাহাসি—

এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া ;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো ;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র ; অস্তসূর্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়, সে তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরি
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি ।
সে তরঙ্গনৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গিতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে ।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া ।

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশ দিক ।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে ।

[শান্তিনিকেতন]
২৪ বৈশাখ ১৩৩৮

অপূর্ণ

যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
স্পর্শের যে ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে
উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের—
ব্রত তার বস্তু সন্ধানের,
মনের যে ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,
যে ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তরে গোপনে রয় জাগি—
সবে তারা মিলি নিতি নিতি
নানা আকর্ষণবেগে গড়ি তোলে মানস-আকৃতি ।

কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত-না সংশয় তর্ক, কত-না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা—
মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ
দেহহীন তর্জনীনির্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে, দেয় পুন মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
কত জয় কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই-সব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ—
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে, শেষে
কয়দিন পূর্ণ করি কোথা গিয়ে মেশে।
যে চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো-বা জাগি
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।
অসংখ্য এ রচনায় উদ্‌ঘাটিতে মহা-ইতিহাস
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।

আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদ্‌গদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে ।
তোমার যে সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা ।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা ।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন ।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি ।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয় ।

দার্জিলিং
অগ্রহায়ণ ? ১৩৩৮

আমি

আজ ভাবি মনে-মনে, তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে ।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডি দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে ।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি ।

তবে কেন পড়ে মনে, নিবিড় হরষে
প্রেয়সীর দরশে পরশে
বারে বারে
পেয়েছিনু তারে
অতল মাধুরীসিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে আমিরে ।

জানি তাই, সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
যে আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

দিগন্তে বাদলবায়ুবেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারংবার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

তুমি

সূর্য যখন উড়ালো কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে।
সেই ধ্বনি ধায় বকুলশাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়
আকাশপথের পান্থে।
অরুণরথের সে ধ্বনি পথের
মন্ত্র শুনায়ে দিলে
তাই পায়ে-পায় দোঁহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে।

তিমিরভেদন আলোর বেদন
লাগিল বনের বক্ষে,
নবজাগরণ পরশরতন
আকাশে এল অলক্ষ্যে।
কিশলয়দল হল চঞ্চল,
শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,
সুরলক্ষ্মীর স্বর্ণকমল
দুলে বিশ্বের চক্ষে।
রক্তরঙের উঠে কোলাহল
পলাশকুঞ্জময়,
তুমি আমি দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিনু আলোর জয়।

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে,
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।
চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসনভঙ্গে।
উষারুণ হতে রাঙা গোধূলির
দূরদিগন্তপানে
বিভাসের গান হল অবসান
বিধুর পূরবীতানে।
আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্‌গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।
মোর ফাল্গুন হারায় যখন
আশ্বিনে ফিরে লহ।
তব অপরূপে মোর নবরূপ
দুলাইছ অহরহ।

আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী,
বনবাণী হল শান্ত।
জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত।

নিখিলে ঘনালো দিবসের শোক,
বাহির-আকাশে ঘুচিল আলোক,
উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
হৃদয়ে এলে একান্ত ।
লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠালো
জানি না কী উদ্দেশে ।

দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নবজাগরিত বিশ্বে ।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে ।
হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল আঁধারে ধুয়ে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ান
অসীম দূর ভবিষ্যে ।
অজানা তারায় বাজে তব গান
হারায় গগনতলে ।
বক্ষ আমার কাঁপে দুরু দুরু,
চক্ষু ভাসিল জলে ।

প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি ।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপনলিপ্তি ।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এল যে রাতি ।

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি,
আঁধারে হতেছে গুপ্ত ।
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ,
কোথায় সে হায় সুপ্ত ।
অবগুণ্ঠিত তব চারি ধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত ।

শুধু ঝিল্লির ঘন ঝংকার
নীরবের বুকে বাজে ।
কাছে আছ, তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে ।

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য ।
তুমি যে বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুন্ন ।
যে পথে আমার ছিলে তুমি সাথি
সে পথে তোমার নিবায়ো না বাতি,
আরতির দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য ।
আজও জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয় ।

আলগন্ কুয়িন্ । ন্যুয়র্ক
৭ নবেম্বর ১৯৩০

আছি

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে ;
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায় ;
আশুক্লান্ত বেলগুলি সব শীর্ণ হয়ে আসে,
ম্লান গন্ধ কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ;
শুকনো টগর উড়িয়ে ফেলে,
চিকন কচি অশথ পাতায় যা খুশি তাই খেলে ;
বাঁশের গাছে কী নিয়ে তার কাড়াকাড়ি,
খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাড়ি ;
বটের শাখে ঘনসবুজ ছায়ানিবিড় পাখির পাড়ায়
হূহু করে ধেয়ে এসে ঘুঘু দুটির নিদ্রা ছাড়ায় ;
রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে,
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে ;
খেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিক্‌সীমায়
অস্ফুট ওই বাষ্পনীলিমায় ;
টেলিগ্রাফের তারে তারে
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে ;
এমনি করে বেলা বহে যায়,
এই হাওয়াতে চুপ করে রই একলা জানালায় ।

ওই যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্ খ্যাতি, না থাক্ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

[শান্তিনিকেতন]
১৯ বৈশাখ ১৩৩৮

বালক

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুইপহরে
দ্বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল,
সিসুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল।
তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর-'পরে ক্ষণে ক্ষণে বসত এসে কাক।
চড়ুই পাখির আনাগোনা মুখর কলভাষা—
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা।
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে—
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে।
কখন্ মাঝে-মাঝে
ঘড়িওয়ালা কোন্ বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।
সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালোলাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইকো গোড়া আগা।
সাথিহীনের সাথি
মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি।

সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে
অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে।
তেমনি আবার বালকদিনের মতো
চোখ মেলে মোর সুদূর-পানে বিনা কাজে প্রহর হল গত।

প্রখর তাপের কাল,
ঝরঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষগাছের ডাল ;
কুয়োর ধারে তেঁতুলতলায় ঢুকে
পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশসুখে ।
গাড়ির গোরু ক্ষণকালের মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে
জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভুঁয়ে ।
কাঁকর-পথের পারে
শুকনো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে ।
চেয়ে আছি দু-চোখ দিয়ে সব-কিছুরে ছুঁয়ে,
ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে ।
বালক যেমন নগ্ন-আবরণ,
তেমনি আমার মন
ওই কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে ।
সকল জানার মাঝে
চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে ।
এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
সেই আমারে করেছে আন্‌মনা ।

[শান্তিনিকেতন]
২১ বৈশাখ ১৩৩৮

বর্ষশেষ

যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে ।
অস্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দুই মুঠি ।
বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা ।

এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি—
কত ভালোবেসেছিনু আমি ।
অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি আপন চারি ধার
জীবনমৃত্যুরে দিল করি একাকার ;
বেদনার পাত্র মোর বারংবার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব অমৃতে ।

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী ।
কত দিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা ।

নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে।

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে-মনে।
যে নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে।

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারই তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।

অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ ;
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ ।
এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে ।

আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন—
মৃত্যু, তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন ।
কত কী গিয়েছে ঝরে— জানি জানি, কত স্নেহ প্রীতি
নিবায়ে গিয়েছে দীপ, রাখে নাই স্মৃতি ।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
ওগো শেষ, অশেষের ধনে ।

[শান্তিনিকেতন]
৩০ চৈত্র ১৩৩৩

মুক্তি

১

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
দিয়ো না দুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে । শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে—
নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা-'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে ; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায়— দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা ।

১ জুলাই ১৯২৭

২

আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি
হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বানবাণী । আজ তব বাজুক বাঁশরি,
চিত্তভরা শ্রাবণপ্লাবনরাগে— যেন গো পাসরি
নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল,
ধূলির নিবিড় টান পদতলে । রয়েছি নিশ্চল

সারাদিন পথপার্শ্বে ; বেলা হয়ে এল অবসান,
ঘন হয়ে আসে ছায়া, শ্রান্ত সূর্য করিছে সন্ধান
দিগন্তে অন্তিম শান্তি । দিবা যথা চলেছে নির্ভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হতে অন্তহীন অজানার পানে
অসীমের সংগীতে উদাসী— সেইমতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হোক সুর,
নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর ।

২ জুলাই ১৯২৭

আহ্বান

আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে ।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখ
আমার লাগি নিভৃতে এক ধারে ।
বাতাস বেয়ে ইশারা পেয়ে গেছি মিলন-আশে
শিশিরধোয়া আলোতে-ছোঁয়া শিউলিছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলিকলভাসে
অধীরধারা নদীর পারে পারে ।
আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে, সেথায় সারাবেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে ।

কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাক,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরি ।
শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি ।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে ।
পাষাণ ভিত টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক ফাটি
ধুলায়-চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরি বাজাও বারে বারে ।

সিঙাপুর বন্দর
৪ শ্রাবণ ১৩৩৪

দুয়ার

হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ,
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কি আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই।

হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রিদিনমান
সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।
সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে।
তারকায় খোল অন্ধকারে।

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
খোল পথ, ফুল হতে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তর কর অবারিত,
মৃত্যু হতে পরম অমৃত।

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তিসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্যনিশীথে।

[১৩৩৪]

দীপিকা

প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়,
জ্বাল তব নব দীপিকা।
প্রত্যূষপটে প্রতিদিন লেখ
আলোকের নব লিপিকা।
অন্ধকারের সাথে দুর্বার
সংগ্রাম তব হয় বার বার,
দিনে দিনে হয় কত পরাজয়,
দিনে দিনে জয়সাধনা।
পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও,
সেই উৎসাহে পথদুখ বও,
দেববিদ্রোহে বাঁধা পড় মোহে
তবে হয় দেবারাধনা।

খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর,
খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।

বাসা বেঁধে বেঁধে বাসা ভাঙে মন
　　কোথাও আসন মেলে না ।
জানি পথশেষে আছে পারাবার,
প্রতিখনে সেথা মেশে বারিধার,
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে
　　ছুটিছে পথিক তটিনী ।
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
মরণে মরণে চকিত চরণে
　　ছুটে চলে প্রাণনটিনী ।

২৫ ফাল্গুন [১৩৩৩]

লেখা

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারংবার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে । জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি । হয়েছে সময়
নবীনের তূলিকারে পথ ছেড়ে দিতে । হোক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ । নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি । অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক জিনে । কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে
যায় প্রতিমার দিন । ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়—
'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা ।'

১১ চৈত্র ১৩৩৩

নূতন শ্রোতা

১

শেষ লেখাটার খাতা
পড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা,
অমিয়নাথ স্তব্ধ হয়ে দোলায় মুগ্ধ মাথা ।
　　উচ্ছ্বসি কয়, 'তোমার অমর কাব্যখানি
নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী ।'

দড়িবাঁধা কাঠের গাড়িটারে
নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সভাঘরের দ্বারে।
আমি বলি, 'থাম্ রে বাপু, থাম্,
দুষ্টুমি এর নাম—
পড়ার সময় কেউ কি অমন বেড়ায় গাড়ি ঠেলে।
দেখ্ দেখি তোর অমিকাকা কেমন লক্ষ্মীছেলে।'

অনেক কষ্টে ভালোমানুষ-বেশে
বসল নন্দ অমিকাকার কোলের কাছে ঘেঁষে।
দুরন্ত সেই ছেলে
আমার মুখে ডাগর নয়ন মেলে
চুপ করে রয় মিনিট কয়েক, অমিরে কয় ঠেলে,
'শোনো অমিকাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্ক্রুপ।'
অমি বললে কানে-কানে, 'চুপ চুপ চুপ।'
আবার খানিক শান্ত হয়ে শুনল বসে নন্দ
কবিবরের অমর ভাষার ছন্দ।

একটু পরে উস্‌খুসিয়ে গাড়ির থেকে দশ-বারোটা কড়ি
মেজের 'পরে করলে ছড়াছড়ি।
ঝম্‌ঝমিয়ে কড়িগুলো গুন্‌গুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া—
এর পরে আর হয় না কাব্য পড়া।
তার ছড়া আর আমার ছড়ায় আর কতখন চলবে রেষারেষি,
হার মানতে হবেই শেষাশেষি।

অমি বললে, 'দুষ্টু ছেলে।' নন্দ বললে, 'তোমার সঙ্গে আড়ি—
নিয়ে যাব গাড়ি,
দিন্‌দাদাকে ডাকব ছাতে ইস্টিশনের খেলায়,
গড়গড়িয়ে যাবে গাড়ি বদ্দিবাটির মেলায়।'
এই বলে সে ছল্‌ছলানি চোখে
গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্ দিকে কোন্ ঝোঁকে।

আমি বললেম, 'যাও অমিয়, আজকে পড়া থাক্,
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।
আমার ছন্দে কান দিল না ও যে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।
যে-কবির ও শুনবে পড়া সেও তো আজ খেলার গাড়ি ঠেলে,
ইস্টিশনের খেলাই সেও খেলে।

আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ি,
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি,
আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।
ভরেছিলেম এই ফাগুনের ডালা
তা নিয়ে কেউ নাই-বা গাঁথুক আর-ফাগুনের মালা।'

প্লানসিউস জাহাজ
১৯ অগস্ট ১৯২৭

২

বছর বিশেক চলে গেল সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা ;
নন্দ বললে, 'দাদামশায়, কী লিখেছ শোনাও তো এইবেলা !'
পড়তে গেলেম ভরসাতে বুক বেঁধে,
কণ্ঠ যে যায় বেধে ;
টেনে টেনে বাহির করি এ খাতা ওই খাতা,
উলটে মরি এ পাতা ওই পাতা।
ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
গোপনে তার মুখের পানে চাহি,
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুনকালের শান-দেওয়া তার ললাটখানি খরখড়্গ-সম,
শীর্ণ যাহা জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি,
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।
তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য।

একটু কেশে পড়া করলেম শুরু
যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কবিগুরু—
প্রথম প্রেমের কথা,
আপ্‌নাকে সেই জানে না যেই গভীর ব্যাকুলতা,
সেই যে বিধুর তীব্রমধুর তরাসদোদুল বক্ষ দুরু দুরু,
উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু,
নীরব চোখের ভাষা,
এক নিমেষে উচ্ছলি দেয় চিরদিনের আশা,
তাহারি সেই দ্বিধার ঘায়ে ব্যথায় কম্পমান
দুটি-একটি গান।

এড়িয়ে-চলা জলধারার হাস্যমুখর কলকলোচ্ছ্বাস,
পূজায়-স্তব্ধ শরৎপ্রাতের প্রশান্ত নিশ্বাস,
বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাগরপারে,
তন্দ্রাবিহীন চিরন্তনের শান্তিবাণী নিশীথ-অন্ধকারে,
ফাগুনরাতির স্পর্শমায়ায় অরণ্যতল পুষ্পরোমাঞ্চিত,
কোন্ অদৃশ্য সুচিরবাঞ্ছিত
বনবীথির ছায়াটিরে
কাঁপিয়ে দিয়ে বেড়ায় ফিরে ফিরে,
তারি চঞ্চলতা
মর্মরিয়া কইল যে-সব কথা,
তারি প্রতিধ্বনিভরা
দু-একটা চৌপদী আমার সসংকোচে পড়ে গেলেম ত্বরা।

পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝেঁকে—
'দাদামশায়, শাবাশ!
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।'
খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, 'দেখ্ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয়কাকা।'

আকা-মারু জাহাজ। গঙ্গা
২৭ অক্টোবর [১৯২৭]

আশীর্বাদ

তরুণ আশীর্বাদপ্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদন
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে।
ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, 'আশীর্বাদ মাগি
হে প্রাচীন সরোবর।' সরোবর কহিল হাসিয়া,
'আশিস তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাতসূর্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বীর
বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদনীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হতে,
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি নির্বারিত স্রোতে
সংগীত-উদ্‌বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ, পথরোধী পাষাণসঞ্চয়,
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনার জাগায় উৎসাহ।'

১৪ পৌষ ১৩৩৫

মোহানা

ইরাবতীর মোহানামুখ কেন আপন-ভোলা
সাগর, তব বরন কেন ঘোলা ।
কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া,
রবির পানে গভীর গান গাওয়া ?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠালে এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হল দিঠি ।
আকাশ-সাথে মিলায়ে রঙ আছিলে তুমি সাজি,
ধরার রঙে বিলাস কেন আজি ।
রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে
পায় না সাড়া তোমার অনুভবে ;
প্রভাত চাহে স্বচ্ছ জলে নিজেরে দেখিবারে,
বিফল করি ফিরায়ে দাও তারে ।

নিয়েছ তুমি ইচ্ছা করি আপন পরাজয়,
মানিতে হার নাহি তোমার ভয় ।
বরন তব ধূসর কর, বাঁধন নিয়ে খেল,
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেল ।
এ লীলা তব প্রান্তে শুধু তটের সাথে মেশা,
একটুখানি মাটির লাগে নেশা ।
বিপুল তব বক্ষ-'পরে অসীম নীলাকাশ,
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ ।
ধুলারে তুমি নিয়েছ মানি, তবুও অমলিন,
বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন ।
কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষজাল ।

[ইরাবতীসংগম । বঙ্গসাগর]
৭ কার্তিক ১৩৩৪ । কালীপূজা

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন ।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন ।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন ।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী ।

মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

'অমৃতের পুত্র মোরা'— কাহারা শুনালো বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

দার্জিলিং
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

দুর্দিনে

দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি
কর্মে জড়ায় গ্রন্থি,
মন্থর দিন পাথেয়বিহীন
দীর্ঘ পথের পন্থী;
নির্দয়তম নিন্দার হাস,
নির্মমতম দৈব,
শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস
ফুকারে 'নৈব নৈব'—
হঠাৎ তখন কহে মোরে মন,
'মিথ্যে, এ-সব মিথ্যে,
প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয়
সুর যদি রয় চিত্তে।'

চৌদিক করে যুদ্ধঘোষণ,
দুর্গম হয় পন্থা,
চিন্তায় করে রক্ত শোষণ
প্রখরনখরদন্তা,
নিরানন্দের ঘিরি রহে ঘের,
নাই জীবনের সঙ্গী,
দৈন্য কুরূপ করে বিদ্রূপ
ব্যঙ্গের মুখভঙ্গি—
মন বলে, 'নাই ভাবনা কিছুই
মিথ্যে, এ-সব মিথ্যে,
অন্তর-মাঝে চিরধনী তুই
অন্তবিহীন বিত্তে।'

ভাষাহীন দিন কুয়াশাবিলীন—
মলিন উষার স্বর্ণ,
কল্পনা যত বাদুড়ের মতো
রাতে ওড়ে কালো বর্ণ ;
আবর্জনার অচলপুঞ্জে
যাত্রার পথ রুদ্ধ,
রিক্তকুসুম শুষ্ক কুঞ্জে
বৈশাখ রহে ক্রুদ্ধ—
মন মোরে কয়, 'এ কিছুই নয়,
মিথ্যে, এ-সব মিথ্যে,
আপনায় ভুলে গাও প্রাণ খুলে,
নাচো নিখিলের নৃত্যে।'

বন্ধদুয়ার বিশ্ব বিরাজে,
নিবেছে ঘরের দীপ্তি,
চির-উপবাসী আপনার মাঝে
আপনি না পাই তৃপ্তি,
পদে পদে রয় সংশয় ভয়,
পদে পদে প্রেম ক্ষুণ্ণ,
বৃথা আহ্বান, বৃথা অনুনয়,
সখার আসন শূন্য—
মন বলি উঠে, 'ডুবে যা গভীরে,
মিথ্যে, এ-সব মিথ্যে,
নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভি রে
আপনারি একাকিত্বে।'

আবা-মারু। বঙ্গসাগর
২৬ অক্টোবর ১৯২৭

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ।

পৌষ ১৩৩৮

ভিক্ষু

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর,
নিঃশেষে দে বিদায় রে ।
ভিক্ষাতে শুভলগ্নের ক্ষয়
কোন্ ভুলে তুই ভুলিলি,
ভাণ্ডার তোর পণ্ড-যে হয়,
অর্গলি নাহি খুলিলি ।
আপনারে নিয়ে আবরণ দিয়ে
এ কী কুৎসিত ছলনা ;
জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর,
নিজেরে সে কথা বল না ।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার
মন্ত্র কে নিবি আয় রে ।

কাঙাল যে জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা ।
চির-উপবাসী মিছা-সন্ন্যাসী
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা ।
তোর সাধনায় রত্নমানিক
পথে পথে যাস ছড়ায়ে,
ভিক্ষার ঝুলি, ধিক্ তারে ধিক্,
বহিস নে শিরে চড়ায়ে ।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বজনের দুঃস্বপনের
বন্ধ, ছিঁড়িস তায় রে ।

অঞ্চলে রাতি ভিক্ষার কণা
সঞ্চয় করে তারাতে,
নিয়ে সে পারানি তবু পারিল না
তিমিরসিন্ধু পারাতে।
পূর্বগগন আপনার সোনা
ছড়ালো যখন দ্যুলোকে,
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা
প্রভাত পুরিল পুলকে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে
মন যেন তোর পায় রে।

বাঙ্গালোর
২৩ জুন ১৯২৮

আশীর্বাদী

কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে

তোমারে জননী ধরা
দিল রূপে রসে ভরা
প্রাণের প্রথম পাত্রখানি,
তাই নিয়ে তোলাপাড়া
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া
অর্থ তার কিছুই না জানি।
কোন্ মহারঙ্গশালে
নৃত্য চলে তালে তালে,
ছন্দ তারি লাগে রক্তে তব।
অকারণ কলরোলে
তাই তব অঙ্গ দোলে,
ভঙ্গি তার নিত্য নব নব।
চিন্তা-আবরণ-হীন
নগ্নচিত্ত সারাদিন
লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে,
ভাষাহীন ইশারায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
যাহা-কিছু দেখে আর শোনে।
অস্ফুট ভাবনা যত
অশথপাতার মতো
কেবলই আলোয় ঝিলিমিলি।
কী হাসি বাতাসে ভেসে
তোমারে লাগিছে এসে
হাসি বেজে ওঠে খিলিখিলি।

গ্রহ তারা শশী রবি
সমুখে ধরেছে ছবি
আপন বিপুল পরিচয়।
কচি কচি দুই হাতে
খেলিছ তাহারই সাথে,
নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়।
তুমি সর্ব দেহে মনে
ভরি লহ প্রতিক্ষণে
যে সহজ আনন্দের রস,
যাহা তুমি অনায়াসে ছড়াইছ চারি পাশে
পুলকিত দরশ পরশ,
আমি কবি তারি লাগি
আপনার মনে জাগি,
বসে থাকি জানালার ধারে।
অমরার দূতীগুলি
অলক্ষ্য দুয়ার খুলি
আসে যায় আকাশের পারে।
দিগন্তে নীলিম ছায়া
রচে দূরান্তের মায়া,
বাজে সেথা কী অশ্রুত বেণু।
মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
শুনিছে রৌদ্রের সুর,
মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু।
চোখের দেখাটি দিয়ে
দেহ মোর পায় কী এ,
মন মোর বোবা হয়ে থাকে।
সব আছে আমি আছি,
দুইয়ে মিলে কাছাকাছি
আমার সকল-কিছু ঢাকে।
যে আশ্বাসে মর্তভূমি
হে শিশু, জাগাও তুমি,
যে নির্মল যে সহজ প্রাণে,
কবির জীবনে তাই
যেন বাজাইয়া যাই
তারই বাণী মোর যত গানে।
ক্লান্তিহীন নব আশা
সেই তো শিশুর ভাষা
সেই ভাষা প্রাণদেবতার,
জরার জড়ত্ব ত্যেজে
নব নব জন্মে সে যে
নব প্রাণ পায় বারংবার।

নৈরাশ্যের কুহেলিকা
উষার আলোকটিকা
ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়,
বাধার পশ্চাতে কবি
দেখে চিরন্তন-রবি
সেই দেখা শিশুচক্ষে ভায়।
শিশুর সম্পদ বয়ে
এসেছ এ লোকালয়ে,
সে সম্পদ থাক্ অমলিনা।
যে বিশ্বাস দ্বিধাহীন
তারই সুরে চিরদিন
বাজে যেন জীবনের বীণা।

দার্জিলিং
৮ কার্তিক ১৩৩৮

অবুঝ মন

অবুঝ শিশুর আবছায়া এই নয়ন-বাতায়নের ধারে
আপনাভোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উঁকি মারে।
বিনাভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন আঁকুবাঁকুর খেলা—
হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলা,
হঠাৎ অকারণ
কী উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জন।
হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে,
অর্থবিহীন কোন্ দিকে তার লক্ষ ছোটে।
বাহির-ভুবন হতে
আলোর লীলায় ধ্বনির স্রোতে
যে বাণী তার আসে প্রাণে
তারি জবাব দিতে গিয়ে কী-যে জানায় কেই তা জানে।

এই-যে অবুঝ এই-যে বোবা মন
প্রাণের 'পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনুক্ষণ,
সর্ব দিকেই সর্বদা উন্মুখ,
আপনারই চাঞ্চল্য নিয়ে আপনি সমুৎসুক—
নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
ইহার যাত্রা আদিম যুগের নায়ে।
বিশ্বকবির মানস-সরোবরে
প্রাতঃস্নানের পরে
প্রাণের সঙ্গে বাহির হল, তখন অন্ধকার,
নিয়ে এল ক্ষীণ আলোটি তার।
তারই প্রথম ভাষাবিহীন কূজনকাকলি যে
বনে বনে শাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে বীজে

অঙ্কুরে অঙ্কুরে
উঠল জেগে ছন্দে সুরে সুরে ।
সূর্য-পানে অবাক আঁখি মেলি
মুখরিত উচ্ছল তার কেলি ।

নানারূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে,
বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে ।
রোদবাদলে করুণ কান্না হাসি ।
সদাই ওঠে আভাসি উচ্ছ্বাসি ।

ওই-যে শিশুর অবুঝ ভোলা মন
তরীর কোণে বসে বসে দেখছি তারই আকুল আন্দোলন ।
মাঝে-মাঝে সাগর-পানে তাকিয়ে দেখি যত
মনে ভাবি, ও যেন এই শিশু-আঁখির মতো,
আকাশ-পানে আবছায়া ওর চাওয়া
কোন্ স্বপনে-পাওয়া,
অন্তরে ওর যেন সে কোন্ অবুঝ ভোলা মন
এ তীর হতে ও তীর -পানে দুলছে অনুক্ষণ ।
কেমন কলভাষে
প্রলয়কাঁদন কাঁদে ও যে প্রবল হাসি হাসে
আপ্‌নিও তার অর্থ আছে ভুলে—
ক্ষণে ক্ষণে শুধুই ফুলে ফুলে
অকারণে গর্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মূঢ় বাহু তুলে ।

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্‌নারে তার অধীর অন্বেষণ ।
ঘর হতে ধায় আঙন-পানে, আঙন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে ;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে ধুলায় আকাশ ব্যেপে ;
হঠাৎ খেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি-'পরে বেড়ায় মাথা কুটে ।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া ।
হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে
অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত-পানে ;
আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা ।

আবা-মারু জাহাজ
২০ অক্টোবর ১৯২৭

পরিণয়

সুরমা ও সুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহ উপলক্ষে

ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে,
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে।
আনন্দের দিব্যমূর্তি সে-যে,
দীপ্ত বীরতেজে
উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি
তোমাদের প্রাঙ্গণেতে হাঁক দিল, 'এসেছি অতিথি।'

জ্বালো গো মঙ্গলদীপ, করো অর্ঘ্য দান
তনু মনপ্রাণ।
ও যে সুরভবনের রমার কমলবনবাসী,
মর্তে নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বাঁশি।
ধরার ধূলির 'পরে
মিশাইল কী আদরে
পারিজাতরেণু।
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু
অলক্ষ্য অমৃতরস দান করে
অন্তরে অন্তরে।
এল প্রেম চিরন্তন, দিল দোঁহে আনি
রবিকরদীপ্ত আশীর্বাণী।

[শান্তিনিকেতন]
২৫ বৈশাখ ১৩৩৮

চিরন্তন

এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চলতেছিল হেঁকে।
হেনকালে নেবুর ডালে স্নিগ্ধ ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে
পথকোণের ঘন বনের থেকে।

এই পাখিটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের 'পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন-মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, 'তুমি আমার প্রিয়।'

সেই ধ্বনিটি কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে
জলের কলরবে
ওপার-পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।
আজ এই পরবাসে
সেই ধ্বনিটি ক্ষুব্ধ পথের পাশে
গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিল আপন বাণী।
বনচ্ছায়ার শীতল শান্তিখানি
প্রভাত-আলোর সঙ্গে করে নিবিড় কানাকানি
ওই বাণীটির বিমল সুরে গভীর রমণীয়—
'তুমি আমার প্রিয়।'

এরই পাশেই নিত্য হানাহানি;
প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি
সরল বিশ্বাস;
কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ।
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথ্বীব্যাপী মানববিভীষিকা
জ্বালায় মানবলোকালয়ে প্রলয়বহ্নিশিখা,
লোভের জালে বিশ্বজগৎ ঘেরে,
ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপন-হানা অন্ধ মানুষেরে।

হেনকালে স্নিগ্ধ ছায়ায় হঠাৎ কোকিল ডাকে
ফুল্ল অশোকশাখে;
পরশ করে প্রাণে
যে শান্তিটি সব-প্রথমে, যে শান্তিটি সবার অবসানে,
যে শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্বচনীয়—
'তুমি আমার প্রিয়।'

পিনাঙ
১৮ অক্টোবর ১৯২৭

কণ্টিকারি

শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে—
তারই উপর লুকিয়ে ব'সে
রোজ সকালে গেঁথেছিলেম ভোরের সুরে গানের মালা।
প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে ছিল আমার মুখোমুখির পালা।

ডানদিকেতে অফলা এক পিচের শাখা ভরে
ফুল ফোটে আর ফুল প'ড়ে যায় ঝরে।
কালো ডানায় হলদে আভাস, কোন্ পাখি সেই অকারণের গানে
ক্লান্তি নাহি জানে—

তেমনিতরো গোলাপলতা লতাবিতান ঢেকে
অজস্র তার ফুলের ভাষায় অন্ত না পায় উদ্দেশহীন ডেকে।
পাইনবনের প্রাচীন তরু তাকায় মেঘের মুখে,
ডালগুলি তার সবুজ ঝরনা ধরার পানে ঝুঁকে
মন্ত্রে যেন থমক লেগে আছে।
দুটি দালিম গাছে
ঘনসবুজ পাতার কোলে কোলে
ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে।

পায়ের কাছে একটি কণ্টিকারি—
অন্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারই,
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে।
মাটির কাছে নত হলে পরে
স্নিগ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে
নীলবরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু এঁকে।

সেদিন যত রচেছিলাম গান
কণ্টিকারির দান
তাদের সুরে স্বীকার করা আছে।
আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
দুঃখদিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে,
হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
মাটির কাছে কণ্টিকারির নীল-সোনালির বাণী।

৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আরেক দিন

স্পষ্ট মনে জাগে,
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ— কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।
সূর্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ওই পাহাড়ে পাইনশাখার পিছে,
নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
আগুনবরন কিরণ রইত লেগে,
দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্বতে পর্বতে—
সামনেতে ওই কাঁকর-ঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।

মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু
একবারও তার হয় নি কামাই কভু।

আজও তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে
পাইন-বনের শেষে,
সুদূর শৈলতলে
সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরনাধারার জলে,
সেই সেকালের মতোই তেমনিধারা
তারার পরে তারা
আলোর মন্ত্র চুপি চুপি শুনায় কানে পর্বতে পর্বতে ;
শুধু আমার কাঁকর-ঢালা পথে
বহুকালের চেনা
ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনও বাজবে না।

আজকে তবু কী প্রত্যাশা জাগল আমার মনে—
চলতে চলতে গেলেম অকারণে
ডাকঘরে সেই মাইল-তিনেক দূরে।
দ্বিধাভরে মিনিট-কুড়িক এ-দিক ও-দিক ঘুরে
ডাকবাবুদের কাছে
শুধাই এসে, 'আমার নামে চিঠিপত্তর আছে ?'
জবাব পেলেম, 'কই, কিছু তো নেই।'
শুনে তখন নতশিরে আপন-মনেতেই
অন্ধকারে ধীরে ধীরে
আসছি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে,
শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে—
'মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।'
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশ-বছর-বয়স-কালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকর-ঢালা পথের 'পরে ডাক-পিয়নের পদধ্বনির সুরে।

রঙ্ফিউস জাহাজ
২৩ অগস্ট ১৯২৭

তে হি নো দিবসাঃ

এই অজানা সাগরজলে বিকেলবেলার আলো
লাগল আমার ভালো।
কেউ দেখে কেউ নাই-বা দেখে, রাখবে না কেউ মনে,
এমনতরো ফেলাছড়ার হিসাব কি কেউ গোনে।

এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ ,
কোথা থেকে নামল রে সেই খেপা দিনের মন,
যেদিন অকারণ
হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরই ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ।
লাগত আমায় আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুন দিনের বেদন দিয়ে মেশা।

সে গান যারা শুনত তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু,
আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন করে নিচু।
হয়তো তাদের সারাদিনের মাঝে
পড়ত বাধা একবেলাকার কাজে।
চমক-লাগা নিমেষগুলি সেই
হয়তো বা কার মনে আছে, হয়তো মনে নেই।
জ্যোৎস্নারাতে একলা ছাদের 'পরে
উদার অনাদরে
কাটত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে,
মূল্যবিহীন গানে।

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীন—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপ-হারানো রাধাশ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে,
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়,শুধু হাওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেলা।

মায়র জাহাজ
২ অক্টোবর ১৯২৭

দীপশিল্পী

হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী,
তোমার অরূপ জ্যোতি
রূপ লবে আমার জীবনে,
তারি লাগি একমনে
রচিলাম এই দীপখানি,
মূর্তিমতী এই মোর অভ্যর্থনাবাণী।

এসো এসো করো অধিষ্ঠান,
মোর দীর্ঘ জীবনেরে করো গো চরম বরদান।
হয় নাই যোগ্য তব,
কতবার ভাঙিয়াছি আবার গড়েছি অভিনব—
মোর শক্তি আপনারে দিয়েছে ধিক্কার।
সময় নাহি যে আর,
নিদ্রাহারা প্রহর-যে একে একে হয় অপগত,
তাই আজ সমাপিনু ব্রত।
গ্রহণ করো এ মোর চিরজীবনের রচনারে
ক্ষণকাল স্পর্শ করো তারে।
তার পরে রেখে যাব এ জন্মের এক সার্থকতা,
চিরন্তন সুখ মোর, এই মোর চিরন্তন ব্যথা।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

মানী

উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার
ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো
সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে
নিজেরে পৃথক করি
আছ দিনরাত গৌরবগুরু
কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেখানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে
সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব।

ভক্তেরা মন্দিরে
পূজারির কৃপা বহু-দামে কিনে
পূজা দিয়ে যায় ফিরে
ঝিল্লিমুখর বেণুবীথিকার ছায়ে
আপন নিভৃত গাঁয়ে।
তখন একাকী বৃথা-বিচিত্র
পাষাণভিত্তি-মাঝে
দেবতার বুকে জান সে কী ব্যথা বাজে।
বেদীর বাঁধন করি ধূলিসাৎ
অচলেরে দিয়ে নাড়া
মানুষের মাঝে সে-যে পেতে চায় ছাড়া।

হে রাজা, তোমার পূজা-ঘেরা মন
আপনারে নাহি জানে।
প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙ করা তুমি ঢেলা—
তোমার জীবন সাজানো পুতুল
স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে
আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা
মুক্ত ভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ
লাগুক তোমার শিরে।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

রাজপুত্র

রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী
রাজপুত্র কোথা হতে আসি
শুভক্ষণে দেখা দেয় রূপে
চুপে-চুপে,
জানি বলে জেনেছিনু যারে
তারি মাঝে। আমার সংসারে,
বক্ষে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে
যেন বহুদূর হতে আসা।
তার ভাষা
প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী।

সেদিন বুঝিতে পারে মন
ছিল সে-যে নিশ্চেতন
তুচ্ছতার অন্তরালে
এতকাল মায়ানিদ্রাজালে ।
তার দৃষ্টিপাতে মোরে নূতন সৃষ্টির ছোঁওয়া লাগে,
চিত্ত জাগে ।—
বলি তার পদযুগ চুমি,
'রাজপুত্র তুমি ।'
এতদিন
আত্মপরিচয়হীন
জড়তার পাষাণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গ-মাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা ।
কোন্ মন্ত্রগুণে
সে দুর্ভেদ বাধা যেন দাহিলে আগুনে,
বন্দিনীরে করিলে উদ্ধার,
করি নিলে আপনার,
নিয়ে গেলে মুক্তির আলোকে ।
আজিকে তোমারে দেখি কী নূতন চোখে ।
কুঁড়ি আজ উঠেছে কুসুমি,
বার বার মন বলে, 'রাজপুত্র তুমি ।'

২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮

অগ্রদূত

হে পথিক, তুমি একা ।
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা ।
যে পথে পড়ে নি পায়ের চিহ্ন
সে পথে চলিলে রাতে
আকাশে দেখেছ কোন্ সংকেত,
কারেও নিলে না সাথে ।
তুঙ্গগিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে করিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা ।

প্রথম যেদিন ফাল্গুনতাপে
নবনির্ঝর জাগে,
মহাসুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে ।

আছে আছে আছে, এই বাণী তার
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পথের আহ্বান শুনে
অজানার পানে ছুটে।
সেইমতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে আছে আছে, এ মহামন্ত্র
প্রতি নিশ্বাসে বাজে।

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ।
নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জন
ভীরুজন মরে দুলে,
জনহীন পথে সংশয়মোহ
রহে তর্জনী তুলে।
অলস মনের আপনারই ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে।

নবজীবনের সংকটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী— 'আছে আছে'।

১২ চৈত্র ১৩৩৮

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল। চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে। স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহরশেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট-পানে, প্রথম আলোকে
স্পর্শস্নান হবে তার, এই আশা করি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।
তব নবজাগরণী প্রথম যে-হাসি
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই, এই আছে মনে।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

নির্বাক্

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু
যে কথা আমি বলি নি আর-কারে,
সেদিন বনে মাধবীশাখা নিচু
ফুলের ভারে ভারে।
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা—
গোপন রাতে উঠেছে তারা দুলি
সুরের রঙে রাঙা।

শিরীষবন নতুনপাতা-ছাওয়া
মর্মরিয়া কহিল, 'গাহো গাহো।'
মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
ঘাসের 'পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
কোথাও কিছু ছিল না কৃপণতা।
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে
যত মনের কথা।

মনে হল যে, নীরবে কৃপা যাচে
যা-কিছু আছে তোমার চারি দিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে
চাহিনু অনিমিখে।
সহসা মন উঠিল চমকিয়া
বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিয়া
হেরিনু মুখখানি।

সাগরশেষে দেখেছি একদিন
মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা—
ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন
অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধসম কাঁপিছে থরথরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
বাঁধিব মোর তরী।

তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি
নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
তোমারে নাহি বুঝি।
মুখেতে তব শ্রান্ত এ কী আশা,
শান্তি এ কী, গোপন এ কী প্রীতি,
বাণীবিহীন এ কী ধ্যানের ভাষা,
এ কী সুদূর স্মৃতি;
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে
স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা—
রহিনু বসি লতাবিতান-কোণে,
কহি নি কোনো কথা।

মাঘ ১৩৩৮

প্রণাম

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ বরণ।
তুমি মূল্য দিলে তারে
দুর্লভ পূজার অলংকারে।
ভক্তিসমুজ্জ্বল চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে শুভ্র আলোকে

সে আলো করালো তারে স্নান ;
দীপ্যমান মহিমার দান
পরাইল ললাটের 'পর ।
হোক সে দেবতা কিংবা নর,
তোমারই হৃদয় হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির ছটায়
দিব্য আবির্ভাবে তার প্রকাশ ঘটায় ।
তার পরিচয়খানি
তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী ।
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গপুরী
তোমারই এ প্রীতির মাধুরী ।
যে অমৃত করে পান
ঢালে তাহা তোমারই এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ ।
তব শির নত
দিক্‌রেখায় অরুণের মতো,
তারি 'পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতির্ময় ।

১৭ চৈত্র ১৩৩৮

শূন্যঘর

গোধূলি-অন্ধকারে
পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে ।
ডাকিনু, 'আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো, সাড়া দেহো ।'
ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা ।

বাহিরে বাগানে পুষ্পিত শাখা
গন্ধের আহ্বানে
সংকেত করে কাহারে তাহা কে জানে ।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়ায়ে মালী ।
সিঁড়িটা নির্বিকার
বলে, 'এস আর নাই যদি এস
সমান অর্থ তার ।'

ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়,
'ডুব দিয়ে দেখো সত্তাসাগর-তলায়
বুঝিতে পারিবে, থাকা নাই-থাকা
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া ।'

কেদারা এগিয়ে দিতে কারও নেই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া।
মেয়াদ যখন ফুরোয় কপালে,
হায় রে তখন সেবা
কারেই বা করে কেবা।
মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব— আরে অতএবখানা থাক্
আপাতত ফেরা যাক।

ব্যর্থ আশায় ভারাতুর সেই ক্ষণে
ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
দূরতর হল মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
আকাশ-ভরানো ধূলি
সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মুখেতে রুমাল,
ধোঁয়াটে চশমা চোখে,
মনে হল যত মাইক্রোব-দল
নাকে মুখে সব ঢোকে।
তাই বুঝিলাম, সহজ তো নয়
ফিলজফারের বুদ্ধি।
দরকার করে বহুৎ চিত্তশুদ্ধি।

মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হাসিলাম হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সামনে
হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাত এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ।
বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে
অট্টহাস্যে সহজ করিনু,
ফিরিনু আপন দ্বারে।

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই
না-থাকার ফিলজাফি
মনটাকে ধরে চাপি।

থাকাটা আকস্মিক,
না-থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।
সন্ধেবেলায় আলোটা নিবিয়ে
বসে বসে গৃহকোণে
না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
আঁকিতেছি মনে-মনে।
কালের প্রান্তে চাই,
ওই বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই।
ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ,
বসিবার সেই আরামকেদারা
পুরোপুরি নিঃশেষ।
মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
দুই দুই মালী একেবারে সব মিছে।
ক্রেসান্থেমাম্ কার্নেশনের
কেয়ারি-সমেত তারা
নাই-গহ্বরে হারা।

চেয়ে দেখি দূর-পানে
সেই ভাবীকালের যাহা আছে যেইখানে
উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
সামান্য তাহা অতি—
হেথায় সেথায় বুদ্‌বুদসংহতি।
যাহা নাই তাই বিরাট, বিপুল, মহা।
অনাদি অতীত যুগের প্রবাহ-বহা
অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
নাই নাই হায়, নাই সে কোথাও আর।

'দূর করো ছাই,' এই বলে শেষে
যেমনি জ্বালিনু আলো
ফিলজফিটার কুয়াশা কোথা মিলালো।
স্পষ্ট বুঝিনু যা-কিছু সমুখে আছে,
চক্ষের 'পরে যাহা বক্ষের কাছে
সেই তো অন্তহীন
প্রতিপল প্রতিদিন।
যা আছে তাহারই মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালের যে ছিলেম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেই।

বাঁধিয়া রেখেছে এই মুহূর্তজাল
সমস্ত ভাবীকাল।

অতএব সেই কেদারাটা যেই
জানালায় লব টানি,
বসিব আরামে, সে মুহূর্তেরে
চিরদিবসের জানি।
অতএব জেনো সন্ন্যাসী হব নাকো,
আরবার যদি ডাকো
আবার সে ওই মাইক্রোব-ওড়া পথে
চলিব মোটর-রথে।
ঘরে যদি কেহ রয়
নাই ব'লে তারে ফিলজফারের
হবে নাকো সংশয়।
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্‌
কবি তবে কবে, 'এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্‌।'

চৈত্র ? ১৩৩৮

দিনাবসান

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই-বা হল নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনাল দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ।

আমি জানি মনে-মনে
সেঁউতি যূথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।

বর্ষা-শরৎ-বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরি
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন-'পরে
স্নিগ্ধশ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখির কলরবে।

জানি আমি এই বারতা
রইবে অরণ্যেতে—
ওদের সুরে কবির কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাগুন হাওয়ায় শ্রাবণধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
উঠবে হঠাৎ বাজি ;
কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ-আলোক লেগে,
এই বারতা উঠবে জেগে
রঙিন বেশে সাজি।
স্মরণসভার আসন আমার
সোনায় দেবে মাজি।

আমার স্মৃতি থাক্‌-না গাঁথা
আমার গীতি-মাঝে
যেখানে ওই ঝাউয়ের পাতা
মর্মরিয়া বাজে।
যেখানে ওই শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণকণামালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি।

শান্তিনিকেতন
২৫ বৈশাখ ১৩৩৩

পথসঙ্গী

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছিলে যে পথের সাথি,
দিবসে এনেছ পিপাসার জল
রাত্রে জ্বেলেছ বাতি।
আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়,
পথ হয় অবসান,
তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর
শুভকামনার দান।
সংসারপথ হোক বাধাহীন,
নিয়ে যাক কল্যাণে,
নব নব ঐশ্বর্য আনুক
জ্ঞানে কর্মে ও ধ্যানে।
মোর স্মৃতি যদি মনে রাখ কভু
এই বলে রেখো মনে—
ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও-বা
ধরে নাই এ জীবনে।

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে আলোকে যায় মিলে।

তেহেরান
৬ মে ১৯৩২

অন্তর্হিতা

তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে
জানিত সে তা মনে—
ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে
কালো চোখের কোণে।
জীবনশিখা নিবিল তার,
ডুবিল তারই সাথে
অবমানিত দুঃখভার
অবহেলার রাতে।

দীপাবলীর থালাতে নাই
তাহার ম্লান হিয়া,
তারায় তারি আলোক তাই
উঠিল উজলিয়া।
স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি
ভাষাবিহীন মুখে,
বহুজনের বাণীরে ঠেলি
বাজে কি তব বুকে।
নিকটে তব এসেছিল যে,
সে কথা বুঝাবারে
অসীম দূরে গিয়েছে ও-যে
শূন্যে খুঁজাবারে।
সেখানে গিয়ে করেছে চুপ,
ভিক্ষা গেল থামি,
তাই কি তার সত্যরূপ
হৃদয়ে এল নামি।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১ আষাঢ় ১৩৩৯

আশ্রমবালিকা

শ্রীমতী মমতা সেনের বিবাহ-উপলক্ষে

আশ্রমের হে বালিকা,
আশ্বিনের শেফালিকা
ফাল্গুনের শালের মঞ্জরি
শিশুকাল হতে তব
দেহে মনে নব নব
যে মাধুর্য দিয়েছিল ভরি,
মাঘের বিদায়ক্ষণে
মুকুলিত আম্রবনে
বসন্তের যে নবদূতিকা,
আষাঢ়ের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসি,
শ্রাবণের যে সিক্তযূথিকা,
ছিল ঘিরে রাত্রিদিন
তোমারে বিচ্ছেদহীন
প্রান্তরের যে শান্তি উদার,
প্রত্যুষের জাগরণে
পেয়েছ বিস্মিত মনে
যে আস্বাদ আলোকসুধার,

আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে
যখন উঠিত জেগে
আকাশের নিবিড় ক্রন্দন,
মর্মরিত গীতিকায়
সপ্তপর্ণবীথিকায়
দেখেছিলে যে প্রাণস্পন্দন,
বৈশাখের দিনশেষে
গোধূলিতে রুদ্রবেশে
কালবৈশাখীর উন্মত্ততা—
সে ঝড়ের কলোল্লাসে
বিদ্যুতের অট্টহাসে
শুনেছিলে যে-মুক্তিবারতা,
পউষের মহোৎসবে
অনাহত বীণারবে
লোকে লোকে আলোকের গান
তোমার হৃদয়দ্বারে
আনিয়াছে বারে বারে
নবজীবনের যে আহ্বান,
নববরষের রবি
যে উজ্জ্বল পুণ্যছবি
এঁকেছিল নির্মল গগনে,
চিরনূতনের জয়
বেজেছিল শূন্যময়
বেজেছিল অন্তর-অঙ্গনে,
কত গান কত খেলা,
কত-না বন্ধুর মেলা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় আরাধনা,
বিহঙ্গকূজন-সাথে
গাছের তলায় প্রাতে
তোমাদের দিনের সাধনা,
তারই স্মৃতি শুভক্ষণে
সমস্ত জীবনে মনে
পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত করি ভরপুর
নিত্য তারা দিক সুর
জনতার কঠোর কল্লোলে।
নবীন সংসারখানি
রচিতে হবে যে জানি
মাধুরীতে মিশায়ে কল্যাণ,
প্রেম দিয়ে প্রাণ দিয়ে
কাজ দিয়ে গান দিয়ে

ধৈর্য দিয়ে, দিয়ে তব ধ্যান—
সে তব রচনা-মাঝে
সব ভাবনায় কাজে
তারা যেন উঠে রূপ ধরি,
তারা যেন দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।
সুখী হও, সুখী রহো
পূর্ণ করো অহরহ
শুভকর্মে জীবনের ডালা,
পুণ্যসূত্রে দিনগুলি
প্রতিদিন গেঁথে তুলি
রচি লহো নৈবেদ্যের মালা।
সমুদ্রের পার হতে
পূর্বপবনের স্রোতে
ছন্দের তরণীখানি ভ'রে
এ প্রভাতে আজই তোরই
পূর্ণতার দিন স্মরি
আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে।

রোহিতসাগর
১৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩৩৩]

বধূ

শ্রীমতী অমিতা সেনের পরিণয় উপলক্ষে

মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্‌বেল উদ্যম
গর্জি উঠে ; অতীত তিমিরগর্ভ হতে তুরঙ্গম
তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে ; উন্মেষিছে মহাভবিষ্যৎ।
বর্তমান কালতটে অগ্নিগর্ভ অপূর্ব পর্বত
সদ্যোজাত মহিমায় উড়ায় উজ্জ্বল উত্তরীয়
নব সূর্যোদয়-পানে। যে অদৃষ্ট, যে অভাবনীয়
মানুষের ভাগ্যলিপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে
দৃপ্ত বীরমূর্তি ধরি, দেখিয়াছি ; তার কণ্ঠস্বরে
শুনেছি দীপক রাগে সৃষ্টিবাণী মরণবিজয়ী
প্রাণমন্ত্রে।
এই ক্ষুব্ধ যুগান্তর-মাঝে বৎসে অয়ি,
তোমারে হেরিনু বধূবেশে, নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা,
সহসা মিলিছ সরোবরে, চটুল চঞ্চল লীলা
গভীরে করিছ মগ্ন ; নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
নবজীবনের সৃষ্টি-রহস্য করিছ উন্মোচন।

ইতিহাসবিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্বদুঃখসুখে
দেশে দেশে যে-বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে, নরনারীহৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই সৃষ্টিলীলা জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ইতিহাসে।

[শান্তিনিকেতন]
৩ আষাঢ় ১৩৩৯

মিলন

শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ-উপলক্ষে

সেদিন উষার নববীণাঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরপারে
পাখিদুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের-ছায়া-ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা।

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথি,
কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি—
পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারি দিক হতে বিরাটের মহাবাণী
শুনালো দোঁহারে ভাষার অতীত কথা।

মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।
দোঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসি উঠে ধ্বনি—
'প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।'
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এল তারই,
এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি,
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে।

দার্জিলিং
১৭ কার্তিক ১৩৩৮

স্পাই

শক্ত হল রোগ,
হপ্তা-পাঁচেক ছিল আমার ভোগ।
একটুকু যেই সুস্থ হলেম পরে
লোক ধরে না ঘরে,
ব্যামোর চেয়ে অনেক বেশি ঘটালো দুর্যোগ।
এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান,
এল পোলিটিশান,
এল গোকুল সংবাদপত্রের,
খবর রাখে সকল পাড়ার নাড়ীনক্ষত্রের।
কেউ-বা বলে 'বদল করো হাওয়া',
কেউ-বা বলে 'ভালো ক'রে করবে খাওয়াদাওয়া'।
কেউ-বা বলে 'মহেন্দ্র ডাক্তার
এই ব্যামোতে তার মতো কেউ ওস্তাদ নেই আর'।
দেয়াল ঘেঁষে ওই যে সবার পাছে
সতীশ বসে আছে।
থাকে সে এই পাড়ায়,
চুলগুলো তার ঊর্ধ্বে তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়।
চোখে চশমা আঁটা,
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।
গলার বোতাম খোলা
প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে-ভোলা।
সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কী-যে লেখে, হয়তো-বা সে কবি,
কিংবা আঁকে ছবি।
নবীন আমায় শোনায় কানে-কানে,
ওই ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সেই জানে—
যাকে বলে 'স্পাই',
সন্দেহ তার নাই।
আমি বলি, হবেও বা, ভক্তিনম্র নিরীহ ওই মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেমনি হেয় হয়,
ঘৃণা করব, কেন করব ভয়।

এই বছরে বছরখানেক বেড়িয়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মীরে।
এলেম যখন ফিরে ;
এল গণেশ পল্টু এল, এল নবীন পাল,
এল মাখনলাল।

হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু,
মুখটা কাঁচুমাচু।
'মনিব কোথায়' শুধাই আমি তারে,
'সতীশ কোথায় হাঁ রে।'
নবীন বললে, 'খবর পান নি তবে—
দিন-পনেরো হবে
উপোস করে মারা গেল সোনার-টুকরো ছেলে
নন্‌-ভায়োলেন্‌স্‌ প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।'
পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা,
খুলে দেখি পাতার পরে পাতা—
দেশের কথা কী বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে,
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
আজকে বসে বসে ভাবি, মুখের কথাগুলো
ঝরা পাতার মতোই তারা ধুলোয় হত ধুলো।
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ
মৃত্যুসুধার নিত্যপরশ দিয়ে।

শান্তিনিকেতন
৩ আষাঢ় ১৩৩৯

ধাবমান

'যেয়ো না, যেয়ো না' বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে।
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে ;
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকালসমুদ্রের 'পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর-মাঝে—
'নয় নয় নয়'।
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্তর প্রলয়।

যাবে সব যাবে চলে, তবু ভালোবাসি—
চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।

মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান ;
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শাশ্বতের দীপশিখা
উজ্জ্বলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা
অতল কান্নার স্রোত মাতার করুণ স্নেহ বয়,
প্রিয়ের হৃদয়বিনিময় ।
বিলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীর্যমদ
ধরণীর সৌন্দর্যসম্পদ ।

অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে ।
কাল ব্যাপি রহে নাই রহে
তবু সে মহান ;
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ ।
ধায় যবে বিদায়ের রথ
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি ।
যতটুকু ধূলি
আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী রহে, না তুচ্ছ সে বিচার ।
বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে ।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে ।

৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

তাকিয়ে দেখি পিছে
সেদিন ভালোবেসেছিলেম,
দিন না যেতেই হয়ে গেল মিছে ।
বলার কথা পাই নি আমি খুঁজে
আপনা হতে নেয় নি কেন বুঝে,
দেবার মতন এনেছিলেম কিছু;
ডালির থেকে পড়ে গেল নীচে ।

ভরসা ছিল না যে,
তাই তো ভেবে দেখি নি হায়
কী ছিল তার হাসির দ্বিধা-মাঝে।
গোপন বীণা সুরেই ছিল বাঁধা,
ঝংকার তায় দিয়েছিল আধা,
সংশয়ে আজ তলিয়ে গেল কোথা,
পাব কি তায় দুঃখসাগর সিচে।

হায় রে গরবিনী,
বারেক তব করুণ চাহনিতে
ভীরুতা মোর লও নি কেন জিনি।
যে মণিটি ছিল বুকের হারে
ফেলে দিলে কোন্ খেদে হায় তারে,
ব্যর্থ রাতের অশ্রুফোঁটার মালা
আজ তোমার ওই বক্ষে ঝলকিছে।

৯ আষাঢ় ১৩৩৯

বিচার

বিচার করিয়ো না।
যেখানে তুমি রয়েছ, সে তো
জগতে এক কোণা।
যেটুকু তব দৃষ্টি যায়
সেটুকু কতখানি,
যেটুকু শোন তাহার সাথে
মিশাও নিজবাণী।
মন্দ ভালো সাদা ও কালো
রাখিছ ভাগে ভাগে।
সীমানা মিছে আঁকিয়া তোল
আপন-রচা দাগে।

সুরের বাঁশি যদি তোমার
মনের মাঝে থাকে,
চলিতে পথে আপন-মনে
জাগায়ে দাও তাকে।
গানের মাঝে তর্ক নাই,
কাজের নাই তাড়া।
যাহার খুশি চলিয়া যাবে,
যে খুশি দিবে সাড়া।

হোক-না তারা কেহ-বা ভালো
কেহ-বা ভালো নয়,
এক পথেরই পথিক তারা
লহো এ পরিচয় ।

বিচার করিয়ো না ।
হায় রে হায়, সময় যায়,
বৃথা এ আলোচনা ।
ফুলের বনে বেড়ার কোণে
হেরো অপরাজিতা
আকাশ হতে এনেছে বাণী,
মাটির সে যে মিতা ।
ওই তো ঘাসে আষাঢ়মাসে
সবুজে লাগে বান—
সকল ধরা ভরিয়া দিল
সহজ তার দান ।
আপনা ভুলি সহজ সুখে
ভরুক তব হিয়া,
পথিক, তব পথের ধন
পথেরে যাও দিয়া ।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]
১০ আষাঢ় ১৩৩৯

পুরানো বই

আমি জানি
পুরাতন এই বইখানি ।—
অপঠিত, তবু মোর ঘরে
আছে সমাদরে ।
এর ছিন্ন পাতে পাতে তার
বাষ্পাকুল করুণার
স্পর্শ যেন রয়েছে বিলীন ;
সে যে আজ হল কতদিন ।

সরল দুখানি আঁখি ঢলোঢলো,
বেদনার আভাসেই করে ছলোছলো ;
কালোপাড় শাড়িখানি মাথার উপর দিয়ে ফেরা,
দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্ত্বনায় ঘেরা ।
জনহীন দ্বিপ্রহরে
এলোচুল মেলে দিয়ে বালিশের 'পরে,
এই বই তুলে নিয়ে বুকে
একমনে স্নিগ্ধমুখে
বিচ্ছেদকাহিনী যায় পড়ে ।

জানালা-বাহিরে শূন্যে ওড়ে
পায়রার ঝাঁক,
গলি হতে দিয়ে যায় ডাক
ফেরিওলা,
পাপোশের 'পরে ভোলা
ভক্ত সে কুকুর
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ছাড়ে আর্তসুর।
সময়ের হয়ে যায় ভুল ;
গলির ও পারে স্কুল,
সেথা হতে বাজে যবে
কাংস্যরবে
ছুটির ঘণ্টার ধ্বনি,
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখনই
তাড়াতাড়ি
ওঠে সে শয়ন ছাড়ি,
গৃহকার্যে চলে যায় সচকিতে
বইখানি রেখে কুলুঙ্গিতে।
অন্তঃপুর হতে অন্তঃপুরে
এই বই ফিরিয়াছে দূর হতে দূরে।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে
খ্যাতি এর ব্যাপিয়াছে দক্ষিণে ও বামে।

তার পরে গেল সেই কাল,
ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মায়াজাল।
এ লজ্জিত বই
কোনো ঘরে স্থান এর কই।
নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়
ভেবে নাহি পায়
এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।

জানালা-বাহিরে নীচে ট্রাম যায় চলি।
প্রশস্ত হয়েছে গলি।
চলে গেছে ফেরিওলা, সে পসরা তার
বিকায় না আর।
ডাক তার ক্লান্ত সুরে
দূর হতে মিলাইল দূরে।
বেলা চলে গেল কোন্ ক্ষণে,
বাজিল ছুটির ঘণ্টা ও পাড়ার সুদূর প্রাঙ্গণে।

কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]
১১ আষাঢ় ১৩৩৯

বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। সে বিরাট
ধ্বংসধারা-মাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে, এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে,
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারই ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—
জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]
১২ আষাঢ় ১৩৩৯

অগোচর

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি,
হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইতিহাস
ঢাকা দিয়ে আসে যায় দিনের আলোয়
রাতের আঁধারে।
সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ,
নিজেও জানে না কোনো লোক।

মুখর আলাপ তার, উচ্চস্বরে কত আলোচনা,
তারই অন্তস্তলে
বিচিত্র বিপুল
স্মৃতিবিস্মৃতির সৃষ্টিরাশি।
সেখানে তো শব্দ নেই, আলো নেই,
বাইরের দৃষ্টি নেই,
প্রবেশের পথ নেই কারও।
সংখ্যাহীন মানুষের
এই-যে প্রচ্ছন্ন বাণী, অশ্রুত কাহিনী
কোন্ আদিকাল হতে
অন্তঃশীল অগণ্য ধারায়
আঁধার মৃত্যুর মাঝে মেশে রাত্রিদিন,
কী হল তাদের,
কী এদের কাজ।

হে প্রিয়, তোমার যতটুকু
দেখেছি শুনেছি
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ করি—
তার বহুশতগুণ অদৃশ্য অশ্রুত
রহস্য কিসের জন্য বন্ধ হয়ে আছে,
কার অপেক্ষায়।
সে নিরালা ভবনের
কুলুপ তোমার কাছে নেই।
কার কাছে আছে তবে।
কে মহা-অপরিচিত যার অগোচর সভাতলে
হে চেনা-অপরিচিত, তোমার আসন ?
সেই কি সবার চেয়ে জানে
আমাদের অন্তরের অজানারে।
সবার চেয়ে কি বড়ো তার ভালোবাসা
যার শুভদৃষ্টি-কাছে
অব্যক্ত করেছে অবগুণ্ঠন মোচন।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

সান্ত্বনা

যে বোবা দুঃখের ভার
ওরে দুঃখী, বহিতেছ, তার কোনো নেই প্রতিকার।
সহায় কোথাও নাই, ব্যর্থ প্রার্থনায়
চিত্তদৈন্য শুধু বেড়ে যায়।

ওরে বোবা মাটি,
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি

বহিয়া বিশ্বের বোঝা দুঃখবেদনার
বক্ষে আপনার
বহু যুগ ধরে ।
বোবা গাছ ওরে,
সহজে বহিস শিরে বৈশাখের নির্দয় দাহন—
তুই সর্বসহিষ্ণু বাহন
শ্রাবণের
বিশ্বব্যাপী প্লাবনের ।

তাই মনে ভাবি,
যাবে নাবি
সর্ব দুঃখ সন্তাপ নিঃশেষে
উদার মাটির বক্ষোদেশে,
গভীর শীতল
যার স্তব্ধ অন্ধকারতল
কালের মথিত বিষ নিরন্তর নিতেছে সংহরি ।
সেই বিলুপ্তির 'পরে দিবাবিভাবরী
দুলিছে শ্যামল তৃণস্তর
নিঃশব্দ সুন্দর ।
শতাব্দীর সব ক্ষতি সব মৃত্যুক্ষত
যেখানে একান্ত অপগত
সেইখানে বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীর
সূর্যোদয়-পানে তোলে শির,
পুষ্প তার পত্রপুটে
শোভা পায় ধরিত্রীর মহিমামুকুটে ।

বোবা মাটি, বোবা তরুদল,
ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল
স্তব্ধতায় মিলাইছ প্রতি মুহূর্তেই—
নির্বাক সান্ত্বনা সেই
তোমাদের শান্তরূপে দেখিলাম,
করিনু প্রণাম ।
দেখিলাম সব ব্যথা প্রতিক্ষণে লইতেছে জিনি
সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী
সর্ব-অবসানে
শব্দহীন গানে ।

১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

ছোটো প্রাণ

ছিলাম নিদ্রাগত,
সহসা আর্তবিলাপে কাঁদিল
রজনী ঝঞ্ঝাহত।
জাগিয়া দেখিনু পাশে
কচি মুখখানি সুখনিদ্রায়
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে।
সংসার-'পরে এই বিশ্বাস
দৃঢ় বাঁধা স্নেহডোরে
বজ্র-আঘাতে ভাঙে তা কেমন ক'রে।

সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী
লিখে ইতিহাস জুড়ে।
শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ
তুলিছে আকাশ ফুঁড়ে।
সম্পদসমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণমরীচিমোহ।
সেথায় আঘাতসংঘাতবেগে
ভাঙাচোরা যত হোক
তার লাগি বৃথা শোক।

কিন্তু হেথায় কিছু তো চাহে নি এরা।
এদের বাসাটি ধরণীর কোণে
ছোটো-ইচ্ছায় ঘেরা।
যেমন সহজে পাখির কুলায়
মৃদুকণ্ঠের গীতে
নিভৃত ছায়ায় ভরা থাকে মাধুরীতে।
হে রুদ্র, কেন তারও 'পরে বাণ হানো,
কেন তুমি নাহি জানো
নির্ভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমার আলো।

১৬ আষাঢ় ১৩৩৯

নিরাবৃত

যবনিকা-অন্তরালে মর্ত পৃথিবীতে
ঢাকা-পড়া এই মন। আভাসে ইঙ্গিতে
প্রমাণে ও অনুমানে আলোতে আঁধারে
ভাঙা খণ্ড জুড়ে সে যে দেখেছে আমারে
মিলায়ে তাহার সাথে নিজ অভিরুচি
আশা তৃষা। বার বার ফেলেছিল মুছি
রেখা তার; মাঝে-মাঝে করিয়া সংস্কার
দেখেছে নূতন করে মোরে। কতবার
ঘটেছে সংশয়। এই-যে সত্যে ও ভুলে
রচিত আমার মূর্তি, সংসারের কূলে
এ নিয়ে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
এরে ভালোবেসেছিল, এরে নিয়ে খেলা
সাঙ্গ করে চলে গেছে।

বসে একা ঘরে
মনে-মনে ভাবিতেছি আজ— লোকান্তরে
যদি তার দিব্য আঁখি মায়ামুক্ত হয়
অকস্মাৎ, পাবে যার নব পরিচয়
সে কি আমি। স্পষ্ট তারে জানুক যতই
তবু যে অস্পষ্ট ছিল তাহারি মতোই
এরে কি আপনি রচি বাসিবে সে ভালো।
হায় রে মানুষ এ যে। পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে, সৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।
সে মায়াতে বেঁধেছিনু মর্তে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর, অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিনু, মর্তপাত্রে পেয়েছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্মম সে যে স্তব্ধ অনাবৃত।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

মৃত্যুঞ্জয়

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।

ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে
তোমার ভ্রুকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত—
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে নাকি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত ?'
নামিল আঘাত।
এইমাত্র ? আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো ব'লে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

অবাধ

সরে যা, ছেড়ে দে পথ,
দুর্ভর সংশয়ে ভারী তোর মন পাথরের পারা।
হালকা প্রাণের ধারা
দিকে দিকে ওই ছুটে চলে
কলকোলাহলে
দুরন্ত আনন্দভরে।
ওরাই যে লঘু করে
অতীতের পুরাতন বোঝা।
ওরাই তো করে দেয় সোজা
সংসারের বক্র ভঙ্গি চঞ্চল সংঘাতে।
ওদের চরণপাতে
জটিল জালের গ্রন্থি যত
হয় অপগত।
মলিনতা দেয় মেজে,
শ্রান্তি দূর করে ওরা ক্লান্তিহীন তেজে।

ওরা সব মেঘের মতন
প্রভাতকিরণপায়ী— সিন্ধুর তরঙ্গ অগণন,
ওরা যেন দিশাহারা হাওয়ার উৎসাহ,
মাটির হৃদয়জয়ী নিরন্তর তরুর প্রবাহ ;
প্রাচীনরজনীপ্রান্তে ওরা সবে প্রথম আলোক ।
ওরা শিশু, বালিকা বালক,
ওরা নারী তারুণ্যে উজ্জ্বল ।
ওরা যে নির্ভীক বীরদল
যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দুর্গ হানে,
সম্পদেরে উদ্ধারিয়া আনে ।
পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলে ঝংকারিয়া
অন্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া ।
আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়,
আগামী কালেরে করে জয় ।

চলেছে চলেছে ওরা চারি দিক হতে
আঁধারে আলোতে,
সম্মুখের পানে
অজ্ঞাতের টানে ।
তুই সরে যা রে
ওরে ভীরু, ভারাতুর সংশয়ের ভারে ।

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

যাত্রী

যে কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি ।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা ।
একে একে পাখি যায়, গানের পসরা ।
কোথাও না হয় শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুণ্ণ
বিপুল সংসার ।
দুঃখ শুধু তোমার আমার
নিমেষের বেড়া-ঘেরা এখানে ওখানে ।
সে বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে ।
ওরে তুমি, ওরে আমি,
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি ।

কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রীতারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় শেষে।
তোমার হৃদয়তাপ
তোমার বিলাপ
চাপা থাক্ আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,
দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—
যে শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
আত্মসমাহিত ;
দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন, যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হল যে শান্তির অন্তিম তিমিরে ;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যানপূণ্য রাতে
হারায় যে শান্তিসিন্ধু আপনারি অন্ত আপনাতে ;
যে শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে প্রেম শরীরমন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
সে পরম শান্তি-মাঝে হোক তব অচঞ্চল স্থিতি।

৮ আষাঢ় ১৩৩৯

মিলন

তোমারে দিব না দোষ। জানি মোর ভাগ্যের ভ্রূকুটি,
ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত, যত তার ত্রুটি,
যত ব্যথা আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে
অহরহ। জানি যে তুমি তো নাই ছাড়ায়ে আমারে
নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে। আমি মোর তোমাতে বিরাজে,
দেওয়া-নেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত তুমি-আমি-মাঝে
দুর্গম বাধারে অতিক্রমি। আমার সকল ভার
রাত্রিদিন রয়েছে তোমারি 'পরে, আমার সংসার
সে শুধু আমারি নহে। তাই ভাবি এই ভার মোর
যেন লঘু করি নিজবলে, জটিল বন্ধনডোর

একে একে ছিন্ন করি যেন, মিলিয়া সহজ মিলে
দ্বন্দ্বহীন বন্ধহীন বিচরণ করি এ নিখিলে
না চেয়ে আপনা-পানে। অশান্তিরে করি দিলে দূর
তোমাতে আমাতে মিলি ধ্বনিয়া উঠিবে এক সুর।

১৯ আষাঢ় ১৩৩৯

আগন্তুক

এসেছি সুদূর কাল থেকে।
তোমাদের কালে
পৌঁছলেম যে সময়ে
তখন আমার সঙ্গী নেই।
ঘাটে ঘাটে কে কোথায় নেবে গেছে।
ছোটো ছোটো চেনা সুখ যত,
প্রাণের উপকরণ,
দিনের রাতের মুষ্টিদান
এসেছি নিঃশেষ করে বহুদূর পারে।
এ জীবনে পা দিয়েছি প্রথম যে কালে
সে কালের 'পরে অধিকার
দৃঢ় হয়েছিল দিনে দিনে
ভাবে ও ভাষায়,
কাজে ও ইঙ্গিতে,
প্রণয়ের প্রাত্যহিক দেনাপাওনায়।
হেসে খেলে কোনোমতে সকলের সঙ্গে বেঁচে থাকা,
লোকযাত্রারথে
কিছু কিছু গতিবেগ দেওয়া,
শুধু উপস্থিত থেকে প্রাণের আসরে
ভিড় জমা করা,
এই তো যথেষ্ট ছিল।

আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইশারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।
ঋতুর বদল হয়ে গেছে—
বাতাসের উলটো-পালটা ঘ'টে
প্রকৃতির হল বর্ণভেদ।
ছোটো ছোটো বৈষম্যের দল
দেয় ঠেলা,
করে হাসাহাসি।

রুচি আশা অভিলাষ
যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ,
তার হল রসবিপর্যয় ।

আমাদের সেকালকে যে সঙ্গ দিয়েছি
যতই সামান্য হোক মূল্য তার
তবু সেই সঙ্গসূত্রে গাঁথা হয়ে মানুষে মানুষে
রচেছিল যুগের স্বরূপ—
আমার সে সঙ্গ আজ
মেলে না যে তোমাদের প্রত্যহের মাপে ।
কালের নৈবেদ্যে লাগে যে-সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে ।
তোমাদের যে বাসার কোণে থাকি
তার খাজনার কড়ি হাতে নেই ।
তাই তো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে ;
উপস্থিত কালের যা দাবি
মিটাবার জন্যে সে তো নয়—
তাই যদি সেই দান তোমাদের রুচিতে না লাগে,
তবে তার বিচার সে পরে হবে ।
তবু যা সম্বল আছে তাই দিয়ে
একালের ঋণ শোধ ক'রে অবশেষে
ঋণী তারে রেখে যাই যেন ।
যা আমার লাভক্ষতি হতে বড়ো,
যা আমার সুখদুঃখ হতে বেশি—
তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই
স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে ।

১১ জুলাই ১৯৩২

জরতী

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি ।
অবসানরজনীতে দীপবর্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে— শুভ্র কেশে ।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যূষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার ।

সন্ধ্যাবেলা
মল্লিকার মালা ছিল গলে,
গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
বাতাসকে করুণ করেছে—

উৎসবশেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির
বীণাগুঞ্জরণ।
শিশিরমন্থর বায়ু,
অশথের শাখা অকম্পিত।
অদূরে নদীর শীর্ণ স্বচ্ছ ধারা কলশব্দহীন,
বালুতটপ্রান্তে চলে ধীরে
শূন্যগৃহ-পানে
ক্লান্তগতি বিরহিণী বধূর মতন।

হে জরতী মহাশ্বেতা,
দেখেছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুক্ল লঘু স্বচ্ছ মেঘে।
নিম্নে শস্যে ভরা খেত দিকে দিকে,
নদী ভরা কূলে কূলে,
পূর্ণতার স্তব্ধতায় বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর।

হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সেই সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি
রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদিমূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার
নামিল তোমার নম্র শিরে
মানসসরোবরের অগাধ সলিলে
অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।

১৩ জুলাই ১৯৩২

প্রাণ

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিলমন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।

১৪ জুলাই ১৯৩২

সাথি

তখন বয়স সাত।
মুখচোরা ছেলে,
একা একা আপনারি সঙ্গে হত কথা।
মেঝে বসে
ঘরের গরাদেখানা ধরে
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
বয়ে যেত বেলা।
দূরে থেকে মাঝে-মাঝে ঢঙ ঢঙ করে
বাজত ঘণ্টার ধ্বনি,
শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হাঁক।
হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে।
ও পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।
গলির মোড়ের কাছে দত্তদের বাড়ি,
কাকাতুয়া মাঝে-মাঝে উঠত চীৎকার করে ডেকে।
একটা বাতাবিলেবু, একটা অশথ,
একটা কয়েতবেল, একজোড়া নারকেলগাছ,
তারাই আমার ছিল সাথি।
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ,
মনে-মনে সে ছুটি আমার।
আপনারি ছায়া নিয়ে
আপনার সঙ্গে যে খেলাতে
তাদের কাটত দিন
সে আমারি খেলা।

তারা চিরশিশু
আমার সমবয়সী।
আষাঢ়ে বৃষ্টির ছাঁটে, বাদল-হাওয়ায়,
দীর্ঘ দিন অকারণে
তারা যা করেছে কলরব,
আমার বালকভাষা
হো-হো শব্দ করে
করেছিল তারি অনুবাদ।

তার পরে একদিন যখন আমার
বয়স পঁচিশ হবে,
বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে
ওই জানালায়
বিজনে কেটেছে বেলা।
অশথের কম্পমান পাতায় পাতায়
যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশা
পেয়েছে আপন সাড়া।
সকরুণ মুলতানে গুন্ গুন্ গেয়েছি যে গান
রৌদ্রে-ঝিলিমিলি সেই নারকেলডালে
কেঁপেছিল তারি সুর।
বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথিহারা রাতে
এনেছে আমার প্রাণে
দূর শয্যাতল থেকে
সিক্ত আঁখি আর কার উৎকণ্ঠিত বেদনার বাণী।
সেদিন সে গাছগুলি
বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের বয়স্য আমার।

তার পরে অনেক বৎসর গেল,
আরবার একা আমি।
সেদিনের সঙ্গী যারা
কখন চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে।
আবার আরেকবার জানলাতে
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে।
আজ দেখি সে অশ্বত্থ, সেই নারকেল
সনাতন তপস্বীর মতো।
আদিম প্রাণের
যে বাণী প্রাচীনতম
তাই উচ্চারিত রাত্রিদিন
উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে।

সকল পথের আরম্ভেতে
সকল পথের শেষে
পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্ধ হয়ে আছে,
নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
মন্ত্র ওরা প্রতিক্ষণে দিয়েছে আমার কানে-কানে।

১৬ জুলাই ১৯৩২

বোবার বাণী

আমার ঘরের সম্মুখেই
পাকে পাকে জড়িয়ে শিমুলগাছে
উঠেছে মালতীলতা।
আষাঢ়ের রসস্পর্শ
লেগেছে অন্তরে তার।
সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
পল্লবের চিক্কণ হিল্লোলে।
বাদলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘচ্যুত রৌদ্র এসে
ছোঁয়ায় সোনার-কাঠি অঙ্গে তার,
মজ্জায় কাঁপন লাগে,
শিকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী।
যেন কত-কী-যে কথা নীরবে উৎসুক হয়ে থাকে
শাখাপ্রশাখায়।
এই মৌনমুখরতা
সারারাত্রি অন্ধকারে
ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছ্বসিত,
ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে।

আমি একা বসে বসে ভাবি
সকালের কচি আলো দিয়ে রাঙা
ভাঙা ভাঙা মেঘের সমুখে ;
বৃষ্টিধোওয়া মধ্যাহ্নের
গোরু-চরা মাঠের উপরে আঁখি রেখে,
নিবিড় বর্ষণে আর্ত
শ্রাবণের আর্দ্র অন্ধকার রাতে—
নানা কথা ভিড় করে আসে
গহন মনের পথে—
বিবিধ রঙের সাজ,
বিবিধ ভঙ্গিতে আসাযাওয়া—
অন্তরে আমার যেন
ছুটির দিনের কোলাহলে
কথাগুলো মেতেছে খেলায়।

তবুও যখন তুমি আমার আঙিনা দিয়ে যাও
ডেকে আনি, কথা পাই নে তো।
কখনো যদি বা ভুলে কাছে আস
বোবা হয়ে থাকি।
অবারিত সহজ আলাপে
সহজ হাসিতে
হল না তোমার অভ্যর্থনা।
অবশেষে ব্যর্থতার লজ্জায় হৃদয় ভরে দিয়ে
তুমি চলে যাও—
তখন নির্জন অন্ধকারে
ফুটে ওঠে ছন্দে-গাঁথা সুরে-ভরা বাণী ;
পথে তারা উড়ে পড়ে,
যার খুশি সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়।

৩ শ্রাবণ ১৩৩৯

আঘাত

সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি
কুঁকড়ে গিয়েছে ;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই ;
কুরচির গুঁড়িটাতে পড়েছে ছুরির ক্ষত,
কে নিয়েছে ছাল কেটে ;
চারা অশোকের
নীচেকার দুয়েকটা ডালে
শুকিয়ে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে।
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাঞ্ছনা,
তারি মাঝে অরণ্যের অক্ষুণ্ণ মর্যাদা
শ্যামল সম্পদে
তুলেছে আকাশ-পানে পরিপূর্ণ পূজার অঞ্জলি।
কদর্যের কদাঘাতে
দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা,
সে সকলি অধঃসাৎ ক'রে
শান্ত প্রসন্নতা
ধরণীরে ধন্য করে পূর্ণের প্রকাশে।
ফুটিয়েছে ফুল সে যে,
ফলিয়েছে ফলভার,
বিছিয়েছে ছায়া-আস্তরণ,
পাখিরে দিয়েছে বাসা,

মৌমাছিরে জুগিয়েছে মধু,
বাজিয়েছে পল্লবমর্মর।
পেয়েছে সে প্রভাতের পুণ্য আলো,
শ্রাবণের অভিষেক,
বসন্তের বাতাসের আনন্দমিতালি—
পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণরস,
সুগভীর সুবিপুল আয়ু,
পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ।
পেয়েছে সে কীটের দংশন।

১৯ জুলাই ১৯৩২

শান্ত

বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার।
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।
হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি।
সেথা অন্তরলোকে
সিন্ধুপারের প্রভাত-আলোক
জ্বলিছে তাহার চোখে।
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
অপরূপ হয়ে জাগে।
তার দৃষ্টির আগে
বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত-কিছু
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
করে এসে মাথা নিচু।

সিন্ধুতীরের শৈলতটের 'পরে
হিংসামুখর তরঙ্গদল
যতই আঘাত করে—
কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান।

গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল ভৈরব গান।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হল গত
সন্ধ্যামেঘের তিমিররন্ধ্রে
দীপ্ত রবির মতো।

১৪ চৈত্র ১৩৩৮

জলপাত্র

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত,
জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে
কেন এলে
কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে।
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে
আসিতেছিলাম ধেয়ে আপনার ঘরে—
চাহিলে তৃষ্ণার বারি।
আমি হীন নারী
তোমারে করিব হেয়,
সে কি মোর শ্রেয়।
ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, 'অপরাধী করিয়ো না মোরে।'
শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে, 'হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা
সেইমতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণরাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।

যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি
· সেও কি অশুচি।
বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিসবৃষ্টিতে।'
জলভরা মেঘস্বরে এই কথা ব'লে
তুমি গেলে চলে।

তার পর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।
হে মহান, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ,
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা-পানে করুক বহন।

২৪ জুলাই ১৯৩২

আতঙ্ক

বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে
গোধূলিবেলায়
বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে
সাদাকালো দাগগুলো
দেখা দিত ভয়ংকর মূর্তি ধরে।
ওইখানে দৈত্যপুরী,
অদৃশ্য কুঠরি থেকে তার
মনে-মনে শোনা যেত হাঁউমাউখাঁউ।
লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ
খিলিখিলি হাসত ডাইনিবুড়ি।
কাশীরাম দাস
পয়ারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা
ইঁট-বের-করা সেই পাঁচালির 'পরে
ছিল তার প্রত্যক্ষ কাহিনী।
তারি সঙ্গে সেইখানে নাককাটা সূর্পণখা
কালো কালো দাগে
করেছিল কুটুম্বিতা।

সতেরো বৎসর পরে
গিয়েছি সে সাবেক বাড়িতে।
দাগ বেড়ে গেছে,
মুগ্ধ নতুনের তুলি পুরোনোকে দিয়েছে প্রশ্রয়।
ইঁটগুলো মাঝে-মাঝে খসে গিয়ে
পড়ে আছে রাশকরা।

গায়ে গায়ে লেগেছে অনন্তমূল,
কালমেঘ লতা,
বিছুটির ঝাড় ;
ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল ।
পুরোনো বটের পাশে
উঠেছে ভেরেণ্ডাগাছ মস্তবড়ো হয়ে ।
বাইরেতে সূর্পণখা-হিড়িম্বার চিহ্নগুলো আছে,
মনে তারা কোনোখানে নেই ।

স্টেশনে গেলেম ফিরে একবার খুব হেসে নিয়ে
জীবনের ভিত্তিটার গায়ে
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ,
মূঢ় অতীতের মসীলেখা ;
ভাঙা গাঁথুনিতে
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো ।
মাঝে-মাঝে
যেদিন বিকেলবেলা
বাদলের ছায়া নামে
সারি সারি তালগাছে
দিঘির পাড়িতে,
দূরের আকাশে
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
মেঘের গর্জন ওঠে গুরুগুরু,
ঝিঁঝি ডাকে বুনো খেজুরের ঝোপে,
তখন দেশের দিকে চেয়ে
বাঁকাচোরা আলোহীন পথে
ভেঙেপড়া দেউলের মূর্তি দেখি—
দীর্ণ ছাদে, তার জীর্ণ ভিতে
নামহীন অবসাদ,
অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,
নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যত,
দুর্বলের স্বরচিত শত্রুর চেহারা ।
ধিক্ রে ভাঙনলাগা মন,
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচড় কেটেছে ।
দুষ্টগ্রহ সেজে ভয়
কালোচিহ্নে মুখভঙ্গি করে ।
কাঁটা-আগাছার মতো
অমঙ্গল নাম নিয়ে
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে ।
চারি দিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে
ভেঙেপড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি
কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ ।

২৩ জুলাই ১৯৩২

আলেখ্য

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দা-প্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলেছিল নানা কলরবে
নানা ছন্দে লয়ে
সৃজনে প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল
চুপে চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।
ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্তির মর্মের মাঝে।
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
যদিও তাই-বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণত্রুটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

২৪ জুলাই ১৯৩২

সান্ত্বনা

সকালের আলো এই বাদলবাতাসে
মেঘে রুদ্ধ হয়ে আসে
ভাঙা কণ্ঠে কথার মতন।
মোর মন
এ অস্ফুট প্রভাতের মতো
কী কথা বলিতে চায়, থাকে বাক্যহত।
মানুষের জীবনের মজ্জায় মজ্জায়
যে দুঃখ নিহিত আছে অপমানে শঙ্কায় লজ্জায়,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজি তাই
নির্যাতন করে মোরে। আপনার দুর্গমের মাঝে
সান্ত্বনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে,
যে উৎসের গূঢ় ধারা বিশ্বচিত্ত-অন্তঃস্তরে
উন্মুক্ত পথের তরে
নিত্য ফিরে যুঝে
আমি তারে মরি খুঁজে।
আপন বাণীতে
কী পুণ্যে বা পারিব আনিতে
সেই সুগম্ভীর শান্তি, নৈরাশ্যের তীব্র বেদনারে
স্তব্ধ যা করিতে পারে।
হায় রে ব্যথিত,
নিখিল-আত্মার কেন্দ্রে বাজে অকথিত
আরোগ্যের মহামন্ত্র, যার গুণে
সৃজনের হোমের আগুনে
নিজেরে আহুতি দিয়া নিত্য সে নবীন হয়ে উঠে—
প্রাণেরে ভরিয়া তুলে নিত্যই মৃত্যুর করপুটে।
সেই মন্ত্র শান্ত মৌনতলে
শুনা যায় আত্মহারা তপস্যার বলে।
মাঝে-মাঝে পরম বৈরাগী
সে মন্ত্র চেয়েছে দিতে সর্বজন লাগি।
কে পারে তা করিতে বহন,
মুক্ত হয়ে কে পারে তা করিতে গ্রহণ।
গতিহীন আর্ত অক্ষমের তরে
কোন্ করুণার স্বর্গে মন মোর দয়া ভিক্ষা করে
ঊর্ধ্বে বাহু তুলি।
কে বন্ধু রয়েছ কোথা, দাও দাও খুলি
পাষাণকারার দ্বার—
যেথায় পুঞ্জিত হল নিষ্ঠুরের অত্যাচার,
বঞ্চনা লোভীর,
যেথায় গভীর

মর্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার।
আমিত্ববিমুগ্ধ মন যে দুর্বহ ভার
আপনার আসক্তিতে জমায়েছে আপনার 'পরে,
নির্মম বর্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।
আমার বাণীতে দাও সেই সুধা
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা।

হেনকালে সহসা আসিল কানে
কোন্ দূর তরুশাখে শ্রান্তিহীন গানে
অদৃশ্য কে পাখি
বার বার উঠিতেছে ডাকি।
কহিলাম তারে, 'ওগো, তোমার কণ্ঠেতে আছে আলো,
অবসাদ-আঁধার ঘুচালো।
তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোল্লাস
সহজেই পেতেছে প্রকাশ।
আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে,
যে আনন্দ অন্তিমে বিরাজে,
যে পরম আনন্দলহরী
যত দুঃখ যত সুখ নিয়েছে আপনা-মাঝে হরি,
আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
এই তব অকারণ গানে।'

২৭ জুলাই ১৯৩২

২

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী

তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পুবেন বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এ পার হতে মিলল তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইল কানে, বললে দশভুজা,
'অজানা ওই সিন্ধুতীরে নেব আমার পূজা।'
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পুব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, 'চলো, চলো।'
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে,
'আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে।'
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা—
বললে, 'আমি ওই পারেতে বাঁধব নূতন বাসা।'
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে,
'আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে।'

সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাসল আমার তরী—
শুভ্র পালে গর্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভরি।
তোমার ঘাটে লাগল এসে, জাগল সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।
প্রথম দেখা আবছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্তঋষির আশীর্বাদে ভরা।
প্রাতে মোদের মিলনপথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে পথ বেয়ে লাগল দোঁহার প্রাণের আনাগোনা।
দুইজনেতে বাঁধনু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বসনু সেথায় একটি আসন পেতে।

বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে,
কালের রথের ধুলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্তহাতে রিক্তমনে একা আপন তীরে।
বঙ্গসাগর বহুবরষ বলে নি মোর কানে
সে যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইল না সেই গান—
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান।

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে।

মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে,
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিল রাঁখিবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে,
সেই রাখি সে আজও দেখি তোমার দখিন হাতে।
এই যে পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা,
আজও সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
সেই সেদিনের প্রদীপ-জ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো—
নূতন-পাওয়া পুরানোকে আপন ব'লে জেনো।

[বাটাভিয়া] যবদ্বীপ
৪ ভাদ্র ১৩৩৪

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে ;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগযুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা ; সাধুকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

সে লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
সে লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।
অদূরে নদীর কিনারাতে
আলবাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।

কালের সে লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
প্রাণ যার দু'দিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন,
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি— 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা;
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে,
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে;
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া—
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র— 'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

বোরোবুদুর [যবদ্বীপ]
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিলে যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্‌বোধন—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগে তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে
স্বার্থধন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে—
সে মন্ত্র অমৃতবাণী হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থসমীরণে।

সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্রভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।
সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগ-যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ;
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির,

ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব—
ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

Phya Thai Palace Hotel
[Bangkok]
11 October 1927

সিয়াম

বিদয়াকালে

কোন্ সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম,
হে সিয়াম,
বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।
মুহূর্তে লয়েছি তাই চিনে।
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভরিয়াছি ক্ষণিকের পথিক-অঞ্জলি
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।

চিরন্তন আত্মীয়জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে—
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্বলিত ধূপে।

আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে—
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।

ইন্টর্‌ন্যাশনাল রেলোয়ে [সিয়াম]
৩০ আশ্বিন ১৩৩৪

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে, আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

পারস্যে জন্মদিনে

ইরান, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনালো তাহারে অভিনন্দনবাণী।
ইরান, তোমার বীর সন্তান,
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক—
ইরানের জয় হোক।

[তেহেরান]
২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

ধর্মমোহ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।—
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে—
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

রেলপথ
৩১ বৈশাখ ১৩৩৩

সংযোজন

প্রাচী

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগযুগব্যাপী অমারজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্ত্রে হল অবসান ;
কবে আলোকের শুভ্ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

সঁপিবে তোমারে নবীন বাণী কে।
নব প্রভাতের পরশমানিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে,
তারি লাগি বসি আছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

জরার জড়িমা-আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না ফুটে,
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

'খোলো খোলো দ্বার, ঘুচুক আঁধার',
নবযুগ আসি ডাকে বার বার—
দুঃখ-আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

ভৈরবরাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ,
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।

[শিলঙ
জ্যৈষ্ঠ ? ১৩৩০]

আশীর্বাদ

শ্রীমতী লীলা দেবী কল্যাণীয়াসু

বিশ্ব-পানে বাহির হবে
আপন কারা টুটি—
এই সাধনায় কুঁড়ি ওঠে
কুসুম হয়ে ফুটি ।
বীজ আপনার বাঁধন ছিঁড়ে
ফলেরে দেয় সাড়া ।
সূর্যতারা আঁধার চিরে
জ্যোতিরে দেয় ছাড়া ।
এই সাধনায় যোগযুক্ত
সাধু তাপসবর
মৃত্যু হতে করেন মুক্ত
অমৃতনির্ঝর ।
এই সাধনায় বিশ্বকবির
আনন্দবীন বাজে—
আপ্‌নারে দেয় উৎস্রাবিয়া
আপন সৃষ্টি-মাঝে ।
সেই ফল পাও প্রেমের যোগে
পুণ্য মিলনব্রতে ;
আপ্‌নারে দাও ছুটি তুমি
আপন বন্ধ হতে ।
আত্মভোলা দুইটি প্রাণে
মিলবে একাকার,
সেই মিলনে বিকাশ হবে
নূতন সংসার ।

১১ আষাঢ় ১৩৩০

আশীর্বাদ

শ্রীমতী কল্পনা দেবীর প্রতি

সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে
যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে,
হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল গন্ধ তার
দিয়েছে দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার ।

লহো আশীর্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপুরে
ছন্দের নন্দনবন সৃষ্টি করো সুধাস্নিগ্ধ সুরে—
বঙ্গের নন্দিনী তুমি, প্রিয়জনে করো আনন্দিত,
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত ।

শান্তিনিকেতন
২২ ভাদ্র ১৩৩০

লক্ষ্যশূন্য

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি,
'থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।' রথী কহে, 'ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।'
গৃহী কহে, 'নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।' রথী কহে, 'যেতে হবে আগে।'
'কোন্‌খানে' শুধাইল। রথী বলে, 'কোনোখানে নহে—
শুধু আগে।' 'কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে' গৃহী কহে।
'কোথাও না, শুধু আগে।' 'কোন্ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।'
'কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।'
ঘর্ঘরিত রথবেগে গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস ;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস
সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

ক্রাকোভিয়া জাহাজ
৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

প্রবাসী

পরবাসী চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শুভদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা-তরে
ফিরে এসো ঘরে।

আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
বন ভরা ফুলে ফুলে,
এসো এসো, লহো তুলে,
উঠে ডাক মর্মরে মর্মরে।

ফসলে ঢাকিয়া যায় মাটি,
তুমি কি লবে না তাহা কাটি।
ওই দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার,
সারিগান উঠিল অম্বরে।

কোথা যাবে সে কি জানা নেই।
যেথা আছ ঘর সেখানেই।

মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
পরবাসী বাহিরে অন্তরে ।

আঙিনায় আঁকা আলিপনা,
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না ।
মিলনঘরের বাতি
জ্বলে অনিমেষভাতি
সারারাতি জানালার 'পরে ।

বাঁশি পড়ে আছে তরুমূলে,
আজ তুমি আছ তারে ভুলে ।
কোনোখানে সুর নাই,
আপন ভুবনে তাই
কাছে থেকে আছ দূরান্তরে ।

এসো এসো মাটির উৎসবে
দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে ।
পাখির প্রভাতীগানে,
এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃতনির্ঝরে ।

ফিরে এসো তুমি উদাসীন,
ফিরে এসো তুমি দিশাহীন ।
প্রিয়েরে বরিতে হবে,
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে ।

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে,
বীর তুমি বক্ষে লহো তারে ।
পথের কণ্টক দলি
ক্ষতপদে এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে ।

বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে, তবে
ঘর তব আপনার হবে ।
তুফান তুলিবে কূলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে ।

[চৈত্র ১৩৩২]

বুদ্ধজন্মোৎসব

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার,
লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
করো ত্রাণ মহাপ্রাণ, আনো অমৃতবাণী,
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

এসো দানবীর, দাও
ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার
অহংকার ভিক্ষা।

লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন করো মোহ,
উজ্জ্বল করো জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন,
নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয়
তাপদহনদীপ্ত।
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ
খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আনো, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সংগীতরাগ,
তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।

১৩৩৩

প্রথম পাতায়

লিখতে যখন বল আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচবে আজও আমার হাতে।
সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্র মাসের কাশের হাসি,
সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
সেই কলমে শিশু দোয়েল
শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি,
পারুলদিদির বাসায় দোলে
কনকচাঁপার কচি কুঁড়ি।
খেলার পুতুল আজও আছে
সেই কলমের খেলাঘরে,
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথ-হারানো তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথপাতা
সেই কলমে আপনি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।

৮ বৈশাখ ১৩৩৪

নূতন

আমরা খেলা খেলেছিলেম,
আমরাও গান গেয়েছি;
আমরাও পাল মেলেছিলেম,
আমরা তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি,
বৈতরণী পারায় নি,
নবীন আঁখির চপল আলোয়
সে কাল ফিরে পেয়েছি।

দূর রজনীর স্বপন লাগে
আজ নূতনের হাসিতে।
দূর ফাগুনের বেদন জাগে
আজ ফাগুনের বাঁশিতে।

হায় রে সেকাল, হায় রে,
কখন্ চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায়
নতুন মায়ায় ভাসিতে।

যে মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরালো,
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরালো।
কইল শেষের কথা সে,
কাঁদিয়ে গেল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে
শূন্য আবার ভরালো।

আনলে ডেকে পথিক মোরে
তোমার প্রেমের আগুনে।
শুকনো ঝোরা দিল ভরে
এক পসলায় শাগুনে।
সন্ধ্যামেঘের কোনাতে
রক্তরাগের সোনাতে
শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে
ভাসিয়ে দিলে ভাগুনে।

শিলঙ
৩০ বৈশাখ ১৩৩৪

শুকসারী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্রপত্রিকার উত্তরে

শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য ;
সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য—
গিরির মাথায় থাকে।
শুক বলে, গিরিরাজের দৃঢ় অচল শিলা।
সারী বলে, মেঘমালার আদি-অন্তই লীলা—
বাঁধবে কে-বা তাকে।

শুক বলে, নদীর জলে গিরি ঢালেন প্রাণ।
সারী বলে, তার পিছনে মেঘমালার দান—
তাই-তো নদী আছে।
শুক বলে, গিরীশ থাকেন গিরিতে দিনরাত্র।
সারী বলে, অন্নপূর্ণা ভরেন ভিক্ষাপাত্র—
সে তো মেঘের কাছে।

শুক বলে, হিমাদ্রি যে ভারত করে ধন্য।
সারী বলে, মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য—
বাঁচে সকল জন।
শুক বলে, সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি,
সারী বলে, মেঘমালার নিত্যনূতন সৃষ্টি—
তাই সে চিরন্তন।

শিলঙ
৩১ বৈশাখ ১৩৩৪

সুসময়

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যা-সোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবি—
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন সঘন অবগুণ্ঠন টানে।

'খোলো খোলো মুখ' বনলক্ষ্মীরে ডাকে,
নিবিড় ধুলায় আপনি তাহারে ঢাকে।
'আলো দাও' হাঁকে, পায় না কাহারো সাড়া,
আঁধার বাড়ায়ে বেড়ায় লক্ষ্মীছাড়া—
পথ সে হারায় আপন ঘূর্ণিপাকে।

তার পরে যবে শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দকলির স্নিগ্ধশীতল কথা,
মৃদু উচ্ছ্বাস মর্মরে ঘাসে ঘাসে—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ খেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোকছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে—

হঠাৎ তখন সূর্যডোবার কালে
দীপ্তি লাগায় দিক্‌ললনার ভালে,
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার-কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
চরম খনের পরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

নূতন কাল

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,
'আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখ্খনো কি পার,
বারে বারেই হার।'
আমি বললেম, 'তাই বৈকি ! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হোক দেখি তো লড়াই।'
'আচ্ছা তবে দেখাই তোমায়' এই ব'লে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশাই তখ্খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত।

বারে বারে শুধায় আমায়, 'বলো তোমার হার হয়েছে না কি।'
আমি কইলেম, 'বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান—
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মান
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারি শেষ জিত।'

রুম্‌ফিউস জাহাজ
২৩ অগস্ট [১৯২৭]

পরিণয়মঙ্গল

হৈমন্তী দেবী ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিণয়-উপলক্ষে

উত্তরে দুয়াররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বপ্নমন্ত্রপাশ
কঠিনের মরুবক্ষে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,
হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেঁথেছে তাহারি শুভ্রমালা
নিভৃত গোপন চিত্তে ; সেই অর্ঘ্যে পূর্ণ করি ডালা
লাবণ্যনৈবেদ্যখানি দক্ষিণসমুদ্র-উপকূলে
এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
রবির সোহাগগর্ব বর্ণগন্ধমধুরসধারে
বৎসরের ঋতুপাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্ধান মুহূর্তে দুস্তর অন্তরাল—
দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে।

শান্তিনিকেতন
১ পৌষ ১৩৩৪

জীবনমরণ

জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
আজিকে আলো ছায়া করিছে কোলাকুলি,
আজিকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি
শুকানো পাতা আর মুকুলে।
আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে
জড়িত পাশাপাশি নূতনে পুরাতনে
চিকন শ্যামলের দুকূলে।

বিরহে টানে মিড় মিলন-বীণাতারে,
সুখের বুকে বাজে বেদনা।
কপোত-কাকলিতে করুণা সঞ্চারে,
কাননদেবী হল বিমনা।
আমারো প্রাণে বুঝি বহেছে ওই হাওয়া,
কিছু-বা কাছে আসা, কিছু-বা চলে যাওয়া,
কিছু-বা স্মরি কিছু পাসরি।
যে আছে যে-বা নাই আজিকে দোঁহে মিলি
আমার ভাবনাতে ভ্রমিছে নিরিবিলি
বাজায়ে ফাগুনের বাঁশরি।

[ফাল্গুন ১৩৩৪]

গৃহলক্ষ্মী

নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে কল্যাণশঙ্খ—
এসো তুমি উষা ওগো অকলুষা, আনো দিন নিঃশঙ্ক।
দ্যুলোকভাসানো আলোকসুধায়
অভিষেক তুমি করো বসুধায়,
নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক।

সম্মুখ-পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।
অমৃতলোকের দ্বার খুলে দিন চিরজীবনের মিত্র।
বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক,
যাত্রীরা সবে যাক ধেয়ে যাক,
দেহমন হতে হোক অপগত অবসাদ অপবিত্র।

মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজুক বীণার তন্ত্র।
নব বিশ্বাসে আশ্বাসহীন শুনুক বিজয়মন্ত্র।
এসো আনন্দ, দুঃখহরণ,
দুঃখের দাও করিতে বরণ,
মরণতোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পন্থ।

কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গলকর্ম,
শুভসংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ম।
বলো সবে ডাকি 'ছাড়ো সংশয়',
বলো যাত্রীরে 'হয়েছে সময়',
বলো 'নাহি ভয়', বলো 'জয় জয়, জয়ী যেন হয় ধর্ম'।

পশ্চাৎ-পানে ফিরায়ে ডেকো না, মনে জাগায়ো না দ্বন্দ্ব,
দুর্বল শোকে অশ্রুসলিলে নয়ন কোরো না অন্ধ।
সংকট-মাঝে ছুটিবার কালে
বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে,
যে চরণ বাধা লঙ্ঘিবে তাহে জড়ায়ো না মোহবন্ধ।

[বৈশাখ ১৩৩৪]

রঙিন

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে
কেউ-বা জলে কেউ-বা তারা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে।

কোন্ মহারাজ রথের 'পরে একা,
ভালো করে যায় না তাঁরে দেখা।
সূর্যতারা অন্ধকারে
ডাইনে বাঁয়ে উঁকি মারে,
আপন আলোয় দৃষ্টি তাদের ঠেকা।

আমার মশাল সামনে ধরি না যে,
তাই তো আলো চক্ষে নাহি বাজে।
অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টিকা,
রঙিনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

পাখিরা রঙ ওড়ায় আকাশতলে,
মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে।

রঙ জেগেছে বনসভায়
গোলাপ চাঁপা রঙন জবায়,
মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে।

নীরব ডাকে রঙমহালের রাজা
হুকুম করেন, 'রঙের আসর সাজা।'—
অমনি ফাগুন কোথা হতে
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে,
পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা।

তাদের আসর বাহির-ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৫

আশীর্বাদী

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংবর্ধনা উপলক্ষে

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
নবীন বটে ছিলেম কোনো কালে।
বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়
ধরল কুঁড়ি বাণীবনের ডালে।
কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
একবেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে,
মধুর পালা রেণুকণার মুখে
ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।

ফাগুনফুলে ভরেছিলে সাজি,
শ্রাবণমাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন উঠে বাজি
সুরবাহারে দিক কানাড়ার মিড়।

২ ভাদ্র ১৩৩৮

বসন্ত-উৎসব

এ-বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছল। আমের মুকুল নিঃশেষিত আমবাগানে মৌমাছির ভিড় নেই, পলাশ-ফোটার পালা ফুরল, গাছের তলায় শুকনে শিমুল তার শেষমধু পিঁপড়েদের বিলিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। কাঞ্চনশাখা প্রায় দেউলে, ঐশ্বর্যের অল্প কিছু বাকি। কেবল শালের বীথিকা ভরে উঠেছে মঞ্জরিতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পুষ্পিত শালের বনে, তার বল্কলে আবির মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দশীর চাঁদ যখন অস্তদিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আবিরের তিলকরেখা ফুটে উঠল, তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত-উৎসবের বেদির জন্য রচনা করেছি।

আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি,
লহো আমাদের নতি।
তুমি এসেছিলে মোদের সবার আগে
প্রাণের পতাকা রাঙায়ে হরিৎরাগে,
সংগ্রাম তব কত ঝঞ্ঝার সাথে,
কত দুর্দিনে কত দুর্যোগরাতে
জয়গৌরবে ঊর্ধ্বে তুলিলে শির
হে বীর, হে গম্ভীর।

তোমার প্রথম অতিথি বনের পাখি,
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি,
স্নিগ্ধ আদরে গানেরে দিয়েছ বাসা,
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা,
সুরে কিশলয়ে মিলন ঘটালে তুমি—
মুখরিত হল তোমার জন্মভূমি।

আমরা যেদিন আসন নিলেম আসি
কহিল স্বাগত তব পল্লবরাশি,
তার পর হতে পরিচয় নব নব
দিবসরাত্রি ছায়াবীথিতলে তব
মিলিল আসিয়া নানা দিগ্‌দেশ হতে
তরুণ জীবনস্রোতে।

বৈশাখতাপ শান্ত শীতল করো,
নববর্ষারে করি দাও ঘনতর,
শুভ্র শরতে জ্যোৎস্নার রেখাগুলি
ছায়ায় মিলায়ে সাজাও বনের ধূলি,
মধুলক্ষ্মীরে আনিয়াছে আহ্বানি
মঞ্জরিভরা সুন্দর তব বাণী।

নীরব বন্ধু, লহো আমাদের প্রীতি,
আজি বসন্তে লহো এ কবির গীতি,

কোকিলকাকলি শিশুদের কলরবে
মিলেছে আজি এ তব জয়-উৎসবে,
তোমার গন্ধে মোর আনন্দে আজি
এ পুণ্যদিনে অর্ঘ্য উঠিল সাজি ।
গম্ভীর তুমি, সুন্দর তুমি, উদার তোমার দান,
লহো আমাদের গান ।

শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮

আশীর্বাদ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তারি পুঞ্জিত হল জীবনের ভাঙা আশা ।
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধুলা ।
দূষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু,
শোষণ করিছে আয়ু ।
যেখানে-সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া,
দীপ নিভে যায়, তীব্রগন্ধ ধোঁওয়া
রোধ করে নিশ্বাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ ।

ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্, তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে ।
সেথা নাই বন্ধন,
প্রভাত-আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন ।
সন্ধ্যার তারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে ।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথায় লুকাও লাজে ।
যেখানে ক্ষুদ্র সেখানে পীড়িত তুমি,
কর্কশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের মরুভূমি
তাহার বাহিরে তোমার উদার স্থান—
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান ।

১৮ আশ্বিন
শুক্র পঞ্চমী ১৩৩৯

আশীর্বাদ

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে

প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান,
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।

২ পৌষ
১৩৩৯

তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি
আপনার দিগ্‌দিগন্তে রবির সংগীতরশ্মিগুলি
প্রহর করিয়া পূর্ণ। মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে
উদার তোমার দান। রবিকর করি মর্মগত
বনস্পতি আপনার পত্রপুষ্পে করে পরিণত,
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব-সমারোহে। সেইমতো তোমার সাধনা।
রবির সম্পদ হত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-'পরে স্নেহ সুগভীর,
রবির সংগীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির।

২ পৌষ
১৩৩৯

উত্তিষ্ঠত নিবোধত

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ—
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কালস্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর—
দুঃখেরে স্বীকার করি ; অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্মে তব— উত্তিষ্ঠত নিবোধত।

গ্লেন্ ইডেন। দার্জিলিঙ
১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

প্রার্থনা

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে ; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
নিঃসহায় দুর্ভাগার সকরুণ সকল প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল ; দুঃখীর আশ্রয়বাসা
নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশাহোমানলে
আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে ; নিঃসংকোচ গর্বে বলে,
আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো ; দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায় ; সিদ্ধির স্পর্ধার তরে
দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-'পরে
জয়যাত্রাপথে ; দেখি ধিক্কারে ভরিয়া উঠে মন,
আত্মজাতি-মাংসলুব্ধ মানুষের প্রাণনিকেতন
উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা ; চিত্ত মম
নিষ্কৃতিসন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,
মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে শৃঙ্খলবন্ধন-অপমান
সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা-বন্দীশালা হতে। ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি। আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি, বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি ; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি ; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।

২৯ জুলাই ১৯৩৩

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত কর নি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।

মৈত্রী তব সমুজ্জ্বল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধাঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলালো,
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো।

দিন পরে গেছে দিন, মাস পরে মাস,
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
'হবে হবে, দেখা হবে'—
এ কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে।

আমারো যাবার কাল এল শেষে আজি,
'হবে হবে, দেখা হবে' মনে ওঠে বাজি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নবজ্যোতিদীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে-মনে জাগে।

এখানে গোপন চোর ধরার ধুলায়
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি,
সব চেয়ে সে ক্ষতিরে ডরি।

তাই বলি, দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়,
তারেও করি নে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশি যেন নাহি থাকি।

শান্তিনিকেতন
১৯ ভাদ্র ১৩৪১

পুনশ্চ

উৎসর্গ

নীতু

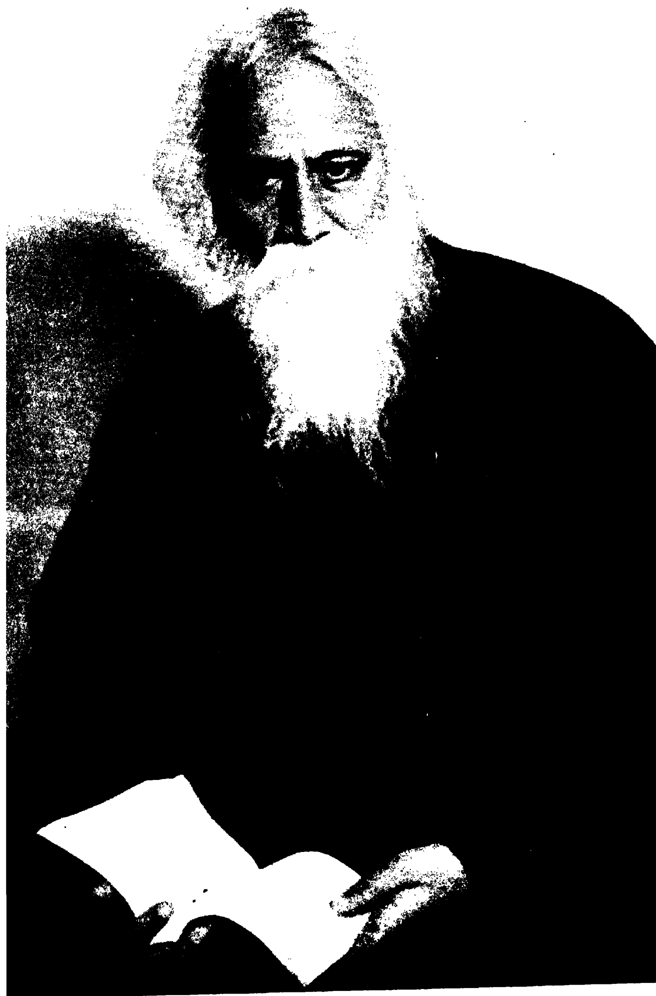
ভূমিকা

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি। আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।

২ আশ্বিন ১৩৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০

পুনশ্চ

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে ।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বটু, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে সর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি ।
ওইখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের-ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত ।
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে ।
ও স্বতন্ত্র । লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না ।
বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান ।
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে ।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর ।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে ।

তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কত কালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।
শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।
রাস্তা যেখানে থেমেছে তীরে এসে
সেখানে ও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে
কলকল স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়ে।
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকীর ঘেঁষাঘেঁষি।
ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।
ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাত্‌লামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।
শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।
তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন ;
এ দুইয়েই তার শোভা—
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,

চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

নাটক

নাটক লিখেছি একটি।
বিষয়টা কী বলি।

অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন ব'লে।
অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী,
অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরী,
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।
উর্বশী বললেন, কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর!
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে!
আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়।
মর্তকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্তের।

তাই এসেছি তোমার কাছে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ,
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্তের সেই অমৃত-অশ্রুর ধারা।

ভালো হয়েছে আমার লেখা।
'ভালো হয়েছে' কথাটা কেটে দেব কি চিঠি থেকে ?
কেন, দোষ হয়েছে কী ?
সত্য কথাই বেরিয়েছে কলমের মুখে।
আশ্চর্য হয়েছ আমার অবিনয়ে—
বলছ, ভালো যে হয়েইছে জানলে কী করে ?
আমার উত্তর এই, নিশ্চিত নাই বা জানলেম।
এক কালের ভালোটা
হয়তো হবে না অন্য কালের ভালো।
তাই তো এক নিশ্বাসে বলতে পারি
'ভালো হয়েছে'।
চিরকালের সত্য নিয়ে কথা হত যদি
চুপ করে থাকতেম ভয়ে।
কত লিখেছি কতদিন,
মনে মনে বলেছি 'খুব ভালো'।
আজ পরম শত্রুর নামে
পারতেম যদি সেগুলো চালাতে
খুশি হতেম তবে।
এ লেখারও একদিন হয়তো হবে সেই দশা—
সেইজন্যেই, দোহাই তোমার,
অসংকোচে বলতে দাও আজকের মতো
'এ লেখা হয়েছে ভালো'।
এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।
তবু ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না।

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফর্মাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।

তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে !

গদ্য এল অনেক পরে ।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর ।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে ।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল ।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত ।
কোথাও তার সমতল, কোথা অসমতল ;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি ।
একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি ।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে ।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য ।

৯ ভাদ্র ১৩৩৯

নূতন কাল

আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল
সকালবেলার প্রথম দোহন,
ভোরবেলাকার ব্যাপারীরা
চুকিয়ে দিয়ে গেল প্রথম কেনাবেচা,
তখন কাঁচা রৌদ্রে বেরিয়েছি রাস্তায়,
ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে—
তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরে নি ।
তার পর প্রহরে প্রহরে ফিরেছি পথে পথে ;
কত লোক কত বললে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না সেও কত লোক—
সে কালের দিন হল সারা ।

কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
এক দিনের দায় টানি কেন আর-এক দিনের 'পরে,
দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই-না কেন সামনের দিকে চেয়ে।
সেদিনকার উদ্‌বৃত্ত নিয়ে নূতন কারবার জমবে না
তা নিলেম মেনে।
তাতে কী বা আসে যায়।
দিনের পর দিন পৃথিবীর বাসাভাড়া
দিতে হয় নগদ মিটিয়ে।
তার পর শেষ দিনে দখলের জোর জানিয়ে
তালা বন্ধ করবার ব্যর্থ প্রয়াস,
কেন সেই মূঢ়তা।

তাই প্রথম ঘণ্টা বাজল যেই
বেরিয়েছিলেম হিসেব চুকিয়ে দিয়ে।
দরজার কাছ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই,
তখন দেখি তুমি যে আছ
এ কালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।
তোমার সঙ্গীরা একদিন যখন হেঁকে বলবে
আর আমাকে নেই প্রয়োজন,
তখন ব্যথা লাগবে তোমারই মনে
এই আমার ছিল ভয়—
এই আমার ছিল আশা।
যাচাই করতে আস নি তুমি—
তুমি দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমার কালে আমার কালে হৃদয় দিয়ে।
দেখলেম ওই বড়ো বড়ো চোখের দিকে তাকিয়ে,
করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে।

তাই ফিরে আসতে হল আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে—
তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে ক'রে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পার
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে।
দশ জনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।

কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে—
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব এই ইচ্ছা।

যেন গর্ব করে বলতে পার
আমি তোমাদেরও বটে,
এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেছি এই কালে—
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতালপাড়া;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ,
দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা।
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
তারি এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
মাটি গেছে ক্ষ'য়ে,
দেখা দিয়েছে
উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়—
মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে বানিয়েছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী।

শরৎকালে পশ্চিম-আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—

তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মতো—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল-সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায়-হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।
ক্রন্দিত আকাশের নীচে ওই ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

এসেছিলেম বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝির্ ঝির্ ঝর্নার ধারায়
রচনা করেছি মন-গড়া রহস্যকথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুর বেলায় আপন-মনে একলা।

তার পরে অনেক দিন হল,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ওই আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ!
এই শালবন, এই একলা-মেজাজের তালগাছ,
ওই সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি,
এর পানে অনেক দিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-গানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশেরও পার থেকে—
তার পরে ?
তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ওই বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,
পুব দিকের মাঠে চরবে গোরু।
রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা।

৩০ শ্রাবণ ১৩৩৯

পত্র

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা
এক-বই-ভরা কবিতা
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে,
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে।
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামল এসে কবিতা
সেইটেই পড়ে রইল পিছনে।
নিশীথ রাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,
বিশ্ব-বেনের দোকানে
হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে ;
তবু রসিকেরা বুঝতে পারে, যেন কমতি হল কিসের।
যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ,
তৌল করা যায় না তাকে,
কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।
মনে করো একটি গান উঠল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটি মাত্র নীলকান্তমণি—
তাকে কি দেখতে হবে
গয়নার বাক্সের মধ্যে।
বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।

ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয় নি লেপে কালি মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায় পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে।

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে;
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্‌লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটলডাঙার অম্‌নিবাসে চড়ে।

মন বলছে নিশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য
আর আমি যদি হতেম— কী হবে ব'লে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা
কিনে পড় কবিতা
আরাম-কেদারায় ব'সে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ সিকে দিয়েই খালাস।

১০ ভাদ্র ১৩৩৯

পুকুর-ধারে

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টল্‌টল্‌ করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি ;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো ।
বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ও পারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান ;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে ।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঁঠাতে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে ।

বেলা পড়ে এল ।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা ।
ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,
টলমল করছে পুকুরের জল,
ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাবি লেবুর পাতা ।

চেয়ে দেখি আর মনে হয়
এ যেন আর-কোনো-একটা দিনের আবছায়া ;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে ।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি ।
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে ;
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে ;
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে ।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না ;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

অপরাধী

তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে—
তাই রাগ কর তুমি ।
ওকে ভালোবাসি,
তাই ওকে দুষ্টু ব'লে দেখি,
দোষী ব'লে দেখি নে—
রাগও করি ওর 'পরে
ভালোও লাগে ওকে
এ কথাটা মিছে নয় হয়তো ।

এক-একজন মানুষ অমন থাকে
সে লোক নেহাত মন্দ নয়,
সেইজন্যেই সহজে তার মন্দটাই পড়ে ধরা ।
সে হতভাগা রঙে মন্দ, কিন্তু মন্দ নয় রসে ;
তার দোষ স্তূপে বেশি,
ভারে বেশি নয়—
তাই দেখতে যতটা লাগে
গায়ে লাগে না তত ।
মনটা ওর হালকা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হুহু করে চলে যায় ভেসে ;
ভালোই বল আর মন্দই বল
জমতে দেয় না বেশিক্ষণ—
এ পারের বোঝা ও পারে চালান করে দেয়
দেখতে দেখতে ;
ওকে কিছুই চাপ দেয় না,
তেমনি ও দেয় না চাপ ।

স্বভাব ওর আসর-জমানো,
কথা কয় বিস্তর,
তাই বিস্তর মিছে বলতে হয়—
নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস-বুনোনিতে ।
মিছেটা নয় ওর মনে,
সে ওর ভাষায় ।
ওর ব্যাকরণটা যার জানা
তার বুঝতে হয় না দেরি ।
ওকে তুমি বল নিন্দুক— তা সত্য ।
সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়—
যার নিন্দে করে তার মন্দ হবে ব'লে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে ব'লে ।
তারা আছে সমস্ত সংসার জুড়ে ।

তারা নিন্দের নীহারিকা,
ও হল নিন্দের তারা,
ওর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।
আসল কথা ওর বুদ্ধি আছে, নেই বিবেচনা।
তাই ওর অপরাধ নিয়ে হাসি চলে।
যারা ভালোমন্দ বিবেচনা করে সূক্ষ্ম তৌলের মাপে
তাদের দেখে হাসি যায় বন্ধ হয়ে ;
তাদের সঙ্গটা ওজনে হয় ভারী,
সয় না বেশিক্ষণ ;
দৈবে তাদের ত্রুটি যদি হয় অসাবধানে
হাঁপ ছেড়ে বাঁচে লোকে।

বুঝিয়ে বলি কাকে বলে অবিবেচনা—
মাখন লক্ষ্মীছাড়াটা সংস্কৃতর ক্লাসে
চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো ;
ছাপ লেগেছিল পণ্ডিতমশায়ের জামার পিঠে ;
সে হেসেছিল, সবাই হেসেছিল
পণ্ডিতমশায় ছাড়া।
হেডমাস্টার দিলেন ছেলেটাকে একেবারে তাড়িয়ে ;
তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি অত্যন্ত বিবেচক।
তাঁর ভাব-গতিক দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যায়।

তিনু অপকার করে কিছু না ভেবে,
উপকার করে অনায়াসে,
কোনোটাই মনে রাখে না।
ও ধার নেয়, খেয়াল নেই শোধ করবার ;
যারা ধার নেয় ওর কাছে
পাওনার তলব নেই তাদের দরজায়।
মোটের উপর ওরই লোকসান হয় বেশি।

তোমাকে আমি বলি, ওকে গাল দিয়ো যা খুশি,
আবার হেসো মনে মনে—
নইলে ভুল হবে।
আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ ব'লে,
ভালো মন্দ পেরিয়ে।
তুমি দেখ দূরে ব'সে, বিশেষণের কাঠগড়ায় ওকে খাড়া রেখে।
আমি ওকে লাঞ্ছনা দিই তোমার চেয়ে বেশি—
ক্ষমা করি তোমার চেয়ে বড়ো ক'রে।
সাজা দিই, নির্বাসন দিই নে।
ও আমার কাছেই রয়ে গেল,
রাগ কোরো না তাই নিয়ে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ফাঁক

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এল—
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো শুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে ।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে ।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা ।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে ।

আজ আমার মন ফিরেছে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে ।
কী কী আছে দিনের দাবি
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ রেখে যায় টেবিলে ।
ফর্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসেও বসা হয় না—
এম্‌নিতরো ঢিলে অবস্থা ।
গরম পড়েছে ফর্দে এটা না ধরলেও
মনে আনতে বাধে না ।
পাখা কোথায়
কোথায় দার্জিলিঙের টাইম-টেবিলটা
—এমনতরো হাঁপিয়ে ওঠবার ইশারা ছিল
থার্মোমিটারে ।
তবু ছিলেম স্থির হয়ে ।

বেলা দুপুর,
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে,
ধূ ধূ করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হূহূ করে—
খেয়াল হয় না ।
বনমালী ভাবে দরজা বন্ধ করাটা
ভদ্রঘরের কায়দা—
দিই তাকে এক ধমক ।
পশ্চিমের সার্শির ভিতর দিয়ে
রোদ ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে ।
বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়, চিঠি ?

হাত উলটিয়ে বলি, নাঃ ।
ক্ষণকালের জন্য খটকা লাগে
চিঠি লেখা উচিত ছিল—
ক্ষণকালটা যায় পেরিয়ে,
ডাকের সময় যায় তার পিছন পিছন ।
এ দিকে বাগানে পথের ধারে
টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার ।
কোকিল ডেকে ডেকে সারা—
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি,
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে ।
মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে ;
মনে রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ ক'রে ।
মনে আনবার অনেক দিন ক্ষণ আমারো আছে,
অনেক কথা, অনেক দুঃখ ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে ;
তারি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে
কাঁঠালতলার ঘন ছায়া
তপ্ত মাঠের ধারে
দূরের বাঁশি বাজায়
অশ্রুত মূলতানে ।
তারি ফাঁকে ফাঁকে দেখি—
ছেলেটা ইস্কুল পালিয়ে খেলা করছে
হাঁসের বাচ্ছা বুকে চেপে ধ'রে
পুকুরের ধারে
ঘাটের উপর একলা ব'সে
সমস্ত বিকেল বেলাটা ।
তারি ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখছে চিঠি নূতন বধূ,
ফেলছে ছিঁড়ে, লিখছে আবার ।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে,
আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে ।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায় ।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে ।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পুবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারি চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে ।
নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় ;
বাতাবি-লেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে ;
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেষারেষি ;
শজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায় ;
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে ।

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথর বাঁধানো ।
তারি এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি ।
নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী ।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি ।
সেইখানে ভাসে রাজহংস
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে ।

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
খয়েরিরঙের-ফুল-কাটা ।
দেয়াল বসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড় ।
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই ।

একটি মানুষ পেয়েছি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটিরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুম্‌কোলতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনি পাই শুনতে—
গাইতে বলি নে তাকে।
স্বামীটি তার লোক ভালো—
আমার লেখা ভালোবাসে, ঠাট্টা করলে
যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে,
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে,
আবার হঠাৎ কোনো-একদিন আলাপ করে
—লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব—
রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাক-সবজির খেত।
বিঘে-দুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আম-কাঁঠালের বাগিচা
আস্‌শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুন্ গুন্ গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে খেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে।
নদীর ও পারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন—
সে দিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

এই পর্যন্ত।
এ বাসা আমার হয় নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—
মনে হয় যেন ঘননীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।

আর মনে হয়
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব-কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

৩ ভাদ্র ১৩৩৯

দেখা

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে।
বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুন গাছে
মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চমকে উঠল বনের ছায়া।
শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে-পালায়।
রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে।

বিকেলে হঠাৎ এল গুরু গুরু ধ্বনি,
কার যেন সংকেত।
এক মুহূর্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হু হু করে ছুটে আসে
তাদের কোণ ছেড়ে।
বাঁধের জল হয়ে গেল কালো,
বটের তলায় নামল থম্‌থমে অন্ধকার।
দূর বনের পাতায় পাতায়
বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।
দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে
সমস্ত আকাশ,
মাঠ ভেসে যায় জলে।
বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে
ছেলেমানুষের মতো;
ধৈর্য থাকে না তালের পাতায়, বাঁশের ডালে।

একটু পরেই পালা হল শেষ—
আকাশ নিকিয়ে গেল কে।
কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি—
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।

৪ ভাদ্র ১৩৩৯

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্‌দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপেগাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝল্‌মলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।

জানি নে কেন মনে হয়
এই দিন দূর কালের আর-কোনো একটা দিনের মতো।
এরকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা ব'লে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।
প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা—
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

তেমনি এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌরসারঙের আলাপ—
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে ।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ দান

ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ ।
শুকনো ধুলো, একটি ঘাস উঠতে পায় না ।
এক ধারে আছে কাঞ্চন গাছ,
আপন রঙের মিল পায় না সে কোথাও ।
দেখে মনে পড়ে আমাদের কালো রিট্রিভার কুকুরটা,
সে বাঁধা থাকে কোঠাবাড়ির বারান্দায় ।
দূরে রান্নাঘরের চার ধারে উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে
ঘুরে বেড়ায় দিশি কুকুরগুলো ।
ঝগড়া করে, মার খায়, আর্তনাদ করে,
তবু আছে সুখে নিজেদের স্বভাবে ।
আমাদের টেডি থেকে থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে চঞ্চল হয়ে,
সমস্ত গা তার কাঁপতে থাকে,
ব্যগ্র চোখে চেয়ে দেখে দক্ষিণের দিকে,
ছুটে যেতে চায় ওদের মাঝখানে—
ঘেউ ঘেউ ডাকতে থাকে ব্যর্থ আগ্রহে ।

তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়,
মানুষের-পায়ে-দলা গরিব ধুলোর 'পরে ।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা ।

সেবার বসন্ত এল ।
কে জানবে হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে ।
অদূরে শালবন আকাশে মাথা তুলে
মঞ্জরী-ভরা সংকেত জানালে
দক্ষিণসাগরতীরের নবীন আগন্তুককে ।

সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে
কোন্ চরম দিনের অদৃশ্য দূত দিল ওর দ্বারে নাড়া,
কানে কানে গেল খবর দিয়ে—
একদিন নামে শেষ আলো,
নেচে যায় কচি পাতার শেষ ছেলেখেলার আসরে।

দেরি করলে না।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠল ভারে ভারে
ফিকে-বেগ্নি ফুলে।
পাতা গেল না দেখা—
যতই ঝরে ততই ফোটে
হাতে রাখল না কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় ক'রে।
তার পরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।

৫ ভাদ্র ১৩৩৯

কোমলগান্ধার

নাম রেখেছি কোমলগান্ধার,
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলত হেসে 'মানে কী'।
মানে কিছুই যায় না বোঝা সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে কর্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক রকম আছে—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনাশোনা।
পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে
কেমন একটি সুর দিয়েছে চার দিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো—
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।

চলায় বলায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমলগান্ধার—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।

১৩ ভাদ্র ১৩৩৯

বিচ্ছেদ

আজ এই বাদলার দিন,
এ মেঘদূতের দিন নয়।
এ দিন অচলতায় বাঁধা।
মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।
সময়ে যেন স্রোত নেই,
চার দিকে অবারিত আকাশ,
অচঞ্চল অবসর।

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেছে,
মা গো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
মেঘদূতে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভাগ পড়ল না তার 'পরে—
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরনায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে,
মুখরিত বনহিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।

যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে ।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে ।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হল শেষ ।

সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা ।
অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায় ।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;
নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা— সেই তো একান্ত বিরহী ।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে ।

ভুল বলা হল বুঝি ।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে ।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে ।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে ।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

স্মৃতি

পশ্চিমে শহর ।
তারি দূর কিনারায় নির্জনে
দিনের তাপ আগলে আছে একটা অনাদৃত বাড়ি,
চারি দিকে চাল পড়েছে ঝুঁকে ।
ঘরগুলোর মধ্যে চিরকালের ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে,
আর চিরবন্দী পুরাতনের একটা গন্ধ ।
মেঝের উপর হলদে জাজিম,
ধারে ধারে ছাপ-দেওয়া বন্দুক-ধারী বাঘ-মারা শিকারীর মূর্তি ।
উত্তর দিকে সিসুগাছের তলা দিয়ে
চলেছে সাদা মাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো
খররৌদ্রের গায়ে হালকা উড়নির মতো ।

সামনের চরে গম অড়র ফুটি তরমুজের খেত,
দূরে ঝক্‌মক্ করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণ-টানা নৌকো
কালির আঁচড়ে আঁকা ছবি যেন।
বারান্দায় রুপোর-কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে,
গির্‌ধারী দারোয়ান অনেক ক্ষণ ধরে তার পাশে বসে আছে
জানি না কিসের ওজরে।
বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা,
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী,
তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ,
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার খেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

অপরাহ্ণে শহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়,
তাপে কৃশ পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ তার মুখ,
মৃদুস্বরে পড়িয়ে যায় বিদেশী কবির কবিতা।
নীল রঙের জীর্ণ চিকের ছায়া -মিশানো অস্পষ্ট আলোয়
ভিজে খস্‌খসের গন্ধের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা।
আমার প্রথমযৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভাষা,
প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়
বিলিতে মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে
নানা বর্ণের ভিড়ে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক—
পরের ঘরে মানুষ।
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি—
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে—
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ।

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র—
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড় ।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল,
বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে ।
বেলা দুপুর ।
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে—
তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে ।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা ?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে ।
ছেলেটার খেয়াল গেল ওইখানে ডুব দিতে—
ওই সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো ।
'কী আছে দেখিই-না' সব তাতে এই তোর লোভ ।
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে, খাবি খেয়ে, তলিয়ে গেল কোথায় ।
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে—
তখন সে নিঃসাড় ।
তার পরে অনেক দিন ধরে মনে পড়েছে
চোখে কী করে সর্ষেফুল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচি বেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে ।

ভারি মজা,
কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা ।
সাথিকে লোভ দেখিয়ে বলে,
'একবার দেখ্-না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে ।'
ভারি ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে ।
সাথি রাজি হয় না ;
ও রেগে বলে, 'ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকার ।'

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো ।
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি ।
বাড়ির লোকে বলে, 'লজ্জা করে না বাঁদর ?'
কেন লজ্জা ।
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দ'লে—
লজ্জা করে না ?

একদিন পাকড়াশিদের মেজো ছেলে একটা কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বললে, 'দেখ্-না ভিতর বাগে ।'
দেখল, নানা রঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে ।
বললে, 'দে-না ভাই, আমাকে ।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা ক'রে—
আর দেব আমের কষির বাঁশি ।'

দিল না ওকে ।
কাজেই চুরি করে আনতে হল ।
ওর লোভ নেই—
ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে ।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বললে,
'চুরি করলি কেন ।'
লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে,
'ও কেন দিল না ।'
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের ।

ভয় নেই ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে ।
কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ ক'রে,
বাগানে আছে খোঁটা পোঁতার এক গর্ত,

তার মধ্যে সেটা পোষে—
পোকামাকড় দেয় খেতে ।

গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি—
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে ।
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালি ।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে—
ভাবলে, 'দেখিই-না কী করে মাস্টারমশায় ।'
ডেক্‌সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা ।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও ।
অন্ন জুটত না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া—
সেই অপকর্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া ।
আর, সেইসঙ্গেই কোন্ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তাদের শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে ।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা ।
একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল ।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনোদিন জল বেরোয় নি যে ছেলের চোখে
দু দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,
মুখে অন্নজল রুচল না,
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করমচা—
চুরি করতে উৎসাহ হল না ।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগ্নে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি ।
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি ।

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে 'দূর দূর' করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানী ।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত ।
ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ওইরকম চ্যাপ্টা ।

ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্য এই গয়লানী মাসির 'পরে ।
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে ।
'দেখি-না কী হয়' তারই বিবিধ-রকম পরীক্ষা ।
তার উপদ্রবে গয়লানীর স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে ।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ওই ছেলেটারই ।

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ ক'রে গেল,
'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি ।
পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে ।
এতবড়ো বাঁদর ।'
আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না ।
কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি ।'

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

সহযাত্রী

সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে—
এ মানুষটি তার চেয়েও বেশি, এ অদ্ভুত ।
খাপছাড়া টাক সামনের মাথায়,
ফুরফুরে চুল কোথাও সাদা কোথাও কালো ।
ছোটো ছোটো দুই চোখে নেই রোঁওয়া,
ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি ।
যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার ।
কপালটা মস্ত—
তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল, দক্ষিণ দিগন্তে নেই ভুরু ।
দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখে
অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা ।

কোথায় অলক্ষ্যে পড়ে আছে আল্‌পিন টেবিলের কোণে,
তুলে নিয়ে সে বিঁধিয়ে রাখে জামায়—
তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসে জাহাজের মেয়েরা ;
পার্সেল-বাঁধা টুকরো ফিতেটা সংগ্রহ করে মেঝের থেকে,
গুটিয়ে গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি ;
ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখে টেবিলে ।
আহারে অত্যন্ত সাবধান—
পকেটে থাকে হজমি গুঁড়ো,
খেতে বসেই সেটা খায় জলে মিশিয়ে,
খাওয়ার শেষে খায় হজমি বড়ি ।

স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে—
যা বলে মনে হয় বোকার মতো ।
ওর সঙ্গে যখন কেউ পলিটিক্‌স্‌ বলে
বুঝিয়ে বলে অনেক ক'রে—
ও থাকে চুপচাপ, কিছু বুঝল কি না বোঝা যায় না ।

চলেছি একসঙ্গে সাত দিন এক জাহাজে ।
অকারণে সকলে বিরক্ত ওর 'পরে,
ওকে ব্যঙ্গ করে আঁকে ছবি,
হাসে তাই নিয়ে পরস্পর ।
ওর নামে অত্যুক্তি বেড়ে চলেছে কেবলই,
ওকে দিনে দিনে মুখে মুখে রচনা করে তুলছে সবাই ।
বিবিধ রচনায় ফাঁক থাকে,
থাকে কোথাও কোথাও অস্ফুটতা ।
এরা ভরিয়ে তোলে এদের রচনা দৈনিক রাবিশ দিয়ে,
খাঁটি সত্যের মতো চেহারা হয়,
নিজেরা বিশ্বাস করে ।
সবাই ঠিক করে রেখেছে ও দালাল,
কেউ বা বলে রবারের কুঠির মেজো ম্যানেজার ;
বাজি রাখা চলছে আন্দাজ নিয়ে ।

সবাই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে,
সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাকতেই ।
চুরোট খাওয়ার ঘরে জুয়ো খেলে যাত্রীরা,
ও তাদের এড়িয়ে চলে যায়,
তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে—
বলে কৃপণ, বলে ছোটোলোক ।

ও মেশে চাটগাঁয়ের খালাসিদের সঙ্গে ।
তারা কয় তাদের ভাষায়,
ও বলে কী ভাষা কে জানে—
বোধ করি ওলন্দাজি ।

সকালে রবারের নল নিয়ে তারা ডেক ধোয়,
ও তাদের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করে,
তারা হাসে ।
ওদের মধ্যে ছিল এক অল্প বয়সের ছেলে—
শামলা রঙ, কালো চোখ, ঝাঁকড়া চুল,
ছিপ্‌ছিপে গড়ন—
ও তাকে এনে দেয় আপেল কমলালেবু,
তাকে দেখায় ছবির বই ।
যাত্রীরা রাগ করে য়ুরোপের অসম্মানে ।

জাহাজ এল শিঙাপুরে ।
খালাসিদের ডেকে ও তাদের দিল সিগারেট,
আর দশটা করে টাকার নোট ।
ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি ।
কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে
তড়্‌বড়্‌ করে নেমে গেল ঘাটে ।

তখন তার আসল নাম হয়ে গেল জানাজানি ;
যারা চুরোট ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
'হায় হায়' করে উঠল তাদের মন ।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

বিশ্বশোক

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না ।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে ।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে ।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না ।

অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি ।
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে ।

আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।
বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।
তার সমুখে লজ্জা দিয়ো না—
আমার ক্ষতি আমার ব্যথা
তার সমুখে কণার কণা।

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।
দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে
শাখাপ্রশাখায়;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে;
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো—
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে,
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ চিঠি

মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েছে আমার
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই—
হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদুনে।

অমলির ঘরে ঢুকতে পারি নি বহুদিন,
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ ক'রে,
তাই খুললেম ঘরের তালা।
একজোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি।
শেল্‌ফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।
একটা অ্যালবাম,
ছবি কেটে কেটে জুড়েছে তার পাতায়।
আলনায় তোয়ালে, জামা, খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাঁচের আলমারিতে নানা রকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।

চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে
টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে।
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।
ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমারি ঠিকানা লেখা
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে।

শুনেছি ডুবে মরবার সময়
অতীত কালের সব ছবি
এক মুহূর্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—
চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে।

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাত বছর।

কেমন একটা ভয় লাগল মনে,
ও বুঝি বাঁচবে না বেশি দিন।
কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকালবিচ্ছেদের ছায়া
ভাবীকাল থেকে উল্টে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হ'ত না ওকে সঙ্গছাড়া করি।
কাজ করছি আপিসে বসে,
হঠাৎ হত মনে
যদি কোনো আপদ ঘটে থাকে।

বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে—
বললে, 'মেয়েটার পড়াশুনো হল মাটি।
মূর্খু মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে।'
লজ্জা পেলেম কথা শুনে তার,
বললেম,'কালই দেব ভর্তি করে বেথুনে।'

ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে।
কতদিন স্কুলের বাস্ অমনি যেত ফিরে।
সে চক্রান্তে বাপেরও ছিল যোগ।

ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে ;
বললে, 'এমন করে চলবে না।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে,
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে।
মাসির সঙ্গে গেল চলে।
অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভরে
যেতে দিলেম বলে।

বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে।
চার মাস খবর নেই।
মনে হল গ্রন্থি হয়েছে আলগা
গুরুর কৃপায়।
মেয়েকে মনে মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে,
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা।

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশীতে—
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি—
কী আর বলব,
দেবতাই তাকে নিয়েছে।

যাক সে-সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা—
'তোমাকে দেখতে বড়ো ইচ্ছে করছে'।
আর কিছুই নেই।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৯

বালক

হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ওই দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধনে।

এ দিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়,
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন যার নেই কোনো কিছুতেই,
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
যখন খুশি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে,
মুখে জল নিয়ে আকাশে ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কাটে,
ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে,
কঞ্চি নিয়ে করে মাছ-ধরা খেলা,
ডাঙায় গাছে উঠে পাড়ে জামরুল—
খায় যত ছড়ায় তার বেশি।

দশ-আনির টাক-পড়া মোটা জমিদার,
লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই—
বেলা দশটায় সে চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে,
ঝপ্ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়,
বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গা নাম করতে করতে চলে ঘরে—
সময় নেই, জরুরি মকর্দমা।
দিঘিটা আছে তার দলিলে, নেই তার জগতে।
আর ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই,
তাই সমস্ত বন-বাদাড় খাল-বিল তারই—
নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির,
তেঁতুল গাছের সবার উঁচু ডালটা।

জামবাগানের তলায় চরে ধোবাদের গাধা,
ছেলেটা তার পিঠে চড়ে—
ছড়ি হাতে জমায় ঘোড়দৌড় ।
ধোবাদের গাধাটা আছে কাজের গরজে—
ছেলেটার নেই কোনো দরকার,
তাই জন্তুটা তার চার পা নিয়ে সমস্তটা তারই,
যাই বলুন-না জজসাহেব ।
বাপ মা চায় পড়ে শুনে হবে সে সদর-আলো ;
সর্দার পোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,
হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,
হাজির করে পাঠশালায় ।
মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ—
হঠাৎ দেহটাকে ঘিরলে চার দেয়ালে,
মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে
পুঁথির পাতার গায়ে ।

আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ ।
আমার জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ ।
তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
মিলল না আমার জায়গা ।
আমার বাসা অনেক কালের পুরোনো বাড়ির
কোণের ঘরে—
বাইরে যাওয়া মানা ।
সেখানে চাকর পান সাজে, দেয়ালে মোছে হাত,
গুন গুন ক'রে গায় মধুকানের গান ;
শান-বাঁধানো মেজে, খড়্‌খড়ে-দেওয়া জানলা ।
নীচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ ।
জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
আঁকড়ে ধরেছে পুব ধারটা ।
সকাল থেকে নাইতে আসে পাড়ার লোকে,
বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকিমিকি জলে
ভেসে বেড়ায় পাতিহাঁসগুলো,
পাখা সাফ করে ঠোঁট দিয়ে মেজে ।
প্রহরের পর কাটে প্রহর ।
আকাশে ওড়ে চিল,
থালা বাজিয়ে যায় পুরোনো কাপড়ওয়ালা,
বাঁধানো নালা দিয়ে গঙ্গার জল এসে পড়ে পুকুরে ।

পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে ।

শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড়-জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ-পোহানো ছাদে।
অশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।
আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।
ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু ক'রে তার বুক উঠল দুলে।
বট গাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।
নারকেল-ডালের সবুজ হত নিবিড়,
পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।
যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে, বনে বনে।
পুব দিকের ও পার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ ছাড়া পেয়েছে আকাশে,
আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে।

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম। একে একে
পুকুরের পৈঁঠা যায় জলে ডুবে।
আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি।
রাত্তির হয়ে আসে, শুতে যাই বিছানায়,
খোলা জানলা দিয়ে গন্ধ পাই ভিজে জঙ্গলের।
উঠোনে একহাঁটু জল,
ছাদের নালার মুখ থেকে জলে পড়ছে জল মোটা ধারায়।
ভোরবেলায় ছুটেছি দক্ষিণের জানলায়,
পুকুর গেছে ভেসে ;
জল বেরিয়ে চলেছে কল্‌কল্‌ করে বাগানের উপর দিয়ে,
জলের উপর বেলগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা জেগে থাকে।
পাড়ার লোকে হৈ হৈ করে এসেছে
গামছা দিয়ে ধুতির কোঁচা দিয়ে মাছ ধরতে।
কাল পর্যন্ত পুকুরটা ছিল আমারি মতো বাঁধা,
এ বেলা ও বেলা তার উপরে পড়ত গাছের ছায়া,
উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে যেন সোনার পিচকারিতে
ছিটকে পড়ত তার উপরে আলো—

পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছল্‌ছলে দৃষ্টিতে ।
আজ তার ছুটি, কোথায় সে চলল খ্যাপা
গেরুয়া-পরা বাউল যেন ।
পুকুরের কোণে নৌকোটি
দাদারা চড়ে বসল ভাসিয়ে দিয়ে,
গেল পুকুর থেকে গলির মধ্যে,
গলির থেকে সদর রাস্তায়—
তার পরে কোথায় জানি নে । বসে বসে ভাবি ।

বেলা বাড়ে ।
দিনান্তের ছায়া মেশে মেঘের ছায়ায়,
তার সঙ্গে মেশে পুকুরের জলে বটের ছায়ার কালিমা ।
সন্ধে হয়ে এল ।
বাতি জ্বলল ঝাপসা আলোয় রাস্তার ধারে ধারে,
ঘরে জ্বলেছে কাঁচের সেজে মিট্‌মিটে শিখা,
ঘোর অন্ধকারে একটু একটু দেখা যায়
দুলছে নারকেলের ডাল,
ভূতের ইশারা যেন ।
গলির পারে বড়ো বাড়িতে সব দরজা বন্ধ,
আলো মিট্‌ মিট্‌ করে দুই-একটা জানলা দিয়ে
চেয়ে-থাকা ঘুমন্ত চোখের মতো ।
তার পরে কখন আসে ঘুম ।
রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দার নিষুত রাতে
বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে ।

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমার মন ;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে ।
শালের পাতায় পাতায় কোলাহল,
তালের ডালে ডালে করতালি,
বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে—
ছাতিম গাছের থেকে মালতীলতা
ঝরিয়ে দেয় ফুল ।
আর সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে,
লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা,
তাদের মনের কথা তারাই জানে ।

২ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

বাবা এসে শুধালেন,
'কী করছিস সুনি।
কাপড় কেন তুলিস বাক্সে, যাবি কোথায় ?'

সুনৃতার ঘর তিনতলায়।
দক্ষিণ দিকে দুই জানলা,
সামনে পালঙ্ক,
বিছানা লক্ষ্ণৌ-ছিটে ঢাকা।
অন্য দেয়ালে লেখবার টেবিল,
তার কোণে মায়ের ফোটোগ্রাফ—
তিনি গেছেন মারা।
বাবার ছবি দেয়ালে,
ফ্রেমে জড়ানো ফুলের মালা।
মেঝেতে লাল শতরঞ্চে
শাড়ি শেমিজ ব্লাউজ
মোজা রুমাল ছড়াছড়ি।
কুকুরটা কাছ ঘেঁষে লেজ নাড়ছে,
ঠেলা দিচ্ছে কোলে থাবা তুলে—
ভেবে পাচ্ছে না কিসের আয়োজন,
ভয় হচ্ছে পাছে ওকে ফেলে রেখে আবার যায় কোথাও।
ছোটো বোন শমিতা বসে আছে হাঁটু উঁচু করে,
বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।
চুল বাঁধা হয় নি,
চোখ দুটি রাঙা কান্নার অবসানে।

চুপ করে রইল সুনৃতা,
মুখ নিচু করে সে কাপড় গোছায়—
হাত কাঁপে।
বাবা আবার বললেন,
'সুনি, কোথাও যাবি নাকি।'
সুনৃতা শক্ত করে বললে, 'তুমি তো বলেইছ
এ বাড়িতে হতে পারবে না আমার বিয়ে,
আমি যাব অনুদের বাসায়।'
শমিতা বললে, 'ছি ছি, দিদি, কী বলছ।'
বাবা বললেন, 'ওরা যে মানে না আমাদের মত।'
'তবু ওদের মতই যে আমাকে মানতে হবে চিরদিন—'
এই বলে সুনি সেফটিপিন ভরে রাখলে লেফাফায়।
দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর, কঠিন ওর মুখের ভাব,
সংকল্প অবিচলিত।

বাবা বললেন, 'অনিলের বাপ জাত মানে,
সে কি রাজি হবে।'
সগর্বে বলে উঠল সুনৃতা,
'চেন না তুমি অনিলবাবুকে,
তাঁর জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।'
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা চলে গেলেন ঘর থেকে,
শমিতা উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে—
বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা।
সকাল থেকে খাওয়া নেই সুনৃতার।
শমিতা একবার এসেছিল ডাকতে—
ও বললে, খাবে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে।
মা-মরা মেয়ে, বাপের আদুরে,
মিনতি করতে আসছিলেন তিনি ;
শমিতা পথ আগলিয়ে বললে,
'কক্‌খনো যেতে পারবে না বাবা,
ও না খায় তো নেই খেল।'

জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখলে সুনৃতা রাস্তার দিকে,
এসেছে অনুদের গাড়ি।
তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়িয়ে
ব্রোচটা লাগাচ্ছে যখন কাঁধে,
শমি এসে বললে, 'এই নাও তাদের চিঠি।'
ব'লে ফেলে দিলে ছুঁড়ে ওর কোলে।
সুনৃতা পড়লে চিঠিখানা,
মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে,
বসে পড়ল তোরঙ্গের উপর।
চিঠিতে আছে—
'বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে,
হল না কিছুতেই,
কাজেই—'

বাজল একটা।
সুনি চুপ করে ব'সে, চোখে জল নেই।
রামচরিত বললে এসে,
'মোটর দাঁড়িয়ে অনেক ক্ষণ।'
সুনি বললে, 'যেতে বলে দে।'
কুকুরটা কাছে এসে বসে রইল চুপ করে।

বাবা বুঝলেন,
প্রশ্ন করলেন না—
বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে,
'চল্ সুনি, হোসেঙ্গাবাদে তোর মামার ওখানে।'

কাল বিয়ের দিন।
অনিল জিদ করেছিল হবে না বিয়ে।
মা ব্যথিত হয়ে বলেছিল, 'থাক্-না।'
বাপ বললে, 'পাগল নাকি!'
ইলেক্‌ট্রিক বাতির মালা খাটানো হচ্ছে বাড়িতে,
সমস্ত দিন বাজছে সানাই।
হুহু করে উঠছে অনিলের মনটা।

তখন সন্ধ্যা সাতটা।
সুনিদের বউবাজারের বাড়ির এক তলায়
ডাবাহুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে
কৈলেস সরকার,
আর তালপাতার পাখায় বাতাস চলছে ডান হাতে;
বেহারাকে ডেকেছে পা টিপে দেবে।
কালিমাখা ময়লা জাজিমে কাগজপত্র রাশ করা;
জ্বলছে একটা কেরোসিন লণ্ঠন।
হঠাৎ অনিল এসে উপস্থিত।
কৈলেস শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ালো
শিথিল কাছাকোঁচা সামলিয়ে।
অনিল বললে,
'পার্বণীটা ভুলেছিলেম গোলেমালে,
তাই এসেছি দিতে।'
তার পরে বাধো-বাধো গলায় বললে,
'অমনি দেখে যাব তোমাদের সুনিদিদির ঘরটা।'

গেল ঘরে।
খাটের উপর রইল বসে মাথায় হাত দিয়ে।
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,
মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের না শুকনো ফুলের
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির—
বিছানায়, চৌকিতে, পর্দায়।
সিগারেট ধরিয়ে টানল কিছুক্ষণ,
ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে।
টেবিলের নীচে থেকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটা
নিল কোলে তুলে।

ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে ;
দেখলে ঝুড়ি-ভরা রাশি রাশি ছেঁড়া চিঠি,
ফিকে নীল রঙের কাগজে
অনিলেরই হাতে লেখা।
তার সঙ্গে টুকরো টুকরো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।
আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটি ফুল, লাল ফিতেয় বাঁধা
মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে,
শুকনো প্যান্‌সি আর ভায়োলেট।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

কীটের সংসার

এক দিকে কামিনীর ডালে
মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে,
আর-এক দিকে বাগানে রাস্তার ধারে
লাল-মাটির-কণা-ছড়ানো
পিঁপড়ের বাসা।
যাই আসি তারি মাঝখান দিয়ে
সকালে বিকালে।
আনমনে দেখি শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরেছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।
বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।
তেমনি ওই কীটের সংসার।
ভালো করে চোখে পড়ে না,
তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা।
কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের,
অনেক সমস্যা, অনেক প্রয়োজন—
অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
চলেছে প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহ।
মাঝখান দিয়ে যাই আসি,
শব্দ শুনি নে ওদের চিরপ্রবাহিত
চৈতন্যধারার—
ওদের ক্ষুধাপিপাসা-জন্মমৃত্যুর।
গুন গুন সুরে আধখানা গানের
জোড় মেলাতে খুঁজে বেড়াই
বাকি আধখানা পদ,

এই অকারণ অদ্ভুত খোঁজের কোনো অর্থ নেই
ওই মাকড়সার বিশ্বচরাচরে,
ওই পিঁপড়ে-সমাজে ।
ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা ।

আমি মানুষ—
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে ।
কিন্তু ওই মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ওই পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই ।
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আসি যাই সকালে বিকালে—
দেখি, শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে ।

২৪ ভাদ্র ১৩৩৯

ক্যামেলিয়া

নাম তার কমলা,
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা ।
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায় ।
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে ।
মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে ।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা ।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হল না ।

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই—
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,
প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে,
প্রায়ই হয় দেখা ।
মনে মনে ভাবি, আর-কোনো সম্বন্ধ না থাক্,
ও তো আমার সহযাত্রিণী ।

নির্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্‌ করছে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।
মনে ভাবি একটা কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন,
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,
কোনো-একজন গুণ্ডার স্পর্ধা।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে—
না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ, না রাজহাঁসের।

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়।
কমলার পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল, অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে,
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।
কোনো ছুতো পাই নে, হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে।
এমন সময়ে সে এক মোটা চুরোট ধরিয়ে
টানতে করলে শুরু।
কাছে এসে বললুম, 'ফেলো চুরোট।'
যেন পেলেই না শুনতে,
ধোঁওয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম চুরোট রাস্তায়।
হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকালো কট্‌মট্‌ ক'রে—
আর কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল খেলায়,
বেশ একটু চওড়া গোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নিচু করে ভান করলে পড়বার।
হাত কাঁপতে লাগল,
কটাক্ষেও তাকালে না বীরপুরুষের দিকে।
আপিসের বাবুরা বললে, 'বেশ করেছেন মশায়।'
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।

পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না,
তৃতীয় দিনে দেখি
একটা ঠেলাগাড়িতে চলেছে কলেজে।

বুঝলুম, ভুল করেছি গোঁয়ারের মতো ।
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না ।
আবার বললুম মনে মনে,
ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা—
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে
কোলাব্যাঙের ঠাট্টার মতো ।
ঠিক করলুম ভুল শোধরাতে হবে ।

খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে ।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার ।
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে
গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড় ।
শোনা গেল আসবে না এবার ।
ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা,
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায় ।
সে বললে, 'তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে ।'
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু—
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক, আহারে ততটা নয় ।
ফুটবলের সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি—
মনে করলে আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া ।
হায় রে ভাগ্যের খেলা !

যেদিন নেমে আসব তার দু দিন আগে তনুকা বললে,
'একটি জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা—
একটি ফুলের গাছ ।'
এ এক উৎপাত । চুপ করে রইলেম ।
তনুকা বললে, 'দামি দুর্লভ গাছ,
এ দেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে ।'
জিগেস করলেম, 'নামটা কী ?'
সে বললে 'ক্যামেলিয়া' ।
চমক লাগল—
আর-একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে ।
হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না ।'

তনুকা কী বুঝলে জানি নে, হঠাৎ লজ্জা পেলে,
খুশিও হল।
চললেম টবসুদ্ধ গাছ নিয়ে।
দেখা গেল পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কামরা গাড়িতে
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা।

পুজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠল
সাঁওতাল পরগনায়।
জায়গাটা ছোটো। নাম বলতে চাই নে—
বায়ু বদলের বায়ু -গ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।
কমলার মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।
এইখানে বাসা বেঁধেছেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়।
সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।
বাসাবাড়ি কোথাও নেই,
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

কমলা এসেছে মাকে নিয়ে
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শাল-বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে।
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।
অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে
পেরিয়ে যায় ও পারে,
সেখানে সিসুগাছের তলায় বই পড়ে।
আর আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই।

একদিন দেখি নদীর ধারে বালির উপর চড়িভাতি করছে এরা।
ইচ্ছে হল গিয়ে বলি, আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই।

আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে—
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে,
আর, তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না !

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক—
শর্ট্-পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,
কমলার পাশে পা ছড়িয়ে
হাভানা চুরোট খাচ্ছে।
আর, কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি,
পাশে পড়ে আছে
বিলিতি মাসিক পত্র।

মুহূর্তে বুঝলেম এই সাঁওতাল পরগনার নির্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত, ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
সমস্ত দিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোল কত দূর।

সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টি সুরে আওয়াজ এল, 'বাবু, ডেকেছিস কেনে।'
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে।'
আমি বললেম, 'এইজন্যেই।'
তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯

শালিখ

শালিখটার কী হল তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।
প্রথম দিন দেখেছিলেম শিমুল গাছের তলায়,
আমার বাগানে,
মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।
তার পরে ওই রোজ সকালে দেখি—
সঙ্গীহারা, বেড়ায় পোকা শিকার ক'রে।
উঠে আসে আমার বারান্দায়—
নেচে নেচে করে সে পায়চারি,
আমার 'পরে একটুকু নেই ভয়।
কেন এমন দশা।
সমাজের কোন্ শাসনে নির্বাসনের পালা,
দলের কোন্ অবিচারে
জাগল অভিমান।
কিছু দূরেই শালিখগুলো
করছে বকাবকি,
ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি,
উড়ে বেড়ায় শিরীষ গাছের ডালে ডালে—
ওর দেখি তো খেয়াল কিছুই নেই।
জীবনে ওর কোন্‌খানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।
সকালবেলার রোদে যেন সহজ মনে
আহার খুঁটে খুঁটে
ঝরে-পড়া পাতার উপর
লাফিয়ে বেড়ায় সারাবেলা।
কারো উপর নালিশ আছে
মনে হয় না একটুও তা।
বৈরাগ্যের গর্ব তো নেই ওর চলনে,
কিংবা দুটো আগুন-জ্বলা চোখ।

কিন্তু ওকে দেখি নি তো সন্ধেবেলায়—
একলা যখন যায় বাসাতে ডালের কোণে,
ঝিল্লি যখন ঝি ঝি করে অন্ধকারে,
হাওয়ায় আসে বাঁশের পাতার ঝর্‌ঝরানি।
গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুমভাঙানো
সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা।

২১ ভাদ্র ১৩৩৯

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণ-দশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে—
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম ! এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড় !

আর তারা কি সবাই অসামান্য—
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেলের চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে—
বাঙালি কবির কবিতা ক' লাইন দিয়েছে তুলে
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে—
তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি—
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
'এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে;
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
দুর্লভ, মূল্যহীন।'
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।
সেইসঙ্গে নরেশ লিখেছে,
'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।'
বুঝতেই পারছ
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো, নাহয় তাই হল,
নাহয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।

কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ওই নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই।
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে।
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে?
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম· এ·
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ওইখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।

ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক-না,
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটে নি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল।
হায় রে সামান্য মেয়ে !
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয় !

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

একজন লোক

আধবুড়ো হিন্দুস্থানি,
রোগা লম্বা মানুষ—
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা— চলেছে শহরের দিকে।
ভাদ্রমাসের সকালবেলা,
পাতলা মেঘের ঝাপসা রোদ্‌দুর ;
কাল্‌ গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দোমনা ক'রে বইছে আমলকীর কচি ডালে।

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার—
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি— একজন লোক।
তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায়;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে;
কোনোখানেই নেই
আমি— একজন লোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানি পেশোয়াজ
ফিকে সবুজের 'পরে ফুলকাটা সোনালি রঙের।
বিলেতের হাট থেকে এল তার বর;
সেকালের রাজপুত্র কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালখ—
কাল হবে অধিবাস, পর্শু হবে বিয়ে।

সন্ধে হল।
পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেকট্রিক বাতি।

কোথা থেকে এল এক কালো চামচিকে,
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে,
সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।
হানাসান ডেকে বলে,
'চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।'

মণিদিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল! কোথা গেল!
বটগাছে আঙিনার পারে
বাসা ক'রে আছে ব্যাঙ্গমা;
সে বলে, 'আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।'
মণি বলে, 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো,
ফিরিয়ে আনি গে।'

ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা,
মণিদিদি উড়ে চলে সারা রাত্রি ধ'রে।
ভোর হল, এল চিত্রকূটগিরি—
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে, 'হানাসান! কোথা হানাসান!
খেলা যে আমার প'ড়ে আছে।'

নীল মেঘ বলে এসে,
'মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে।'
মণি বলে, 'তোমাদের খেলা কিরকম।'
কালো মেঘ ভেসে এল
হেসে চিকিমিকি,
ডেকে গুরু গুরু
বলে, 'ওই চেয়ে দেখো, হানাসান হল নানাখানা—
ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়,
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।'

মণি বলে, 'ব্যাঙ্গমা দাদা,
এ দিকে বিয়ে যে ঠিক—
বর এসে কী বলবে শেষে।'
ব্যাঙ্গমা হেসে বলে,
'আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।'

মণি কেঁদে বলে, 'তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা।'
ব্যাঙ্গমা বলে, 'মণিদিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টি-ধোওয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।'

১৩ আষাঢ় ১৩৩৯

পত্রলেখা

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন,
কতমতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্‌কোখানি
আখরোট কাঠ দিয়ে গড়া।
ছাপ-মারা চিঠির কাগজ
নানা বহরের।
রুপোর কাগজ-কাটা এনামেল-করা।
কাঁচি ছুরি গালা লাল-ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেন্সিল।
বলে গিয়েছিলে তুমি চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে।

লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।

লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাই নে তো।
একটি খবর আছে শুধু—
তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারো তো জানা।

তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি এ কথাটি জানাই তোমাকে—
তুমি চলে গেছ।
যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে এ খবর সহজ তো নয়।
আমি নই কবি—
ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে ;
না থাকে চোখের চাওয়া।
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি।

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্‌কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসিগে।
শেষবার এই লিখে যাই—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যতকিছু
হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের 'পরে।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

খ্যাতি

ভাই নিশি,
তখন উনিশ আমি, তুমি হবে বুঝি
পঁচিশের কাছাকাছি।
তোমার দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে—
'ক্ষান্তপিসি,' তার পরে 'পঞ্চুর মৌতাত'।
তা ছাড়া মাসিকপত্র কালচক্রে ক্রমে বের হল
'রক্তের আঁচড়'।
হুলুস্থুল পড়ে গেল দেশে।
কলেজের সাহিত্যসভায়
সেদিন বলেছিলেম বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো,
তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।
আমাকে খ্যাপাত দাদা নিশি-পাওয়া ব'লে।
কলেজের পালা-শেষে
করেছি ডেপুটিগিরি,
ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।
তার পর থেকে, যা আমার
সৌভাগ্য অভাবনীয় তাই ঘটে গেল—
বন্ধুরূপে পেলেম তোমাকে।

কাছে পেয়ে কোনোদিন
তোমাকে করি নি খাটো—
ছোটো বড়ো নানা ক্রটি সেও আমি হেসে ভালোবেসে
তোমার মহত্ত্বে সবই মিলিয়ে নিয়েছি।
এ ধৈর্য, এ পূর্ণদৃষ্টি, এও যে তোমারি কাছে শেখা।
দোষে ভরা অসামান্য প্রাণ,
সে চরিত্র -রচনায় সব চেয়ে ওস্তাদি তোমার
সে তো আমি জানি।

তার পরে কতবার অনুরোধ করেছ কেবলই—
বলেছিলে, 'লেখো, লেখো, গল্প লেখো।
লেখকের মঞ্চে ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।
আত্ম-অবিশ্বাসে শুধু আটকে পড়েছ
পড়ুয়ার নীচের বেঞ্চিতে।'
শেষকালে বহু ইতস্তত ক'রে
লেখা করলেম শুরু।

বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
পান্‌তিঘাটায়।
আসামি পোলিটিকাল,
সাতমাস পলাতকা।
মাকে দেখে যাবে বলে একদিন রাত্রে এসেছিল
প্রাণ হাতে ক'রে।
খুড়ো গেল পুলিসে খবর দিতে।
কিছুদিন নিল সে আশ্রয়
জেলেনীর ঘরে।
যখন পড়ল ধরা সত্য সাক্ষ্য দিল খুড়ো,
মিথ্যেসাক্ষ্য দিয়েছে জেলেনী।
জেলেনীকে দিতে হল জেলে,
খুড়ো হল সাব্‌রেজিস্ট্রার।

গল্পখানা পড়ে
বিস্তর বাহবা দিয়েছিলে।
খাতাখানা নিজে নিয়ে
শম্ভু সাণ্ডেলের ঘরে
বলে এলে— কালচক্রে অবিলম্বে বের হওয়া চাই।
বের হল মাসে মাসে—
শুক্‌নো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।
'বাঁশরি'তে লিখে দিল—
কোথা লাগে আশুবাবু এ নবীন লেখকের কাছে।

শুনে হেসেছিলে তুমি।
পাঞ্চজন্যে লিখেছিল রতিকান্ত ঘোষ—
এত দিনে বাঙলা ভাষায়
সত্য লেখা পাওয়া গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার হাস নি তুমি।
তার পর থেকে
তোমার আমার মাঝখানে
খ্যাতির কাঁটার বেড়া ক্রমে ঘন হল।

এখন আমার কথা শোনো।
আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইঞ্চিদুই পলিমাটি-'পরে
হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা।
স্টুপিড জানে না—
মূল এর বেশি দূর নয়;
ফল এর কোনোখানে নেই,
কেবলই পাতার ঘটা।
তোমার যে পঞ্চু সে তো বাঙলার ডন্‌কুইক্সোট,
তার যা মৌতাত
সে যে জন্মখ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল।
আমার এ কুঞ্জলাল তুবড়ির মতো
জ্বলে আর নেবে—
বোকাদের চোখে লাগে ধাঁধা।
আমি জানি তুমি কতখানি বড়ো।
এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।
কাগজের মোড়কটা খুলে দেখো,
আমার লেখার দগ্ধশেষ।
আজ বাদে কাল হ'ত ধুলো,
আজ হোক ছাই।

২৪ আষাঢ় ১৩৩৯

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি ।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই ।
লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা ।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি ।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব ।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি ।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে ।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে ।
এঞ্জিনের ধস্ ধস্,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাঁকি ।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার ।

ধলেশ্বরীনদীতীরে পিসিদের গ্রাম ।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক ।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে ।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ ।
ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর ।

বর্ষা ঘন ঘোর ।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায় ।

গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,

মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে !
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার ।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে ।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড় ।
দিন রাত মনে হয়, কোন্‌ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি ।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ ।
কর্নেট বাজানো তার শখ ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায় ।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা ।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে,
দুর্বিষহ, মাতালের প্রলাপের মতো ।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই ।

বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়াছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী ;
তীরে তমালের ঘন ছায়া ;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫ আষাঢ় ১৩৩৯

উন্নতি

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাস্টারের কাছে
সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার।
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হ'ত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত
লেজ-দোলা বাঁদরের দিকে।
সেই উপলক্ষে—
আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের
নির্ভেদ নির্ণয় করে
মাস্টার দিতেন কানমলা।

ছুটি হলে পরে
শুরু হত আমার মাস্টারি
উদ্ভিদ্‌-মহলে।
ফলসা চালতা ছিল, ছিল সার-বাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে ;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।

বলতেম, 'দেখ্ দেখি বোকা,
উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল—
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।'
শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বার বার 'উন্নতি' কথাটা শোনা যেত।
ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।
বড়ো হওয়া চাই—
অর্থাৎ, নিতান্ত পক্ষে হতে হবে বাজিদপুরের
ভজু মল্লিকের জুড়ি।
ফলসার ফলে ভরা গাছ
বাগান-মহলে সেই ভজু মহাজন।
চারাটাকে রোজ বোঝাতেম,
ওরই মতো বড়ো হতে হবে।
কাঠি দিয়ে মাপি তাকে এবেলা ওবেলা—
আমারি কেবল রাগ বাড়ে,
আর কিছু বাড়ে না তো।
সেই কাঠি দিয়ে তাকে মারি শেষে সপাসপ্ জোরে—
একটু ফলে নি তাতে ফল।
কান-মলা যত দিই
পাতাগুলো ম'লে ম'লে,
ততই উন্নতি তার কমে।

এদিকে ছিলেন বাবা ইন্‌কম্-ট্যাক্সো-কালেক্টার,
বদলি হলেন
বর্ধমান ডিভিজনে।
উচ্চ ইংরেজির স্কুলে পড়া শুরু করে
উচ্চতার পূর্ণ পরিণতি
কোলকাতা গিয়ে।
বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।
বহুকষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুন মাসে নবমী তিথিতে।
নববসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই
এমন সময়ে— রিডাক্‌শান্।

পোকা-খাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্যি টুপ্‌টুপে,
ঝুপ্‌ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়,
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হল
সে কেবল আমারি কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,
শুক্‌নো মুখ,
চোখ গেছে বসে,
তুবড়ে গিয়েছে পেট,
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ—
ঘুরে মরি বড়লোকদের দ্বারে।
এমন সময় চিঠি এল
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।

বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুলতে সেটা ডালে ঠেকে গেল।
রাগ হল মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি,
আরে আরে ছাত্র যে আমার!
শেষকালে বড়োই তো হল,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজু মল্লিকেরই মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গসুচতুর
বটেকৃষ্ট, ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি 'পরমহংস' ব'লে।
ক্রমে সেটা হল 'পাতিহাঁস'।

শেষকালে হল 'হাঁসখালি'—
কোনো তার অর্থ নেই, সেই তার খোঁচা ।

আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয় ।
নিষ্ঠুরের দল বাড়ে,
ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে ।
ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার
নিষ্কাম বিদ্রূপসূচি বিঁধে
অহৈতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর ।

একদিন মুক্তি পেল সে বেচারা,
বেরোল ইস্কুল থেকে ।
তার পরে গেল বহুদিন—
তবু যেন নাড়ীতে জড়িয়ে ছিল
সেদিনের সশঙ্ক সংকোচ ।
জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দয়তা,
তারি কেন্দ্রস্থলে,
বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন ।

সে কথা জানত বটু,
সুনীতের এই অন্ধ ভয়টাকে
মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে পেত সুখ
হিংস্র ক্ষমতার অহংকারে ;
ডেকে যেত সেই পুরাতন নামে,
হেসে যেত খলখল হাসি ।

বি· এল পরীক্ষা দিয়ে
সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে ।
কাজের অভাব ছিল, সময়ের অভাব ছিল না—
গান গেয়ে সেতার বাজিয়ে
ছুটি ভরে যেত ।
নিয়ামৎ ওস্তাদের কাছে
হ'ত তার সুরের সাধনা ।

ছোটো বোন সুধা,
ডায়োসিসনের বি· এ·
গণিতে সে এম· এ· দিবে এই তার পণ ।
দেহ তার ছিপ্‌ছিপে,
চলা তার চটুল চকিত,
চশমার নীচে
চোখে তার ঝলমল কৌতুকের ছটা—

দেহমন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুশিতে।
তারি এক ভক্ত সখী নাম উমারানী—
শান্ত কণ্ঠস্বর,
চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া,
দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে।
পাঠ্য ছিল ফিলজফি,
সে কথা জানাতে তার বিষম সংকোচ।

দাদার গোপন কথাখানা
সুধার ছিল না অগোচর।
চেপে রেখেছিল হাসি,
পাছে হাসি তীব্র হয়ে বাজে তার মনে।
রবিবার
চা খেতে বন্ধুকে ডেকেছিল।
সেদিন বিষম বৃষ্টি,
রাস্তা গলি ভেসে যায় জলে,
একা জানালার পাশে সুনীত সেতারে
আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।
মন জানে
উমা আছে পাশের ঘরেই।
সেই-যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে কাঁপে।

হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকে
সেতারটা কেড়ে নিয়ে বলে সুধা,
'উমার বিশেষ অনুরোধ
গান শোনাতেই হবে,
নইলে সে ছাড়ে না কিছুতে।'
লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
এ মিথ্যা কথার
কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
ভেবে সে পেল না।

সন্ধ্যার আগেই
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে;
থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগে কাঁচের সাশিতে;
বারান্দর টব থেকে মৃদুগন্ধ দেয় জুঁইফুল;
হাঁটুজল জমেছে রাস্তায়,
তারি 'পর দিয়ে
মাঝে মাঝে ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি।

দীপালোকহীন ঘরে
সেতারের ঝংকারের সাথে
সুনীত ধরেছে গান
নটমল্লারের সুরে—
আওয়ে পিয়রওয়া,
রিমিঝিমি বরখন লাগে !
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে ।
অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল—
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা ।

সন্ধ্যা হল ।
বৃষ্টি থেমে গেছে,
জ্বলেছে পথের বাতি ।
পাশের বাড়িতে
কোন্ ছেলে দুলে দুলে
চেঁচিয়ে ধরেছে তার পরীক্ষার পড়া ।

এমন সময় সিঁড়ি থেকে
অট্টহাস্যে এল হাঁক,
'কোথা ওরে, কোথা গেল হাঁসখালি !'
মাংসল পৃথুলদেহ বটেকৃষ্ট স্ফীতরক্তচোখ
ঘরে এসে দেখে
সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসংকোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপের ঊর্ধ্বে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন ।
জোর করে হেসে উঠে
কী কথা বলতে গেল বটু,
সুনীত হাঁকল 'চুপ'—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের ডাকের মতো
হাসি গেল থেমে ।

৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

তীর্থযাত্রী

টি· এস· এলিয়ট'এর The Journey of the Magi- নামক কবিতার অনুবাদ

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা—
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর শর্বতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এ দিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা ; নগরীতে সন্দেহ।
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুশকিল।
শেষে ঠাওরালেম চলব সারারাত,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে—
এ সমস্তই পাগলামি।

ভোরের দিকে এলেম যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে ;
সেখানে বরফ-সীমার নীচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল ;
সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা—
বলা যেতে পারে ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক।

মনে পড়ে এ-সব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো—
এই লিখে রাখো— এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।

জন্ম একটা হয়েছিল বটে—
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর—
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

[মাঘ ১৩৩৯]

চিররূপের বাণী

প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া
সূর্যগ্রহণের কালিমার মতো।
উঠল ধ্বনি : খোলো দ্বার !
প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে,
সে কেঁপে উঠল চমক খেয়ে।
দরজা ধরল চেপে,
আগলের উপর আগল লাগল।
কম্পিতকণ্ঠে বললে, কে তুমি।
মেঘমন্দ্র-ধ্বনি এল : আমি মাটি-রাজত্বের দূত,
সময় হয়েছে, এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।
ঝন্‌ঝন্‌ বেজে উঠল দ্বারের শিকল,
থরথর কাঁপল প্রাচীর,
হায়-হায় করে ঘরের হাওয়া।
নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।
ধক্‌ধক্‌ ধক্‌ধক্‌ আঘাতে
খান্‌খান্‌ হল দ্বারের আগল, কপাট পড়ল ভেঙে।

কম্পমান কণ্ঠে প্রাণ বললে, হে মাটি, হে নিষ্ঠুর, কী চাও তুমি ?
দূত বললে, আমি চাই দেহ।
দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে প্রাণ ; বললে :
এতকাল আমার লীলা এই দেহে,
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য,
নাড়ীতে নাড়ীতে ঝংকার,

মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে—
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,
ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে ?
দূত বললে, ঋণে বোঝাই তোমার এই দেহ,
শোধ করবার দিন এল—
মাটির ভাণ্ডারে ফিরবে তোমার দেহের মাটি।
প্রাণ বললে, মাটির ঋণ শোধ করে নিতে চাও, নাও—
কিন্তু তার চেয়ে বেশি চাও কেন ?
দূত বিদ্রূপ করে বললে, এই তো তোমার নিঃস্ব দেহ,
কৃশ ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দশীর চাঁদ—
এর মধ্যে বাহুল্য আছে কোথায় ?
প্রাণ বললে, মাটিই তোমার, রূপ তো তোমার নয়।
অট্টহাস্যে হেসে উঠল দূত ; বললে,
যদি পার দেহ থেকে রূপ নাও ছাড়িয়ে।
প্রাণ বললে, পারবই, এই পণ আমার।

প্রাণের মিতা মন। সে গেল আলোক-উৎসের তীর্থে।
বললে জোড়হাত করে :
হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ—
তোমার সৃষ্টির অপমান।
তোমার রূপকে লুপ্ত করে সে কোন্ অধিকারে।
আমাকে কাঁদায় কার অভিশাপে।
মন বসল তপস্যায়।
কেটে গেল হাজার বছর, লক্ষ বছর— প্রাণের কান্না থামে না।
পথে পথে বাটপাড়ি,
রূপ চুরি যায় নিমেষে নিমেষে।
সমস্ত জীবলোক থেকে প্রার্থনা ওঠে দিনরাত :
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
যে দান করেছ নিজহাতে জড় দানব তাকে কেড়ে নিয়ে যায় যে।
ফিরিয়ে আনো তোমার আপন ধন।

যুগের পর যুগ গেল, নেমে এল আকাশবাণী :
মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।
বর দিলেম হারা রূপ ধরা দেবে,
কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।
রূপ এল ফিরে দেহহীন ছবিতে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এল চারি দিক থেকে রূপের প্রেমিক।

আবার দিন যায়, বৎসর যায়। প্রাণের কান্না থামে না।
আরো কী চাই।
প্রাণ জোড়হাত করে বলে :
মাটির দূত আসে, নির্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়—
বলে 'কণ্ঠনালী আমার'।
শুনে আমি বলি, মাটির বাঁশিখানি তোমার বটে,
কিন্তু বাণী তো তোমার নয়।
উপেক্ষা করে সে হাসে।
শোনো আমার ক্রন্দন, হে বিশ্ববাণী,
জয়ী হবে কি জড়মাটির অহংকার—
সেই অন্ধ সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব,
যে বাণী অমৃতের বাহন তার বুকের উপর স্থাপন করবে জড়ের জয়স্তম্ভ ?

শোনা গেল আকাশ থেকে :
ভয় নেই।
বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।
আশীর্বাদ এই আমার, সার্থক হবে মনের সাধনা ;
জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী।

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।
জয়ধ্বনি উঠল মর্তলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

[৩ পৌষ ১৩৩৯]
১৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

শুচি

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ—
সারাদিন তার কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।
সেদিন মন্দিরে উৎসব—
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।

সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে—
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
'ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি।'
ঠাকুর বললেন, 'আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে;
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।'

'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু'
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল; বললেন,
'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা!'
রামানন্দ বললেন, 'প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।'

তখন রাত্রি তিন-প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন।
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে; শুনতে পেলেন,
'সময় হয়েছে, ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।'
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, 'এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।'
ঠাকুর বললেন, 'প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।'

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।

রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, 'প্রভু আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।'
গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাই নি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন—
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।'

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,
অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্ গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
'প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে—
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্কার দিয়ে বললে, 'এ কী করলেন প্রভু!'
রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

[১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯]
১৭ নভেম্বর ১৯৩২

রঙরেজিনী

শঙ্করলাল দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত।
শাণিত তাঁর বুদ্ধি
শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো,
বিপক্ষের যুক্তির উপর পড়ে বিদ্যুদ্‌বেগে—
তার পক্ষ দেয় ছিন্ন করে,
ফেলে তাকে ধুলোয়।
রাজবাড়িতে নৈয়ায়িক এসেছে দ্রাবিড় থেকে।
বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।
আহ্বান স্বীকার করেছেন শঙ্কর,
এমন সময় চোখে পড়ল পাগড়ি তাঁর মলিন।
গেলেন রঙরেজির ঘরে।

কুসুমফুলের খেত, মেহেদিবেড়ায় ঘেরা।
প্রান্তে থাকে জসীম রঙরেজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রঙ বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রঙ মেলায়।
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,
চোলি তার বাদামি রঙের,
শাড়ি তার আশমানি।
বাপ কাপড় রাঙায়,
রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা।

শঙ্কর বললেন, জসীম,
পাগড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরানি রঙে,
রাজসভায় ডাক পড়েছে।

কুল্ কুল্ করে জল আসে নালা বেয়ে কুসুমফুলের খেতে ;
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ায় বসে।
ফাগুনের রৌদ্র ঝলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে।
ধোওয়ার কাজ হল, প্রহর গেল কেটে।
পাগড়ি যখন বিছিয়ে দিল ঘাসের 'পরে
রঙরেজিনী দেখল তারি কোণে
লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ—
'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে'।
বসে বসে ভাবল অনেকক্ষণ,
ঘুঘু ডাকতে লাগল আমের ডালে।
রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে
আরেক চরণ লিখে দিল—
'পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে'।

দুদিন গেল কেটে।
শঙ্কর এল রঙরেজির ঘরে।
শুধালো, পাগড়িতে কার হাতের লেখা ?
জসীমের ভয় লাগল মনে।
সেলাম করে বললে, 'পণ্ডিতজি,
অবুঝ আমার মেয়ে,
মাপ করো ছেলেমানুষি।
চলে যাও রাজসভায়—
সেখানে এ লেখা কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না।'
শঙ্কর আমিনার দিকে চেয়ে বললে,
'রঙরেজিনী,
অহংকারের-পাকে-ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,
আর পাব না খুঁজে।'

বরানগর
২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

মুক্তি

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে
কাল সকালে।

কীর্তনী এসেছে গ্রামের থেকে,
মন্দিরে ছিল না তার স্থান।
সে বসেছে অঙ্গনের এক কোণে
পিপুল গাছের তলায়।
একতারা বাজায় আর কেবল সে ফিরে ফিরে বলে,
'ঠাকুর, তোমায় কে বসালো
কঠিন সোনার সিংহাসনে।'
রাত তখন দুই প্রহর,
শুক্লপক্ষের চাঁদ গেছে অস্তে।
দূরে রাজবাড়ির তোরণে
বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প,
জ্বলছে প্রদীপের মালা।

কীর্তনী গাইছে,
'তমালকুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,

ধুলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা
এই ছিল প্রত্যাশা ।'

আরতি হয়ে গেছে সারা—
মন্দিরের দ্বার তখন বন্ধ,
ভিড়ের লোক গেছে রাজবাড়িতে ।
কীর্তনী আপন মনে গাইছে—
'প্রাণের ঠাকুর,
এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে ।
তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধুলোয়
তোমার পরশ আমার পরশ
মিলবে ব'লে ।'

সেই পিপুল-তলার অন্ধকারে
একা একা গাইছিল কীর্তনী,
আর আরেকজনা গোপনে—
বাজিরাও পেশোয়া ।

শুনছিল সে—
'তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল-দেওয়া ঘরের থেকে,
আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে ।
ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা,
ছাড়া পাবে হৃদয়-মাঝে ।
থাক্ গে ওরা পাথরখানা নিয়ে
পাথরের বন্দীশালায়
অহংকারের-কাঁটার-বেড়া-ঘেরা ।'

রাত্রি প্রভাত হল ।
শুকতারা অরুণ-আলোয় উদাসী ।
তোরণদ্বারে বাজল বাঁশি বিভাসে ললিতে ।
অভিষেকের স্নান হবে,
পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে ।

রাজবাড়ির ঠাকুরঘর শূন্য ।
জ্বলছে দীপশিখা,
পূজার উপচার পড়ে আছে—
বাজিরাও পেশোয়া গেছে চলে
পথের পথিক হয়ে ।

১৪ মাঘ ১৩৩৯

প্রেমের সোনা

রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো ।
সজন রাজপথ বিজন তার কাছে,
পথিকেরা চলে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে ।

গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে
চলেছেন দেবালয়ের পথে,
দূর থেকে রবিদাস প্রণাম করল তাঁকে,
ধুলায় ঠেকালে মাথা ।
রামানন্দ শুধালেন, 'বন্ধু, কে তুমি ।'
উত্তর পেলেন, 'আমি শুক্‌নো ধুলো—
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,
ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙ-বেরঙের ফুলে ।'
রামানন্দ নিলেন তাকে বুকে,
দিলেন তাকে প্রেম ।
রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া ।

চিতোরের রানী, ঝালি তাঁর নাম ।
গান পৌঁছল কানে,
তাঁর মন করে দিল উদাস !
ঘরের কাজে মাঝে মাঝে
দু চোখ দিয়ে জল পড়ে ঝ'রে ।
মান গেল তাঁর কোথায় ভেসে ।
রবিদাস চামারের কাছে
হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী ।

স্মৃতিশিরোমণি
রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত
বললে, 'ধিক্ মহারানী, ধিক্ ।
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাঁট দেয় ধুলো,
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু ব'লে—
ব্রাহ্মণের হেঁট হল মাথা
এ রাজ্যে তোমার ।'

রানী বললেন, 'ঠাকুর, শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা ।

আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর,
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।'

২৪ পৌষ ১৩৩৯

স্নানসমাপন

গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
গঙ্গার জলে পূর্বমুখে।
তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
ভোরের হাওয়ায় স্রোত উঠছে ছল্‌ছল্‌ করে।
রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যোদয়ের দিকে।
মনে মনে বলছেন,
'হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না।
ঘোচাও তোমার আবরণ।'

সূর্য উঠল শালবনের মাথার উপর।
জেলেরা নৌকায় পাল দিলে তুলে,
বকের পাঁতি উড়ে চলেছে সোনার আকাশ বেয়ে
ও পারে জলার দিকে।
এখনো স্নান হল না সারা।
শিষ্য শুধালো, 'বিলম্ব কেন প্রভু,
পূজার সময় যায় বয়ে।'
রামানন্দ উত্তর করলেন,
'শুচি হয় নি তনু,
গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে।'
শিষ্য বসে ভাবে, এ কেমন কথা।

সর্ষেখেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।
মালিনী খুলেছে ফুলের পসরা পথের ধারে,
গোয়ালিনী যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হল মনে,
উঠলেন জল ছেড়ে।
চললেন বনঝাউ ভেঙে
গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।

শিষ্য শুধালো, 'কোথায় যাও প্রভু,
ও দিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।'
গুরু বললেন, 'চলেছি স্নানসমাপনের পথে।'

বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।
গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন গুরু।
সেখানে তেঁতুল গাছের ঘন ছায়া,
শাখায় শাখায় বানরদলের লাফালাফি।
গলি পৌঁছয় ভাজন মুচির ঘরে।
পশুর চামড়ার গন্ধ আসছে দূর থেকে।
আকাশে চিল উড়ছে পাক দিয়ে,
রোগা কুকুর হাড় চিবোচ্ছে পথের পাশে।
শিষ্য বললে, 'রাম! রাম!'
ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে।

ভাজন লুটিয়ে পড়ে গুরুকে প্রণাম করলে
সাবধানে।
গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।
ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল,
'কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।'
রামানন্দ বললেন,
'স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সেই বিশ্বপাবনধারা।
ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল।
বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি,
তবু আজ দেখা হল না কেন।
এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে—
মন্দিরে আর হবে না যেতে।'

নেত্রকোণা [বরানগর]
১৫ ফাল্গুন ১৩৩৯

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত-পত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।
একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ
দেউলের আঙিনা পূজারিদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে নতুন পূজাবিধির আড়ালে—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।

কিরাত থাকে সমাজের বাইরে,
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত, আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী করে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়—
কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয়, অস্ত্র তার নিয়েছে কেড়ে,
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জিত,
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে যায় দেখা,
চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে।

কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।
মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উঠেছে ধ্বজা।
পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড়;
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল মালা ধূপ বাতি, ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি,
কথক পড়ছে রামায়ণকথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে;
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায়,
সম্মুখে বেজে চলেছে শিঙা।

কিংখাবে ঢাকা পাল্কিতে ধনীঘরের গৃহিণী,
আগে পিছে কিংকরের দল ।
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়—
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা ;
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়—
ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপতণ্ডুল ।

থেকে থেকে আকাশে উঠছে চীৎকারধ্বনি
'জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়' ।
কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা,
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে ।
তাঁর আগমন-পথের দুই ধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব ।
আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করছে গন্ধবারি ।
শুক্লত্রয়োদশীর রাত ।
মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেছে ।
আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা—
যেন মূর্ছার ঘোর লাগল ।
বাতাস রুদ্ধ—
ধোঁয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট ।
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে,
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে
কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে ।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে—
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু-গুরু-গুরু-গুরু ।
মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে ।
হাতি বাঁধা ছিল,
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে
ছুটল চার দিকে
যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ ।
তুফান উঠল মাটিতে—
ছুটল উট মহিষ গোরু ছাগল ভেড়া
ঊর্ধ্বশ্বাসে পালে পালে ।
হাজার হাজার দিশাহারা লোক
আর্তস্বরে ছুটে বেড়ায়—
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ'লে ।

মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁয়া, ওঠে গরম জল—
ভীম-সরোবরের দিঘি বালির নীচে গেল শুষে ।
মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুলতে দুলতে
বাজতে লাগল ঢং ঢং ।
আচমকা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে ।
পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেছে পশ্চিমের দিকে ।
আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে ।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্‌বিদিক যখন শোকার্ত
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়ালো,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে ।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত পণ্ডিত এল ।
দেখলে বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ ।
দেবতার বেদীর উপরের ছাদ পড়েছে ভেঙে ।
পণ্ডিত বললে সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই,
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে ।
রাজা বললেন, 'সংস্কার করো ।'
মন্ত্রী বললেন, 'ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে,
কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা ।'
কিরাতদলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে ।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত,
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ ।
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দফুল,
প্রণাম করলে স্পর্শ বাঁচিয়ে ।
রাজা বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয়-সংস্কার হয় না ।'
'আমাদের 'পরে দেবতার ওই কৃপা'
এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে ।
নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,
দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে । পারবে ?'
মাধব বললে, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী ।
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না ।'

বাহিরে কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা ।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না—
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে ।

মন্ত্রী এসে বলে, 'ত্বরা করো, ত্বরা করো—
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।'
মাধব জোড়হাতে বলে, 'যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ।'

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধমাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বললে, 'একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্বে।'
মাধব প্রণাম করে বললে, 'আমি কে যে উত্তর দেব।
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে,
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।'

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোল—
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য অস্ত গেল। পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,
'যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।'
প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের পূর্ণ আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে,
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

অস্থানে

একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী
দশটি বছর কাটিয়েছে গায়ে গায়ে,
রোজ সকালে সূর্য-আলোর ভোজে
পাতাগুলি মেলে বলেছে
'এই তো এসেছি'।
অধিকারের দ্বন্দ্ব ছিল ডালে ডালে দুই শরিকে,
তবু তাদের প্রাণের আনন্দে
রেষারেষির দাগ পড়ে নি কিছু।

কখন যে কোন্ কুলগ্নে ওই
সংশয়হীন অবোধ চামেলি
কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল
বিজ্‌লিবাতির লোহার তারে তারে,
বুঝতে পারে নি যে ওরা জাত আলাদা।
শ্রাবণ মাসের অবসানে আকাশকোণে
সাদা মেঘের গুচ্ছগুলি
নেমে নেমে পড়েছিল শালের বনে,
সেই সময়ে সোনায় রাঙা স্বচ্ছ সকালে
চামেলি মেতেছিল অজস্র ফুলের গৌরবে।
কোথাও কিছু বিরোধ ছিল না,
মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।
ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে।
বেলা হত আলস্যে শিথিল।

সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য-ডোবার সময়,
মেঘে মেঘে লাগল যখন নানা রঙের খেয়াল,
সেই বেলাতে কখন এল
বিজ্‌লিবাতির অনুচরের দল।
চোখ রাঙালো চামেলিটার স্পর্ধা দেখে—
শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজনের 'পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়ালো কেন।
তীক্ষ্ণ কুটিল আঁক্‌শি দিয়ে
টেনে টেনে ছিনিয়ে ছিঁড়ে নিল
কচি কচি ডালগুলি সব ফুলে-ভরা।
এত দিনে বুঝল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজ্‌লিবাতির তারগুলো ওই জাত আলাদা।

২৩ ভাদ্র ১৩৩৯

ঘরছাড়া

এল সে জর্মনির থেকে
এই অচেনার মাঝখানে,
ঝড়ের মুখে নৌকো নোঙর-ছেঁড়া
ঠেকল এসে দেশান্তরে।
পকেটে নেই টাকা,
উদ্‌বেগ নেই মনে,
দিন চলে যায় দিনের কাজে
অল্পস্বল্প নিয়ে।
যেমন-তেমন থাকে
অন্য দেশের সহজ চালে।
নেই ন্যূনতা, গুমর কিছুই নেই—
মাথা-উঁচু
দ্রুত পায়ের চাল।
একটুও নেই অকিঞ্চনের অবসাদ।
দিনের প্রতিমুহূর্তকে
জয় করে সে আপন জোরে,
পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যায় সে চলে,
চায় না পিছন ফিরে—
রাখে না তার এক কণাও বাকি।
খেলাধুলা হাসিগল্প যা হয় যেখানে
তারি মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ।
কোথাও কিছু ঠেকে না তার
একটুকুও অনভ্যাসের বাধা।
একলা বটে, তবুও তো
একলা সে নয়।
প্রবাসে তার দিনগুলো সব
হুহু করে কাটিয়ে দিচ্ছে হালকা মনে।
ওকে দেখে অবাক হয়ে থাকি,
সব মানুষের মধ্যে মানুষ
অভয় অসংকোচ—
তার বাড়া ওর নেই তো পরিচয়।

দেশের মানুষ এসেছে তার আরেক জনা।
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে
যা-খুশি তাই ছবি এঁকে এঁকে
যেখানে তার খুশি।
সে ছবি কেউ দেখে কিংবা নাই দেখে
ভালো বলে নাই বলে—
খেয়াল কিছুই নেই।

দুইজনেতে পাশাপাশি
কাঁকর-ঢালা পথ দিয়ে ওই
যাচ্ছে চলে
দুই টুকরো শরৎকালের মেঘ।
নয় ওরা তো শিকড়-বাঁধা গাছের মতো,
ওরা মানুষ—
ছুটি ওদের সকল দেশে সকল কালে,
কর্ম ওদের সবখানে,
নিবাস ওদের সব মানুষের মাঝে।
মন যে ওদের স্রোতের মতো
সব-কিছুরেই ভাসিয়ে চলে—
কোনোখানেই আটকা পড়ে না সে।
সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে,
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত-সব ঘরছাড়াদের দল।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ছুটির আয়োজন

কাছে এল পূজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শির্‌শিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।

মাস্টারমশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা,
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়,
ছবি দেখে আপন মনে—
কমলদিঘির ফাটল-ধরা ঘাট
আর ভঞ্জদের পাঁচিল-ঘেঁষা
আতাগাছের ফলে-ভরা ডাল।
আর দেখে সে মনে মনে তিসির খেতে
গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে
রাস্তা গেছে এঁকেবেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে।

কলেজের ইকনমিক্‌স্‌-ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র—
হালের লেখা কোন্‌ উপন্যাস কিনতে হবে,
ধারে মিলবে কোন্‌ দোকানে
'মনে-রেখো' পাড়ের শাড়ি,
সোনায় জড়ানো শাঁখা,
দিল্লির-কাজ-করা লাল মখমলের চটি।
আর চাই রেশমে-বাঁধাই-করা
অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না।

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবুপাহাড় না মাদুরা
না ড্যাল্‌হৌসি কিংবা পুরী
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।

আর দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা-ছটা ক'রে।
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন ক'রে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

মৃত্যু

মরণের ছবি মনে আনি।
ভেবে দেখি শেষ দিন ঠেকেছে শেষের শীর্ণক্ষণে।
আছে ব'লে যত কিছু
রয়েছে দেশে কালে—
যত বস্তু, যত জীব, যত ইচ্ছা, যত চেষ্টা,
যত আশানৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাত
দেশে দেশে ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে,
যত গ্রহনক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকালসমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে,

সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এ ধারে।
এক পা তখনো আছে সে প্রান্তসীমায়,
অন্য পা আমার
বাড়িয়েছি রেখার ও ধারে,
সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
লয়ে দিনরজনীর অন্তহীন অক্ষমালা
আলো-অন্ধকারে-গাঁথা।
অসীমের অসংখ্য যা-কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
একি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে।
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিলতরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত,
যদি হত মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৯

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে —
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে—
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।

খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন ;
বুঝলেন শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়—
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদীর সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে—
বলছে 'মারো মারো'।
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।'

[শ্রাবণ ১৩৩৯]

৯

শিশুতীর্থ

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে—
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি।
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ;
তারা অমিতাচারী দপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপঙ্‌ক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল।
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ।
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।

এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত ;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য ।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো ।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে ;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে ।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে ;
বলে, হায়, হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল ।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে ;
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না ।

২

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত ।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্ বলে জেনো ।
ওরা শোনে না, বলে পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত ;
বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক ।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ ক'রে বলে, ভাই, তুমি কোথায় ।
উত্তরে শুনতে পায়, আমি তোমার পাশেই ।
অন্ধকারে দেখতে পায় না, তর্ক করে— এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা ।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে ।

৩

মেঘ সরে গেল ।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায়-শাখায় ।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে ।
কিসের সময় ?
যাত্রার ।
ওরা বসে ভাবলে ।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে ।

ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বললে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে ;
সবাই বলে উঠল, ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।

৪

যাত্রীরা চারি দিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে।
রাজা চলল, অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে ; তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী—
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা !
স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না— কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শান্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

৫

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে-যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়— পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

৬

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়—
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে ; পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছে, চুপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।

রাত্রি পোহাতে চায় না ।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে ।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায় এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হল—
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে ।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ ;
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট ।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে ।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না ;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা ।
পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে ।
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে ।
সবাই নিরুত্তর ও নতশির ।
বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয় ।
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে
'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়' ।

৮

তরুণের দল ডাক দিল, চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে ।
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর ।
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক ;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ ।
তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি ।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে—
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম ।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল ;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ ;

চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।
রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।
সে বলে, না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।
তরুণ বলে, থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, সাথি, অগ্রসর হও।
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে— আর বিলম্ব নেই।

৯

প্রত্যূষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ্ জ্যোতিষী বললে, বন্ধু, আমরা এসেছি।
পথের দুই ধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান—
কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটন-মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বললে, নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।
এই বলে ভক্তিনম্রশিরে পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিতমিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে—
মাতা, দ্বার খোলো।

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক্ হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী— মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে—
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়;
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে— জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

[শ্রাবণ ১৩৩৮]

শাপমোচন

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।
অনবধানে তার মৃদুঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।
স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,
অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল
গান্ধাররাজগৃহে।
মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল;
বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না,
একই লোকে আমাদের গতি হোক,
একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।'
শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন।
ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, যাও মর্তে—
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন-অপরাধের ক্ষয়।'
মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা।

একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি।
সেই ছবি তার দিনের চিন্তা, তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে
আপন ভূমিকা রচনা করলে।
গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে।
বিবাহপ্রস্তাব শুনে রাজা বললে,
'আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।'

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।
রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায়
এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্কবিহারিণী বীণা।
স্তব্ধসংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।
যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।

নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।
কমলিকা বলে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'
রাজা বলে, 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।'
অন্ধকারে বীণা বাজে।
অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।
সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে
তার মর্তদেহে।
নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে—
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে
যখন শুকতারা পূর্বগগনে,
কমলিকা তার সুগন্ধি এলো চুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে;
বললে, 'আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।'
রাজা বললে, 'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।'
মহিষী বললে, 'প্রিয়প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে।
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।'
অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।
রাজা বললে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি।
নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।
প্রাসাদশিখর থেকে চেয়ে দেখো।'
মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল;
বললে, 'চিনব কী করে।'

র'জা বললে, 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো,
সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন।
মহিষী বললে, 'দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে
বসন্তবাতাসের মত্ততা।
সকলেই সুন্দর,
যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ।
কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর।
ওখানে কী গুণে সে পেল প্রবেশের অধিকার।'
রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।
কিছু পরে বললে, 'ওই কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু,
মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন রূপ ধরে
তখনই তো শ্যামলসুন্দরের আবির্ভাব।
প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।'
'না মহারাজ, না' ব'লে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।
রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল;
বললে, 'যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত
তাকে ঘৃণা ক'রে মনকে কেন পাথর করলে।'
'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে'
এই ব'লে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল।
রাজা তার হাত ধরলে;
বললে, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে—
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।'
ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে,
'অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝি নে।
ওই শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক,
অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি।
আজ সূর্যোদয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হবে
আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।'
রাজা বললে, 'তাই হোক, ভীরুতা যাক কেটে।'
দেখা হল।
ট'লে উঠল যুগলের সংসার।
'কী অন্যায়— কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা'!
বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

গেল বহুদূরে
বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে।
কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।
রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।

স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে,
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।
রাতের পরে রাত গেল।
অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়—
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার-মূর্তি।

এ কী হল রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে!
মাটির প্রদীপ-শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।
রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়,
তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।
বীণায় বাজতে থাকে কেদারা, বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।
রাজমহিষী বিছানার 'পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।
মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালো।
নীচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই ঊর্মি-দোলা।
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত।
ঝিল্লিঝংকৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।
অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে।
সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।
কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না।
এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

গেল আরো দুই রাত।
অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসছে এই জানলারই কাছে।
সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মিড়।
কমলিকা আপন মনে নীরবে বলছে,
'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।'
কিন্তু যাবে কার কাছে।
চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো?
কেমন করে হবে।
দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে

পাঠিয়ে দিলে সাত-সমুদ্র-পারে রূপকথার দেশে।
সেখানকার পথ কোন্ দিকে।

আরো এক রাত যায়।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর।
পথ-না-জানা যত-সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।
সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ওই যে বাজে বীণায় কানাড়া।
রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করি নে।'
পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে
সে গেল পুরাতন অশথ গাছের তলায়।
বীণা থামল।
মহিষী থমকে দাঁড়ালো।
রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।'
তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরু-গুরু ধ্বনির মতো।
'আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হল।'
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে,
ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।'

পৌষ ১৩৩৮

ছুটি

দাও-না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন্‌খানে।
যেখানে ওই শিরীষ-বনের গন্ধপথে
মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা।
যেখানেতে মেঘ-ভাসা ওই সুদূরতা,
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে
সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে,
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে—
শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুন্‌গুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর বাদলরাতে।
যেখানে এই মন
গোরুচরা মাঠের মধ্যে স্তব্ধ বটের মতো
গাঁয়ে-চলা পথের পাশে।

কেউ বা এসে প্রহর-খানেক বসে তলায়,
পা ছড়িয়ে কেউ বা বাজায় বাঁশি,
নববধূর পাল্‌কিখানা নামিয়ে রাখে
ক্লান্ত দুই-পহরে ;
কৃষ্ণ-একাদশীর রাতে
ছায়ার সঙ্গে ঝিল্লিরবে জড়িয়ে পড়ে
চাঁদের শীর্ণ আলো ।
যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায় দিনে রাতে—
ধরে-রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে রাখার নাই তো অভিমান ।
রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে, তার দেয় না ঠিকানা ।

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

গানের বাসা

তোমরা দুটি পাখি,
মিলন-বেলায় গান কেন আজ
মুখে মুখে নীরব হল ।
আতশবাজির বক্ষ থেকে
চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ সব ছিটকে পড়ে—
তেমনি তোমাদের
বিরহতাপ ছড়িয়ে গিয়েছিল
সারারাত্রি সুরে সুরে বনের থেকে বনে ।
গানের মূর্তি নিয়ে তারা পড়ল না তো ধরা—
বাতাস তাদের মিলিয়ে দিল
দিগন্তরের অরণ্যচ্ছায়ায় ।

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে ;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে ।
বিশ্বজনের সবার জন্যে সে গান থাকে
সব প্রেমিকের প্রাণের আসন মেলে দিয়ে ।
বিপুল হয়ে উঠেছে সে
দেশে দেশে কালে কালে ।
মাটির মধ্যখানে থেকে
মাটিকে সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে তোলে মাথা
কল্পস্বর্গলোকে ।

সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তোমাদের
উধাও পাখার নাচের তালে।
দুরু দুরু কোমল বুকের প্রেমের বাসা
আপনি আছে বাঁধা
পাখির ভুবনে।
প্রাণের রসের শ্যামল মধুর,
মুখরিত গুঞ্জনে মর্মরে,
ঝলকিত চিকন পাতার দোলনে কম্পনে,
পুলকিত ফুলের উল্লাসে,
নব নব ঋতুর মায়া-তুলি
সাজায় তারে নবীন রঙে—
মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া
যেন দুটি প্রজাপতির মতো
সেই নিভৃতে অনায়াসে হালকা পাখায়
আলোছায়ার সঙ্গে বেড়ায় খেলে।

আমরা কেবল বানিয়ে তুলি
আপন ব্যথার রঙে রসে
ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই,
বেড়া দিয়ে আগলে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা—
সেই আমাদের গান।

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

পয়লা আশ্বিন

হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের 'পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

পুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে—
বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।

কত যুগের কত দেশের বিশ্ববিজয়ী
মৃত্যুপথে ছুটেছিল
অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে।
তাদেরই সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশির-ধোওয়া রোদে।
বাজল রে আজ বাজল রে তার
ঘর-ছাড়ানো ডাক
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ধনের বোঝা, খ্যাতির বোঝা, দুর্ভাবনার বোঝা
ধুলোয় ফেলে দিয়ে
নিরুদ্‌বেগে চলেছিল জটিল সংকটে।
ললাট তাদের লক্ষ্য ক'রে
পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল
দুর্জনেরা মলিন হাতে;
নেমেছিল উল্কা আকাশ থেকে,
পায়ের তলায় নীরস নিঠুর পথ
তুলেছিল গুপ্ত ক্ষুদ্র কুটিল কাঁটা।
পায় নি আরাম, পায় নি বিরাম,
চায় নি পিছন ফিরে;
তাদেরই সেই শুভ্রকেতনগুলি
ওই উড়েছে শরৎপ্রাতের মেঘে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন—
গান জাগিয়ে চলো সমুখ-পথে
যেখানে ওই কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপ্‌নাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও—
লালসাকে দলো পায়ের তলায়।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎ-রৌদ্রালোকে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

১ আশ্বিন ১৩৩৯

নাটক ও প্রহসন

বসন্ত

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম

স্নেহভাজনেষু

১০ ফাল্গুন

১৩২৯

বসন্ত

রাজা। কবি!

কবি। কী মহারাজ।

রাজা। আমি মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে এসেছি।

কবি। সৎকার্য করেছেন। কিন্তু মহারাজের এমন সুমতি হল কেন।

রাজা। বৎসর শেষ হয়ে এল, রাজকোষ শূন্যপ্রায়। মন্ত্রণাসভায় বসলেই সচিবরা আসেন তাঁদের নিজ বিভাগের জন্যে টাকা দাবি করতে। কাজেই পলায়ন ছাড়া গতি নেই।

কবি। এতে উপকার হবে।

রাজা। কার উপকার হবে।

কবি। রাজ্যের।

রাজা। সে কি কথা!

কবি। রাজা মাঝে-মাঝে সরে দাঁড়ালে প্রজারা রাজত্ব করবার অবকাশ পায়।

রাজা। তার অর্থ কী হল।

কবি। রাজার অর্থ যখন শূন্যে এসে ঠেকে প্রজা তখন নিজের অর্থ খুঁজে বের করে, তাতেই তার রক্ষা।

রাজা। কবি, তোমার কথাগুলো বাঁকা ঠেকছে। মন্ত্রণাসভা ছেড়ে এসেছি, আবার তোমার সঙ্গও ছাড়তে হবে নাকি।

কবি। না, তার দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েছেন।

রাজা। তোমার দলে?

কবি। হাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।

গান

আমরা বাস্তুছাড়ার দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল।
আমরা করছি টলমল।
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।

রাজা। তুমি আমাকে দলে টানতে চাও? অতদূর এগোতে পারব না। আমাকে মন্ত্রীরা মিলে সভাছাড়া করেছে, তাই বলে কি কবির দলে ভিড়ে শেষে—

কবি। শুধু আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।

রাজা। রাজসঙ্গী? কে বলো তো।

কবি। ঋতুরাজ।

রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দুঃখে।

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।

রাজা। কবি, তোমার হেঁয়ালি রাখো ; আমার অধ্যাপকের দল তোমার হেঁয়ালি শুনে রাগ করে, বলে ওগুলোর কোনো অর্থ নেই। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।

রাজা। বেশ বেশ। বুঝতে পারব তো ?

কবি। বোঝাবার চেষ্টা করি নি।

রাজা। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু না-বোঝাবার চেষ্টা কর নি তো ?

কবি। না মহারাজ, এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না-বোঝার কোনো বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুরু হোক। কিন্তু ও দিকে মন্ত্রণাসভার কাজ চলছে, আওয়াজ শুনে মন্ত্রীরা তো—

কবি। হাঁ মহারাজ, তাঁরাসুদ্ধ হয়তো পলাতকার দলে যোগ দিতে পারেন। তাতে দোষ কী হয়েছে। ফাল্গুন-যে পড়েছে।

রাজা। সর্বনাশ ! এখানে এসে যদি আবার—

কবি। ভয় নেই। শূন্যকোষের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার ভারই মন্ত্রীদের বটে, কিন্তু শূন্যকোষের কথা ভুলিয়ে দেবার ভারই তো কবির উপরে।

রাজা। তা হলে ভালো কথা। তা হলে আর দেরি নয়। ভোলবার অত্যন্ত দরকার হয়েছে। দলবল সব প্রস্তুত তো ? আমাদের নাট্যাচার্য দিনপতি—

কবি। ঐ তো তিনি ভারতীর কমলবনের মধুগন্ধে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন।

রাজা। দেখে মনে হচ্ছে বটে শূন্য রাজকোষের কথায় ওঁর কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

কবি। উনি আমাদের উৎসবের বন্ধু, দুর্ভিক্ষের দিনে ওঁকে না হলে চলে না। কারণ উনি ক্ষুধার কথা সুধা দিয়ে ভোলান।

রাজা। সাধু ! আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বিশেষত আমার অর্থসচিবের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছেন। তাঁর মনে যদি পুলক-সঞ্চার করতে পারেন তা হলে—

কবি। ফস্ করে বেশি আশা দিয়ে ফেলবেন না— রাজকোষের অবস্থা যেরকম—

রাজা। হাঁ হাঁ, বটে বটে।— আচ্ছা, তবে তোমার পালা আরম্ভ হবে কী দিয়ে।

কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তুত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক পড়েছে।

রাজা। বলছে কী।

কবি। বলছে, সব দিয়ে ফেলতে হবে।

রাজা। নিজেকে একেবারে শূন্য করে ? সর্বনাশ !

কবি। না, নিজেকে পূর্ণ করে। নইলে দেওয়া তো ফাঁকি দেওয়া।

রাজা। মানে কী হল।

কবি। যে-দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।

রাজা। তা হলে ধরণীর সঙ্গে ধরণীপতির ঐখানে অমিল দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দান করতে গিয়ে প্রায়ই বিপদে পড়ি— অর্থসচিবের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হতে থাকে।

কবি। যে-দান সত্য তার দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।

রাজা। ও আবার কী। এটা উপদেশের মতো শোনাচ্ছে, কবি।

কবি। তা হলে আর দেরি নয়, গান শুরু হোক।

বসন্তের পরিচরগণ

সব দিবি কে, সব দিবি পায়,
আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,
আয় আয় আয়।
আসবে-যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।
আয় আয় আয়।
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,
হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা,
হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে
ধনরতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে-যে দায়।
হায় হায় হায়।

রাজা। দাবি তো কম নয়।
কবি। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয়; ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়।
রাজা। তা এরা সব রাজী আছে?
কবি। ওদের মুখেই শুনে নিন।

বনভূমি

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেব ভুঁই।
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে
বকুল বেলা জুঁই।
দখিনসাগর পার হয়ে-যে
এলে পথিক তুমি।
আমার সকল দেব অতিথিরে
আমি বনভূমি।
আমার কুলায়ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই।

আম্রকুঞ্জ

ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।
বসন্তগান পাখিরা গায়,
বাতাসে তার সুর ঝরে যায়,
মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারই সেই রাগিণী রে।
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে
বাজবে সেদিন তালে তালে,
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধুযামিনীরে।'

রাজা। ভাবখানা বুঝেছি কবি।
কবি। কী বুঝলেন।
রাজা। 'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে 'ফল চাই নে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।
কবি। মহারাজ, এটা যেন উপদেশের মতো শোনাচ্ছে।
রাজা। ঠিক কথা। তা হলে গান ধরো।

করবী

যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে।
(জানি নে জানি নে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
ক'বে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানি নে জানি নে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার।
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানি নে জানি নে)

রাজা। ও দিকে ও কিসের গোলমাল শুনতে পাই।
কবি। দখিনহাওয়া যে এল।

রাজা। তা হয়েছে কী।

কবি। বাইরের বেণুবন উতলা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধূর মতো শঙ্কিত।

বেণুবন

দখিনহাওয়া, জাগো জাগো
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায়
নীরব-যে হায় কত-না গান।
(জাগো জাগো)

দীপশিখা

ধীরে ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে,
শান্ত হও গো, শান্ত হও।

বেণুবন

পথের ধারে আমার-কারা
ওগো পথিক বাঁধনহারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।

দীপশিখা

আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে-কানে,
মৃদু মৃদু কও।

বেণুবন

গানের পাখা যখন খুলি
বাধাবেদন তখন ভুলি।

দীপশিখা

তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেয়-যে আনি।

বেণুবন

যখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,

বন্ধভাঙার ছন্দে আমার
মৌন কাঁদন হয় অবসান।
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।

দীপশিখা

আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও।
ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।

ঋতুরাজের পরিচরবর্গ

সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে!
(ও চাঁপা, ও করবী)
কারে তুই দেখতে পেলি
আকাশ-মাঝে
জানি না যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, করবী)
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না যে।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান যে তোর
মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে।
ফুলে ফুলে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কে সাজালে রঙিন সাজে
জানি না যে।

কবি। ঋতুরাজের দূতেরা ভাবছে কেউ খবর পায় নি— পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।

মাধবী

সে কি ভাবে গোপন রবে
লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা,
সে যে সৃষ্টিছাড়া।

হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
'ওই এল যে', 'ওই এল যে'
পরান দিল সাড়া।
এই তো আমার আপনারই এই
ফুল ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে
চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া।

রাজা। কবি, ঐ তো পূর্ণচন্দ্র উঠেছে দেখছি।

কবি। দখিনহাওয়ায় যেন কোন্ দেবতার স্বপ্ন ভেসে এল।

রাজা। শুধু দখিনহাওয়ায় ওকে ভাসালে চলবে না কবি, তোমার গানের সুরও চাই। জগতে কেবল যে দেবতাই আছেন তা তো নয়।

শালবীথিকা

ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ওই চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুলছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ।
ঘুমের আঁচল আকুল হল
কী উল্লাসের ভরে।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল
দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগলামিরে
বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ।

বকুল

ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।

যে-গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজল সে-সুর
আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিনহাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্মরিত মর্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে।

রাজা। সব তো বুঝলুম। আকাশ থেকে চাঁদ দেখছি পৃথিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে। কিন্তু ওঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কষে দোলা না দিতে পারলে তো জবাব দেওয়া হয় না তার কী করলে।

কবি। তার তো ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ। আমাদের নদীর ঢেউ আছে তো, সে দিকে চেয়ে দেখো-না। চাঁদ টলোমলো।

নদী

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা।
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগালো
ওই চাহনি তুফানতোলা।
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমলকানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা।

রাজা। এবার ঐ কে আসে।

কবি। বলব না। চিনতে পারেন কি না দেখতে চাই।

দখিনহাওয়া

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে।
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে।

চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।

রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ঐ যে, এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ঐ জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল ; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী— তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তা হলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ঐ-যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতন-পুরাতনের মাঝখানকার নিত্য যাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে-পথেই থাকেন ?

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।

গান

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে,
পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন তো নাই—
কিছু সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই—
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে
করে টলমল।

রাজা। আর দেরি নয়, কবি। ঐ দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে। রাজকোষের কথা পাড়বার পূর্বেই ঋতুরাজের আসর জমাও।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো,
দেশে কি বিদেশে।

তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্বনেশে।

ঋতুরাজ

আমার বাস কোথা-যে জান নাকি,
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো বলো বলো পথিক,
বলো তুমি কার।

ঋতুরাজ

আমি তারই যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।

বনপথ

আজ দখিনবাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুটল বনের ঘাসে।

ঋতুরাজ

ও মোর পথের সাথি, পথে পথে
গোপনে যায় আসে।

বনপথ

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভরবে সাজি—
ফুটেছে সেই আশে।

ঋতুরাজ

এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।

বনপথ

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না-যাও ভুলে।
ওরে নাই-বা দিলে দোলা, ওরে
নাই-বা নিলে তুলে।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে একপাশে।

ঋতুরাজ

ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

রাজা। খুব জমেছে, কবি। সুরের দোলায় চাঁদকে দুলিয়েছ। ঐ দেখো-না, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ দুলছে।

কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়।

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।

রাজা। আমাদের অর্থসচিবকে চোখে পড়েছে নাকি।

কবি। বলেইছি তো, পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ওও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।

রাজা। বোধ হচ্ছে যেন এখনই উপদেশ দিতে শুরু করবে।

কবি। আচ্ছা তা হলে আবার গান শুরু হোক।

ঋতুরাজ

এখন আমার সময় হল,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা,
আলোছায়ায় হল খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।

ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরানবঁধুর,
সব আবরণ তোলো তোলো।

মাধবী

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে,
তোমায় ডাকব না তো ফিরে।
করব তোমায় কী সম্ভাষণ।
কোথায় তোমার পাতব আসন
পাতাঝরা কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে।
তুমি আপ্‌নি যখন আসো তখন
আপ্‌নি কর ঠাঁই,
আপ্‌নি কুসুম ফোটাও, মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও, চলে যাও,
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রঙ মুছে যায়,
তাকাই অশ্রুনীরে।

ঋতুরাজ

এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে
ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে।
সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে,
সুরের খেলা ডুবসাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা
তাহারে মন জানে গো, মন জানে।
এবেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে।

ঝুমকোলতা

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো।

চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো— গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায় হায় রে,
মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো।

আকন্দ

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো,
(ও চাঁপা, ও করবী)
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।
যাবার পথে আকাশতলে
মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর।
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে
আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর থর।

ধুতুরা

আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে যে-নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণবাঁচন,
হাসিকাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

জবা

ভয় করব না রে
বিদায়বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে-যে নবীন রবে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে।

নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
এ মোর সাধনা রে।

সকলে

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ওই তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রাজা। আমার মন্ত্রণাসভার দশা করলে কী। সব মন্ত্রী-যে এখানে এসে জুটেছে। ঐ দেখো, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ-যে নাচতে শুরু করে দিলে। বড়ো লঘু হয়ে পড়ছেন না?

কবি। ওঁর-যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারী থাকলে গৌরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।

রাজা। রাজগৌরব?

কবি। সেও টিকল না। তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।

ভাঙনধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা কবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রক্তকরবী

নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যমূলক। এই ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে-সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর করে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এর একটি ডাকনাম আছে— মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।

এ ছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নামগ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্নগ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে-বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কিরকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

রক্তকরবী

এই নাট্যব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে।

নন্দিনী ও কিশোর, সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক

কিশোর। নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!

নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাই নে।

কিশোর। শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।

নন্দিনী। যা যা, এখনই কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে!

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী। ওরে কিশোর, জানতে পারলে-যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর। তুমি-যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর। অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী। কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার-যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী। কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে।

কিশোর। কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।

নন্দিনী। তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্ তো, কিশোর।

কিশোর। এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।

[প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী। কী অধ্যাপক।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন নাহয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ির ধন— সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ঐ একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী। তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে-যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী। এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরি। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী। না না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক। সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী। আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক। জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে? মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন।

অধ্যাপক। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক। একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী। ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা হলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক। দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনীনদীর মতো। ঐ নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক। জানলে কী করে।

নন্দিনী। হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক। সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে।

নন্দিনী। যে-পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক। তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে, আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না?

নন্দিনী। ভয় করবে কেন!

অধ্যাপক। গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ঐ গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে; তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ঐ-যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে?

নন্দিনী। কেন, কী করবে তুমি।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী। আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। এই রক্ত-আভায় একটা ভয় লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী। আমার মধ্যে ভয়?

অধ্যাপক। সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়?

নন্দিনী। রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী। এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।

[অধ্যাপকের প্রস্থান

সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।— তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে।

নন্দিনী। আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী।

গোকুল। না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

নন্দিনী। অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল। একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলেছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ঐ কী ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরি।

গোকুল। ওর মানে কী।

নন্দিনী। ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল। আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী।

নন্দিনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন।

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।'

[প্রস্থান

নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী। কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে। নিজে পরো।

নন্দিনী। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে। আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী। সেই চূড়ার বুকেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে। আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী। দূর থেকে ঐ গান শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কিসের গান।

নন্দিনী। পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে ?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায় ।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই ।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল—
ঘরেতে আজ কে রবে গো । খোলো দুয়ার খোলো ।

নেপথ্যে । আমি মাঠে যাব ? কোন্‌ কাজে লাগব ।

নন্দিনী । মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ ।

নেপথ্যে । সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত । সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে । যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই ।

নন্দিনী । অদ্ভুত তোমার শক্তি । যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম । তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত । আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না ?

নেপথ্যে । কেন, ভয় কিসের ।

নন্দিনী । পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয় । কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস । দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিংবা সন্দেহ করছে, কিংবা ভয় পাচ্ছে ?

নেপথ্যে । অভিসম্পাত ?

নন্দিনী । হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত ।

নেপথ্যে । শাপের কথা জানি নে । এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি । আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও, নন্দিন ?

নন্দিনী । ভারি খুশি লাগে । তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক ।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায় ।

নেপথ্যে । নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন ? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে । আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই ।

নন্দিনী । ও কী বলছ তুমি ।

নেপথ্যে । তোমার ঐ রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন করে পরতে পারি নে কেন । সামান্য পাপড়ি-ক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে । তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— কোমল বলেই কঠিন । আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো ।

নন্দিনী । সে আর-এক দিন বলব । আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই ।

নেপথ্যে। না না, যেয়ো না, বলে যাও ; আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো— দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে। আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী। সে নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে। বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী। সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না।

নন্দিনী। হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে। রঞ্জনের মতোই ?

নন্দিনী। ঘুরে ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে। কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী। জাদু বলছ কাকে।

নেপথ্যে। বুঝিয়ে বলব ? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি ; সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী। তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

নেপথ্যে। আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না— শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই ; রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী। তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট করছ বুঝতে পারি নে।

নেপথ্যে। বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী। তুমি-যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে। নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি— সে এর উলটো।

নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারি

নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।

নেপথ্যে। নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী। তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। আচ্ছা যেয়ো— কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী। না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে। কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি, নন্দিন।

নন্দিনী। তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ।

নেপথ্যে। আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয় নি।

নন্দিনী। আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে। তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে। নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব।

নন্দিনী। আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে। না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী। ছুটি কী করে মধুতে ভরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে। সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে যাও— নইলে বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে— কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না।

[প্রস্থান

ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা। ওকি কথা। সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল। আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেইসঙ্গে অস্ত্রপূজা।

চন্দ্রা। বল কী। ওরা কি ঠাকুরদেবতা মানে !

ফাগুলাল। দেখ নি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে ?

চন্দ্রা। তা ছুটি পেয়েছ বলেই মদ ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল। বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা। কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

ফাগুলাল। ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি ?

চন্দ্রা। কেন বন্ধ।

ফাগুলাল। আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনফা নেই।

চন্দ্রা। আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ ? ফালতো কিছুই নেই ?

ফাগুলাল। আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার ; যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় খুরলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন-কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে। ঐ-যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।

ফাগুলাল। তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা। ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল। তাতে আর আশ্চর্যটা কী।

চন্দ্রা। না, আশ্চর্য কিছুই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে। মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল। বিশুর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, শুনে যাও, শুনে যাও। যাও কোথায়। গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে !
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।

চন্দ্রা। তবে তো আশা নেই, আমরা-যে বড়ো কাছে।

বিশু। আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে।

চন্দ্রা। তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু। বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি।

চন্দ্রা। তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল। দেখো বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।

বিশু। কেন, কী করেছে।

গোকুল। কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন। ওর রকমসকম কিছুই বুঝি নে।

চন্দ্রা। বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা, ও-যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল। আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশু। যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মুর্খু, কিন্তু এখানকার সর্দার পর্যন্ত ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তা জান ?

বিশু। দেখো দেখো চন্দ্রা, সর্দারের দুচক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তা হলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠবে।— আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সত্যি কথা বলি দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল। বিশুভাই, ঐ মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেছে সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝতে বেশি দেরি হবে না, বলে রাখলুম।

ফাগুলাল। বিশুভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু। স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চার দিকেই, এমন-কি, তোমাদের ঐ চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে।

চন্দ্রা। তাই বৈকি। তোমাদের মতো জন্মমাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েছেন।

বিশু। এক দিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক ; তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া, রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে, বলছে, ছুটি ছুটি।

চন্দ্রা। এইগুলোকে মদ বলে নাকি।

বিশু। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে।

চন্দ্রা। এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু। সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে,

তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
লুপ্তিনেশার চরম সাথি,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক্-ভোলাবার ঘোরে !

চন্দ্রা। যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু। হয় নি তো কী। তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা। কখ্‌খনো না।

বিশু। আমি বলছি 'হাঁ'। ঐ-যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরও চার ঘণ্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, তা চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু। সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল। আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি তো একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোওয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মুর্খুদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন।

চন্দ্রা। এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াইয়ের কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল। অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু। কী বলো দেখি।

ফাগুলাল। আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু। সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন।

ফাগুলাল। এও জানি এ কাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা। এমন আরামের কাজেও টিকতে পারলে না, বেয়াই ?

বিশু। আরামের কাজ ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা ! বললুম, 'দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সর্দার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই-বা কেমন করে। তবু চেষ্টা দেখো।' চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাত এই যে, সর্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশি। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল। দুঃখ কী, বিশুদাদা। আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশু। প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই, সোনাব্যাঙ যতই মক্‌মক্ শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়াসাপের।

চন্দ্রা। কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে ?

বিশু। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর দুদিন, দুদিনের পর তিনদিন ; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ফ।

বিশু। আমি ৬৯ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক্। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার।

বিশু। দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ঐ সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না?

চন্দ্রা। না।

বিশু। মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা। নবান্নের সময় এল বলে গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু। স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি?

চন্দ্রা। কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশু। হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্রা। ঐ যে সর্দার।

বিশু। তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছে।

চন্দ্রা। কেন, এমন তো কিছু বলি নি যাতে—

বিশু। বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

সর্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা। সর্দারদাদা!

সর্দার। কী নাতনি, খবর ভালো তো?

চন্দ্রা। একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দার। কেন। যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু। সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যাবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার। নাতনি, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল। না না, সে হবে না, সর্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়ো জোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশু। চুপ চুপ, ফাগুলাল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সর্দার। এই যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন— ভারি দরকার।

গোঁসাই। এই-এদের কথা বলছ ? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা ; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। এ কি কম কথা ! আশীর্বাদ করি, সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তা হলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

চন্দ্রা। আহা, কী মধুর ! বাবা, অনেকদিন এমন কথা শুনি নি। দাও দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

ফাগুলাল। এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু। ফাগুলাল খেপলে আর রক্ষে নেই, চুপ চুপ।

চন্দ্রা। ইহকাল পরকাল তুমি দু'ই খোওয়াতে বসেছ ? তোমার গতি হবে কী। এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ঐ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই। যাই বল সর্দার, কী সরলতা ! পেটে মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ ?

সর্দার। বুঝেছি বৈকি। এও বুঝেছি উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ও পাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিটখিট শুরু করছে।

গোঁসাই। কোন্ পাড়া বললে, সর্দারবাবা।

সর্দার। ঐ-যে ট-ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

গোঁসাই। বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো কটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা। প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই। ভয় নেই মা-লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

[প্রস্থান

সর্দার। ওহে ৬৯ঙ, তোমাদের ওপাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি !

বিশু। তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, একটু থামো। সর্দারদাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার। কিছুতেই না। শুনে রাখলুম, মনেও রাখব।

[প্রস্থান

চন্দ্রা। আহা, দেখলে ? সর্দার লোকটি কী সরেস ! সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু। মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা। কামড়টা এর মধ্যে কোথায় ?

বিশু। জান না, ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না ?

চন্দ্রা। কেন।

বিশু। সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা। ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই। তারা কী বলে।

বিশু। তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়ি নে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিল, তার হল কী। অনেকদিন খবর পাই নি।

বিশু। যতদিন চরের উচ্চপদে ভরতি ছিলুম, সর্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম, ওপাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা। ছি, এমন পাপও করে!

বিশু। এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, দেখো, দেখো, ঐ কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ! ঝলমল করছে! কী চমৎকার ঘোড়সওয়ার! বর্শার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। ঐ তো সর্দারনীরা ধ্বজাপূজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা। আহা, কী সাজের ধুম! কী চেহারা! আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম করে বেরতে? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু। হাঁ, আমাদেরও ঐ দশা ঘটত।

চন্দ্রা। এখন আর ফেরবার পথ নেই? একেবারে না?

বিশু। আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে। পাগলভাই!

বিশু। কী পাগলি!

ফাগুলাল। ঐ তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা। তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি, বেয়াই।

বিশু। ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা। বেয়াই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

বিশু। তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল। বিশুদাদা, পষ্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু। বলছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা। এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশি টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর কম, তবু যা হোক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

[চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। পাগলভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?

বিশু। আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে, গান শুনতে পাব। এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী। আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী। কেন।

বিশু। যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি, মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী। পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুমভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া!
এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া!

নন্দিনী। বিশুপাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া'?

বিশু। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া!

নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু। কেন, রঞ্জনের কাছে?

নন্দিনী। না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয় ; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না— তার পরে কতকাল খোঁজ পাই নি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

বিশু। গান

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী। সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে।

বিশু। একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে ; আমি নিজেকে ভুলেছিলুম।

নন্দিনী। তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে ?

বিশু। তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিকহারা নিজেকে আব খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা করে বললুম. 'যাব নিয়ে।' আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নীচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী। আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের্ করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু। তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে। আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না ?

নন্দিনী। এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু। কিরকম দেখলে ?

নন্দিনী। দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু। ঘরে ঢুকে কী দেখলে ?

নন্দিনী। ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল ; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না ?' আমি বললুম, 'একটুও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু। তোমার কেমন লাগল ?

নন্দিনী। ভালো লাগল। কিরকম বলব ? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ঐ একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু। তার পরে ও কী বললে ?

নন্দিনী। একসময় ঝেঁকে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে ? আমি কি তোমার পুঁথি।' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কিরকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কিরকম ভালোবাস।' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশে উপরকার পালকে ভালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার ?' আমি বললুম, 'এখ্‌খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্‌খনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও কাজ নষ্ট কোরো না।' মানে বুঝতে পারলুম না।

বিশু। সব কথার পষ্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার ?

বিশু। যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী। না না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কিরকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু। ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে— জানি নে সইতে পারবে কি না।

নন্দিনী। ঐ দেখো পাগলভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।

বিশু। এখানে তো চার দিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী ?— সর্দারকে কেমন লাগে ?

নন্দিনী। ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।

বিশু। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী। চুপ করো, শুনতে পাবে।

বিশু। চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি তখন কথায়-বার্তায় সর্দারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু, পাগলি, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী। না, না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ঐ-যে সর্দার এসে পড়েছে।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কিগো ৬৯ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছ-বিচার নেই ?

বিশু। এমন-কি, তোমার সঙ্গেও শুরু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দার। কী নিয়ে আলাপ চলছে ?

বিশু। তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার। বল কী, এত সাহস ? কবুল করতেও ভয় নেই ?

বিশু। সর্দার, মনে মনে তো সব জানোই। খাঁচার পাখি শলাগুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কী, না করলেই কী।

সর্দার। আদর করে না, সে জানা আছে ; কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিচ্ছে।

নন্দিনী। সর্দারজি, তুমি যে বলেছিলে, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই, কথা রাখলে না ?

সর্দার। আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী। সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হোক তোমার সর্দার, এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু। ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে! রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন।

নন্দিনী। তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার। আছে বৈকি, ঐ বুঝি গলায় দুলছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ-যে হাতের দান— আর বরণমালা ঐ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে ; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে!

[প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলার কাছে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী। একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে। এই এসেছি।

নন্দিনী। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে। বার বার কেন মিছে অনুরোধ করছ। এখনো সময় হয় নি। ও কে তোমার সঙ্গে? রঞ্জনের জুড়ি নাকি?

বিশু। না রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে। তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার? নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে।

নন্দিনী। ও আমার সাথি, ও আমাকে গান শেখায়। ঐ তো শিখিয়েছে—

গান

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে। ঐ তোমার সাথি? ওকে এখনই যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা হলে কী হয়।

নন্দিনী। তোমার গলার সুর ও কিরকম হয়ে উঠল? থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি?

নেপথ্যে। আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?

নন্দিনী। আচ্ছা, থাক্‌ ও কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কী?

নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী। কী করবে ওকে নিয়ে?

নেপথ্যে। এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এইভাবে কী করে টিকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম ; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী। আমারও চারি দিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে। ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী। তাতে কী হবে?

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই।

নন্দিনী। তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। মনে হয়, যে জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।— না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ঐ যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী। এ নিয়ে কী হবে ?

নেপথ্যে। ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ঐ যেন আমারই রক্ত-আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরি আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

নন্দিনী। তা হলে কী হবে ?

নেপথ্যে। তা হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী। একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ঐ ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

নেপথ্যে। তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারও শনিগ্রহ, তারও শনিগ্রহ।

নন্দিনী। ছি ছি, ওকি কথা বলছ! আমি যাই।

নেপথ্যে। কোথায় যাবে ?

নন্দিনী। তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়!

নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন।

নেপথ্যে। মিছিমিছি ভয় ? জান না, আমি ভয়ংকর ?

নন্দিনী। হঠাৎ তোমার এ কী ভাব! লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাস ? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশি হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব ? রাগ করবে না ?

নেপথ্যে। কী বলো দেখি।

নন্দিনী। ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না!

নেপথ্যে। কী বলছ নন্দিনী ?

নন্দিনী। এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত, তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশকরা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী। তার পরে কী ?

নেপথ্যে। তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও যাও, এখনই পালিয়ে যাও, এখনই।

নন্দিনী। এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পার করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন।

নেপথ্যে। আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি ?

নন্দিনী। শুনেছি, সে কিসের আর্তনাদ?

নেপথ্যে। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী। কেন তুমি নিষ্ঠুর?

নেপথ্যে। আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী। ও কী, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি। পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নন্দিনী। আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে। শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী। কী, বলো।

নেপথ্যে। সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি! সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী। তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

নেপথ্যে। ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে। থাক্ থাক্ থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী।
সেই সুরে সাগরকূলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।

পাগলভাই, ঐ-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়!

বিশু। ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকলরকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।— পাগলি, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?

নন্দিনী। মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিশু। নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক থেকে।

নন্দিনী। তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে

তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরে হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ পরেছ।

নন্দিনী। দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়োয় পরিয়ে দেব।

বিশু। লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী। রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু। পাগলি, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী। না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু। কী করব বলো।

নন্দিনী। গান করো।

বিশু। কী গান করব?

নন্দিনী। পথ চাওয়ার গান।

বিশু।

গান

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নন্দিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয় অনেক তোমার পাওনা ছিল, কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশু। তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প-কিছু দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।— এখন কোথায় যাবি?

নন্দিনী। পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব।

[উভয়ের প্রস্থান

সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার। না, এ পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল। ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার। তা, কী হল?

মোড়ল। কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই!'

সর্দার। অভ্যেস এখনই শুরু করাতে দোষ কী?

মোড়ল। সে চেষ্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।'

সর্দার। ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন।

মোড়ল। দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হল, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে ; বললে, 'আজ আমাদের খোদাই-নৃত্য হবে।'

সর্দার। খোদাই-নৃত্য ? তার মানে কী ?

মোড়ল। রঞ্জন ধরলে গান। ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথায় ?' ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি ! বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা ?' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।'

সর্দার। লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল। ঘোর পাগল। বললুম, 'কোদাল ধরো।' ও বলে, 'তার চেয়ে বেশি কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।'

সর্দার। তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে ?

মোড়ল। কী জানি প্রভু ! শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার। ও কী। ঐ না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে ? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল। তাই তো ! কখন গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে ! ভেলকি জানে।

সর্দার। যাও, এই বেলা ধরোগে ওকে। এ পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল। দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

ছোটো সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কোথায় চলেছ ?

ছোটো সর্দার। রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার। তুমি কেন। মেজো সর্দার কোথায় ?

ছোটো সর্দার। ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সর্দাররা কিরকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।'

সর্দার। শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সর্দার। ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার। ওকে বলোগে, রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সর্দার। কিন্তু রাজা যদি—

সর্দার। কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ। ভিতরে এ কী প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো। ভয়ংকর শব্দ যে !

অধ্যাপক। রাজা বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরি একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ। মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। আমাদের ঐ পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনীনদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো

খল্‌খল্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

পুরাণবাগীশ। বস্তুবাগীশ, এ কোন্‌ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে।

অধ্যাপক। জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে; এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর-একটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায়?' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক—আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক। ঐ দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে?

পুরাণবাগীশ। একটি মেয়ে, ধানীরঙের কাপড়-পরা।

অধ্যাপক। পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ঐ আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে— কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চার দিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনোপাখির মতো হুশ করে উড়ে পালায়।

পুরাণবাগীশ। বল কী হে! তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি?

অধ্যাপক। জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ। এখন বলো তো তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

অধ্যাপক। দেখার উপায় নেই, ঐ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ। বল কী হে! এই জালের আড়াল থেকে?

অধ্যাপক। তা নয় তো কী। ঘোমটার আড়াল থেকে যেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরনের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধ হয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ। বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক। কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ। আজকাল দেখছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানী রঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে?

অধ্যাপক। সত্যি কথা বলব? আমি ওকে ভালোবাসি।

পুরাণবাগীশ। বল কী হে!

অধ্যাপক। তুমি জানো না, ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বুঝি! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেছে।

অধ্যাপক। কিরকম?

সর্দার। রাজা বলে, পুরাণ বলে কিছুই নেই। বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণবাগীশ। পুরাণ যদি নেই তা হলে কিছু আছে কী করে? পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে?

সর্দার। রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে: মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না— রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বর উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার! সর্দার! ও কী! ও কারা!

সর্দার। কী গো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য! প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি! ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ঐ-যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি-দরজা দিয়ে?

সর্দার। ওদের আমরা বলি 'রাজার এঁটো'।

নন্দিনী। মানে কী?

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা! ওরা কি মানুষ! ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে!

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনোদিন ছিল?

সর্দার। হয়তো ছিল।

নন্দিনী। এখন গেল কোথায়?

সর্দার। বস্তুবাগীশ, পার তো বুঝিয়ে দাও, আমি চললুম।

[প্রস্থান

নন্দিনী। ও কী, ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই! ওদের এমন দশা কে করলে? ঐ-যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ারখেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনু—প, শক্‌লু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানীপাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল; যে-ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারই কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভান করত যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টমি করে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল! অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হল!

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বৈকি। সে-যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ঐ ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ঐ বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক। তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী। এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা হলে চাই নে আমি হওয়া— আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক। রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই।

দেখো-না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে শুরু করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী। (জানলা ঠেলে) শোনো, শোনো!

অধ্যাপক। কাকে ডাকছ তুমি।

নন্দিনী। জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক। ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী। বিশুপাগল, পাগলভাই!

অধ্যাপক। তাকে ডাকছ কেন।

নন্দিনী। এখনো-যে সে ফিরল না। আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক। একটু আগেই তোমার সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী। সর্দার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।— ও কিসের আর্তনাদ।

অধ্যাপক। এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী। কে সে।

অধ্যাপক। সেই-যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'এ রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো একমুহূর্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নন্দিনী। দিনরাত এই মানুষধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি ভালো থাকে।

অধ্যাপক। ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী। থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী।

অধ্যাপক। আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে, এ কথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে, এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী। আহা, ঐ দেখো, কিরকম টলতে টলতে আসছে! পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক। বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক। কেন হে।

পালোয়ান। কেবল ঐ সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক। সর্দার তোমার কী করেছে।

পালোয়ান। সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে, আমারই দোষ।

অধ্যাপক। কেন। ওর কী স্বার্থ।

পালোয়ান। সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী। তোমার কিরকম বোধ হচ্ছে, পালোয়ান ?

পালোয়ান। বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।— যদি কোনো উপায়ে একবার— হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে। সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

নন্দিনী। অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক। সাহস করি নে, নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী। মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না ?

অধ্যাপক। যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণশোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।— ঐ-যে সর্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী। আমার উপরে কেন এত রাগ।

অধ্যাপক। আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে-ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ ; যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।

[প্রস্থান

সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার !

সর্দার। নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই-যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম ! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। আহা, শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল। বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই তো পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি।

গোঁসাই। সব দিক ভেবে যে পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী। এ রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণবিচার আছে ?

গোঁসাই। আছে বৈকি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা বেশি পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। এ কি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া ?

নন্দিনী। গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন।

গোঁসাই। যে প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারও সঙ্গে কারও ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী। তবে কি এ লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এইরকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে।

গোঁসাই। পড়েই বা থাকবে কেন। কী বল সর্দার।

সর্দার। সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন। এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু।

পালোয়ান। কী প্রভু।

গোঁসাই। হরি হরি, এরই মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনের দলে টেনে দিতে পারব।

সর্দার। হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী। ওকি কথা। চলতে পারবে কেন।

সর্দার। দেখো নন্দিনী, মানুষ-চালানোই আমাদের ব্যাবসা। আমরা জানি, মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু!

পালোয়ান। যে আদেশ!

নন্দিনী। পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

পালোয়ান। না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী। আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান। আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না। [প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ।

সর্দার। আমি নিয়ে যাবার কে। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

নন্দিনী। এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো। তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জান, কোথায় আমার বিশুপাগল আছে।

গোঁসাই। আমি নিশ্চয় জানি, সে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী। কার ভালোর জন্যে।

গোঁসাই। সে তুমি বুঝবে না— আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা! ঐ গেল ছিঁড়ে! ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার। কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সুদ্ধ ছিঁড়বে। বিপদ করলে। আমি চললুম।

[প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছ বিশুপাগলকে।

সর্দার। তাকে বিচারশালায় ডেকেছে— এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী। আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।

সর্দার। তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

নন্দিনী। আমি!

সর্দার। হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে-আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী। তাই হোক, কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি।

সর্দার। কিছুতে না।

নন্দিনী। কিছুতেই না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই— আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম!

[সর্দারের প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো শোনো, রাজা। কোথায় তোমার বিচারশালা। তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি। ও কে ও! কিশোর যে! বল্ তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশু।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। হাঁ নন্দিনী, এখনই তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজি হল।

নন্দিনী। প্রহরীদের কর্তা ? তবে কি—

কিশোর। হাঁ, ঐ-যে আসছে।

নন্দিনী। ও কি ! তোমার হাতে হাতকড়ি ! পাগলভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে !

বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশু। ভয় নেই, কিছু ভয় করিস নে। পাগলি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী। কী বলছ বুঝতে পারছি নে।

বিশু। যখন ভয়ে-ভয়ে পদে-পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী। কী দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। এতদিন পরে আজ সত্যকথা বলেছিলুম।

নন্দিনী। তাতে দোষ কী হয়েছে।

বিশু। কিচ্ছু না।

নন্দিনী। তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

বিশু। এতেই বা ক্ষতি কী হল। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি— এ বন্ধন তারই সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী। ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরই লজ্জা করছে না ? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ !

বিশু। ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে-যে— মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী। আহা পাগলভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে।

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে কথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী। আমাকেও এমনি করে তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক, ভাই আমার। তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচবে না।

কিশোর। বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু। এ-যে তোর পাগলের মতো কথা।

কিশোর। শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশি হয়ে সইতে পারব।

নন্দিনী। আহা, না কিশোর, ও কথা বলিস নে।

কিশোর। নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তারা যে অপমান করবে, এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু। না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

কিশোর। নন্দিনী, তা হলে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন্ কথা তাকে জানাব ?

নন্দিনী। কিছু না। তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে।

[কিশোরের প্রস্থান

বিশু। এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক।

নন্দিনী। মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্যহাতে বিদায় দিয়েছি। আর ঐ-যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কী বা পেলে।

বিশু। মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই। মনে আছে, সেই নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে ?

নন্দিনী। এই-যে রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। পাগলি, শুনতে পাচ্ছিস ঐ ফসলকাটার গান ?

নন্দিনী। শুনতে পাচ্ছি, প্রাণ কেঁদে উঠছে।

বিশু। মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়—

গান

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও বাঁধো আঁটি,
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক তা মাটি।

[সকলের প্রস্থান

চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক। দেখলুম। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার। এর প্রতিকার কী।

চিকিৎসক। বড়োরকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দার। অর্থাৎ আর-কারও ক্ষতি করতে না দিলে, উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক। ওরা বড়োলোক, বড়ো শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আর একটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।

সর্দার। লক্ষণ দেখে আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায় হায়, কী দুঃখ। আমাদের স্বর্ণপুরী যেরকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল, এমন কোনোদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই— আচ্ছা যাও, ভেবে দেখছি।

[চিকিৎসকের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। সর্দারমহারাজ, ডেকেছেন ? আমি ঞ পাড়ার মোড়ল।

সর্দার। তুমিই তো তিনশো একুশ ?

মোড়ল। প্রভুর কী স্মরণশক্তি। আমার মতো অভাজনকেও ভোলেন না।

সর্দার। দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

মোড়ল। পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হোক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দার। কোথায় যেতে হবে জান তো ? বাগানবাড়িতে, যেখানে সর্দারদের ভোজ।

মোড়ল। যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ঐ-যে ৬৯ঙ, লোকে যাকে বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেছে।

সর্দার। কেন। তোমাদের 'পরে উৎপাত করে নাকি।

মোড়ল। মুখের কথায় নয়, ভাবে ভঙ্গিতে।

সর্দার। আর ভাবনা নেই। বুঝেছ ?

মোড়ল। তাই নাকি ! তা হলে ভালো। আর-একটা কথা, ঐ-যে ৪৭ফ, ৬৯ঙর সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি।

সর্দার। সেটা লক্ষ্য করেছি।

মোড়ল। প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি— দুই-একটা ফস্‌কিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন-না, আমাদের ৯৫— গ্রামসম্পর্কে আমার পিসশ্বশুর— পাঁজরের হাড় ক'খানা দিয়ে সর্দারমহারাজের ঝাড়ুবর্দারের খড়ম বানিয়ে দিয়ে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে অথচ আজ পর্যন্ত—

সর্দার। তার নাম বড়ো-খাতায় উঠেছে।

মোড়ল। যাক, সার্থক হল এতকালের সেবা। খবরটা তাকে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কী জানি হঠাৎ—

সর্দার। আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শিগ্‌গির।

মোড়ল। আর-একজন মানুষের কথা বলবার আছে— সে যদিচ আমার আপন শালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দার। তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল। মেজো সর্দারবাহাদুর ঐ আসছেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন। আমার উপর ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে ৬৯ঙর যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনই সে আমার নামে—

সর্দার। না না, কোনোদিন তোমার নাম করতেও তাকে শুনি নি।

মোড়ল। সেই তো ওর চালাকি। যে মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তো তাকে মারতে হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ঐ রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার তো দেখি আর-কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দার। আজ আর সময় নেই, শিগ্‌গির যাও।

মোড়ল। তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা, ওপাড়ার অষ্টআশি সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড়হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দার। আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা কাল হবে।

মোড়ল। আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলি নে ; কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কি না ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়ীনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

সর্দার। আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল। প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরি ছাঁচিকুমড়োর—

সর্দার। আচ্ছা, পরশু আসতে বোলো, দেখা মিলবে।

[মোড়লের প্রস্থান

মেজো সর্দারের প্রবেশ

মেজো সর্দার। নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দার। আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার। এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সর্দার। রাজা কি—

মেজো সর্দার। রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে— কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার। রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দার। না না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনোরকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সর্দার। কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা।

মেজো সর্দার। আন্দাজে সবই জানে, পষ্ট জানতে চায় না।

সর্দার। কেন।

মেজো সর্দার। পাছে 'জানি নে' এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দার। হলই-বা।

মেজো সর্দার। বুঝছ না ? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর-যে এক পিঠে গোঁসাই, আর-এক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারিধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা হলে নামজপের বেলায় খুব বেশি বাধে না।

সর্দার। নামজপটা নাহয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দার। কিন্তু এ দিকে যে ওর মনটা ধর্মভীরু, রক্তটা যাই হোক। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

সর্দার। মেজো সর্দার, তোমারও দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সর্দার। রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে আশা আছে। কিন্তু আজও তোমার ঐ তিনশো-একুশকে সইতে পারি নে। যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তাকে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।— ঐ-যে নন্দিনী আসছে।

সর্দার। চলে এসো, মেজো সর্দার।

মেজো সর্দার। কেন। ভয় কিসের।

সর্দার। তোমাকে বিশ্বাস করি নে ; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার। কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেছে, তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার। তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ঐ কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো, শোনো। দিনরাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। ঠেলছ কাকে।

নন্দিনী। তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোঁসাই। হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটোমুখে বড়োকথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী। তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই। এসো আমার ঠাকুরঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী। শুধু নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই। মনে শান্তি পাবে!

নন্দিনী। শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই। দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশি?

নন্দিনী। তোমাদের ঐ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনোদিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে। যাও যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যাবসা তোমার।

[গোঁসাইয়ের প্রস্থান

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়। সত্য করে বলো।

নন্দিনী। তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা। রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস! তুই ওদের চর।

নন্দিনী। কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলে।

চন্দ্রা। নইলে এখানে তোর কী কাজ। কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস।

ফাগুলাল। এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। মনে মনে তোমাকে— সে কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে।

নন্দিনী। হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা। তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে সর্বনাশী!

নন্দিনী। ও-যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা। ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে।

নন্দিনী। আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে, চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তাকে বাঁচাব কী করে।

চন্দ্রা। ও-সব কথা বুঝি নে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ঐ সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

ফাগুলাল। চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে। কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব।

নন্দিনী। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল। কী করতে যাবে।

নন্দিনী। ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা। ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ মায়াবিনী! আর কাজ নেই।

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। সবার আগে ঐ ডাইনীকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা। মারবে ? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে, সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে। খুরপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয়, তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল। তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল। খবরদার ! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা হলে—

নন্দিনী। ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করি নে। কী করতে পারে করুক কাপুরুষ।

গোকুল। ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি ! সর্দারকেই তুমি শত্রু বলে জান ! তা হোক, যে শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ঐ মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী। সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা ! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যেরকম। যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে ?

ফাগুলাল। গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে। [ফাগুলাল চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা।

প্রথম। ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী। রঞ্জনকে দেখেছ ?

দ্বিতীয়। তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি। ঐ ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নন্দিনী। ওরা কারা।

তৃতীয়। ওরা সর্দারের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে। [এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো লালটুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ ?

প্রথম। সেদিন রাতে শম্ভুমোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী। এখন কোথায় আছে সে ?

দ্বিতীয়। ঐ-যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না। [এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জান।

প্রথম। চুপ চুপ।

নন্দিনী। তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বলতেই হবে।

দ্বিতীয়। আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিকে আছি। ঐ-যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো। [এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

প্রথম। শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপূজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানি নে। [প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আবার এসেছ অসময়ে। এখনই যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা!

নেপথ্যে। কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী। বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে। আজ ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনই যাও।

নন্দিনী। আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনই তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী। বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে। নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী। আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে। ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার উদ্‌ঘাটন) ওকি! ঐ কে প'ড়ে। রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজা। কী বললে। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী। হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজা। ও কেন বললে না ওর নাম। কেন এমন স্পর্ধা করে এল।

নন্দিনী। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন।

রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা। আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী। তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে!

রাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী। ও কি আমার নাম বলে নি।

রাজা। এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

নন্দিনী। (রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।— আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি। তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল। রাজা, কোথায় সেই বালক।

রাজা। কোন্ বালক।

নন্দিনী। যে বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা। সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী। তার পরে কী হল তার? বলো, কী হল? বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা। বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়?

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথি করো, নন্দিন!

নন্দিনী। কোথায় যাব?

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক— তাতেই আমার মুক্তি।

দলের লোক। মহারাজ, একি কাণ্ড! এ কী উন্মত্ততা! ধ্বজা ভাঙলেন! আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে, সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পূজার দিনে কী মহাপাতক! চল্, সর্দারদের খবর দিইগে।

[প্রস্থান

রাজা। এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী। যাব আমি।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে! এই বুঝি রাজা? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা। কী হয়েছে তোমাদের? কী করতে বেরিয়েছ?

ফাগুলাল। বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা। ফিরবে কেন? ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ঐ তার প্রথম চিহ্ন— আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগুলাল। নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী। ফাগুভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল। নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী। আমি তো সেইজন্যই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ঐ দেখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে।

ফাগুলাল। সর্বনাশ! ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী। নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনো মরতে পারে না।

ফাগুলাল । হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী, আমার ! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে !

নন্দিনী । ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল । ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে ।— চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল ?

ফাগুলাল । সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে । সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস ।— কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো ? আমরা তোমারই বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি ।

রাজা । হাঁ, আমারই বন্দীশালা । তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে । একলা তোমার কাজ নয় ।

ফাগুলাল । সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে ।

রাজা । তাদের সঙ্গে আমার লড়াই ।

ফাগুলাল । সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না ।

রাজা । একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ ।

ফাগুলাল । জিততে পারবে ?

রাজা । মরতে তো পারব । এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি— বেঁচেছি ।

ফাগুলাল । রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন ?

রাজা । ঐ-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে । এত শিগ্‌গির কী করে সম্ভব হল ? আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি । ঠকিয়েছে আমাকে । আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে ।

ফাগুলাল । আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছল না ।

রাজা । সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে । আর তারা পৌঁছবে না ।

নন্দিনী । মনে ছিল, বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে । সে কি আর হবে না ।

রাজা । উপায় নেই । পথ ঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি ।

ফাগুলাল । তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে । সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না ।

নন্দিনী । একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে ? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে । সর্দার ! সর্দার !— দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে । ঐ মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব ।— সর্দার ! আমাকে দেখতে পেয়েছে । জয় রঞ্জনের জয় !

[দ্রুত প্রস্থান

রাজা । নন্দিনী !

[প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল । কোথায় ছুটেছ, অধ্যাপক ?

অধ্যাপক । কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম ।

ফাগুলাল । রাজা তো ঐ গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে ।

অধ্যাপক । তার জাল ছিঁড়েছে ! নন্দিনী কোথায় ?

ফাগুলাল । সে গেছে সবার আগে । তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না ।

অধ্যাপক । এইবারই পাওয়া যাবে । আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব ।

[প্রস্থান

বিশুর প্রবেশ

বিশু। ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল। তুমি কী করে এলে?

বিশু। আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়?

ফাগুলাল। সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু। কোথায়?

ফাগুলাল। শেষ মুক্তিতে।— বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে?

বিশু। ও যে রঞ্জন!

ফাগুলাল। ধুলায় দেখছ ঐ রক্তের রেখা?

বিশু। বুঝেছি, ঐ তাদের পরমমিলনের রক্তরাখী। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে! আমার পাগলি! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

ফাগুলাল। নন্দিনীর জয়!

বিশু। নন্দিনীর জয়!

ফাগুলাল। আর, ঐ দেখো, ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু। তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান।

[প্রস্থান

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

চিরকুমার-সভা

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

চন্দ্রমাধববাবু	কলিকাতার কোনো কলেজের অধ্যাপক চিরকুমার-সভার সভাপতি
শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ	চিরকুমার-সভার সভ্যগণ
অক্ষয়কুমার	জগত্তারিণীর বড়ো জামাতা
রসিকদাদা	জগত্তারিণীর দূরসম্পর্কীয় খুড়া
বনমালী	ঘটক
গুরুদাস	ওস্তাদ
দারুকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়	কুলীন যুবকদ্বয়
জগত্তারিণী	বিধবা হিন্দু মহিলা
পুরবালা	জগত্তারিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, অক্ষয়কুমারের স্ত্রী
শৈলবালা	জগত্তারিণীর বিধবা কন্যা
নৃপবালা, নীরবালা	জগত্তারিণীর দুই অবিবাহিতা কন্যা
নির্মলা	চন্দ্রমাধববাবুর অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী

চিরকুমার-সভা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বৈঠকখানা

অক্ষয় ও পুরবালা

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে। এত দিনে এক-একটির তিনটি-চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে। ওরা আমার বোন কিনা—

অক্ষয়। মানবচরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না— এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা। দেখো, তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র পড়ে বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর একটা!

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হতেও পারে।

অক্ষয় সখী, তবে খুলে বলো।

গান

কী জানি কী ভেবেছ মনে
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে যায় ওই
ছলছল নয়নে।

পুরবালা। ওস্তাদজি, থামো। আমার প্রস্তাব এই যে দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাকবে, যখন তোমার সঙ্গে দুটো-একটা কাজের কথা হতে পারবে।

অক্ষয়। গরিবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ করে বাজুবন্দ চেয়ে বসে।

গান

পাছে চেয়ে বসে আমার মন
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

পুরবালা। তবে যাও।

অক্ষয়। না না, রাগারাগি না। আচ্ছা, যা বল তাই শুনব। খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব। তোমার সামনে কোনো রকমের বেয়াদবি করব না। তা, কী কথা হচ্ছিল। শ্যালীদের বিবাহ। উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা। দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শুনে এখনো তিনি বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি।

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।

পুরবালা। গোকুলটি কোথায়।

অক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।

পুরবালা। প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই।

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন। তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ঐ সভাটার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন, দিব্যি বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন— এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এক কালে ঐ সভার সভাপতি ছিলুম।

পুরবালা। তোমার কী রকম দশাটা হয়েছিল।

অক্ষয়। সে আর কী বলব। প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রী শব্দ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোলো-শো গোপিনী যদি বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই— ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর-কি!

পুরবালা। চৌষট্টি হাজারের শখ মিটল?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না। জাঁক হবে। তবে ইশারায় বলতে পারি, মা কালী দয়া করেছেন বটে।

পুরবালা। তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করেছিলেন।

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যেই কার্তিকটি পেয়েছ।

পুরবালা। আবার ঠাট্টা শুরু হল?

অক্ষয়। কার্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে বলছি, ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, এইবার তোমার ছোটো দুটি শ্যালীকে রক্ষা করো।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কী।

শৈলবালা। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস রে। একেবারে বিয়ের এপিডেমিক। প্লেগের মতো। এক বাড়িতে একসঙ্গে দুই কন্যেকে আক্রমণ। ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে!

গান

বড়ো থাকি কাছাকাছি,
তাই ভয়ে ভয়ে আছি।
নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি।

শৈলবালা। এই কি তোমার গান গাবার সময় হল।

অক্ষয়। কী করব ভাই। রোশনচৌকি বাজাতে শিখি নি, তা হলে ধরতুম। বল কী। শুভকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্‌বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন।

শৈলবালা। বৈশাখ মাসের পর আসছে বছরে অকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই।

পুরবালা। তোরা আগে থাকতে ভাবিস কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাক তো।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়।

অক্ষয়। কী মা।

জগত্তারিণী। তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে।

শৈলবালা। মেয়েদের রাখতে পার না বলেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা।

জগত্তারিণী। ঐ তো। তোদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে, পাস করিয়ে, কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদ্যের দরকার কী।

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়েমানুষের একটা-না-একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই— হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিস্টিরিয়া। দেখো-না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি, তাই স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন; আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়।

জগত্তারিণী। তা, যা বল বাবা, আসছে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমানুষের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) তা তো বটেই। বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ তখন সকাল সকাল বিয়ে করে সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চাই।

পুরবালা। আঃ কী বকছ। মা শুনতে পাবেন।

জগত্তারিণী। রসিককাকা আজ পাত্র দেখাতে আসবেন। তা, চল্ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখিগে।

[জগত্তারিণীর ও পুরবালার প্রস্থান

শৈলবালা। আর তো দেরি করা যায় না মুখুজ্জেমশায়। এইবার তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাবু শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চলছে না। আহা, ছেলে দুটি চমৎকার। আমাদের নেপো আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়। তুমি তো চৈত্রমাস যেতে না-যেতে আপিস ঘাড়ে করে সিমলে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

অক্ষয়। কিন্তু, তাই ব'লে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চমকে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈলবালা। বেশ তো, তা দেবার ভার আমি নেব মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আর-একটু খোলসা করে বলতে হচ্ছে।

শৈলবালা। ঐ তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেঁকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয়। তা হলে জন্মটা বদলে নিয়ে আর-একবার সভ্য হব। একবার তোমার দিদির হাতে নাকাল হয়েছি, এবার তোমার হাতে। কুমার হবার সুখটাই ঐ— কটাক্ষবাণগুলোকে লক্ষ্যভেদ করবার সুযোগ দেওয়া যায়।

শৈলবালা। ছি মুখুজ্জেমশায়, তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্ছ। ঐ-সব নয়নবাণ-টানগুলোর এখন কি আর চলন আছে। যুদ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত— কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত

নীরবালা। (শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া) মেজদিদিভাই, আজ কারা আসবে বল্ তো।

নৃপবালা। মুখুজ্জেমশায়, আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে। জলখাবারের আয়োজন হচ্ছে কেন।

অক্ষয়। ঐ তো! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে— পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কী করে ঘটে সে-সমস্ত লাখ-দুলাখ ক্রোশের খবর রাখ, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে পড়ছে সেটা অনুমান করতেও পারলে না?

নীরবালা। বুঝেছি ভাই সেজদিদি। তোর বর আসছে ভাই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ চোখ নাচছিল।

নৃপবালা। তোর বাঁ চোখ নাচলে আমার বর আসবে কেন।

নীরবালা। তা ভাই, আমার বাঁ চোখটা নাহয় তোর বরের জন্যে নেচে নিলে, তাতে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, জলখাবার তো দুটি লোকের জন্যে দেখলুম, সেজদিদি কি স্বয়ম্বরা হবে নাকি।

অক্ষয়। আমাদের ছোড়দিদিও বঞ্চিত হবেন না।

নীরবালা। আহা মুখুজ্জেমশায়, কী সুসংবাদ শোনালে। তোমাকে কী বকশিশ দেব। এই নাও আমার গলার হার, আমার দু হাতের বালা।

শৈলবালা। আঃ ছি, হাত খালি করিস নে।

নীরবালা। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্জেমশায়।

নৃপবালা। আঃ, কী বর বর করছিস। দেখো তো ভাই মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ঐজন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই?

নীরবালা। সেইজন্যেই তো লোভ বেড়ে গেছে।

নৃপ তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল

(চলিতে চলিতে) এলে খবর দিয়ো মুখুজ্জেমশায়, ফাঁকি দিয়ো না। দেখছ তো সেজদিদি কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।—

গান

না ব'লে যায় পাছে সে
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। ভয় নেই, ভয় নেই। একটা যায় তো আর-একটা আসবে। যে বিধাতা আগুন সৃষ্টি করেছেন পতঙ্গও তিনিই জুটিয়ে দেবেন। এখন গানটা চলুক।

নীরবালা।— কাছে তার রই, তবুও
ব্যথা যে রয় পরানে।

অক্ষয়। নীরু, এটা তো আগন্তুকদের লক্ষ্য করে তৈরি হয় নি। কাছের মানুষটি কে বলো তো।

নীরবালা।— যে পথিক পথের ভুলে
এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়
চলে যায় কোন্ উজানে,
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। এ তো আমার সঙ্গে মিলছে। কিন্তু ভাই, জেনেশুনেই পথ ভুলেছি, সুতরাং সে ভুল ভাঙবার রাস্তা রাখি নি।

নীরবালা ।—
এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে ।
খেয়ালের হাওয়া লেগে
যে খেপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায়
মিনতির বাধা মানে ।
আঁখি মোর ঘুম না জানে ।

গান

অক্ষয় ।—
না, না গো, না
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না ।
যখনই চলে যাই
আসিব বলে যাই,
আলো ছায়ার পথে করি আনাগোনা ।
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে ।
বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে ।
ক্ষণিক আড়ালে
বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না ।

নীরবালা । বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম । তা হলে ঘুমোতে পারি ।

অক্ষয় । নির্ভয়ে ।

[নৃপবালা ও নীরবালার প্রস্থান

শৈলবালা । মুখুজ্জেমশায়, আমি ঠাট্টা করছি নে— আমি চিরকুমার-সভার সভ্য হব । কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন কাউকে চাই তো । তোমার বুঝি আর সভ্য হবার জো নেই ?

অক্ষয় । না, আমি পাপ করেছি । তোমার দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ করে আমাকে স্বর্গ হতে বঞ্চিত করেছেন ।

শৈলবালা । তা হলে রসিকদাদাকে ধরতে হচ্ছে । তিনি তো কোনো সভার সভ্য না হয়েও চিরকুমার-ব্রত রক্ষা করেছেন ।

অক্ষয় । সভ্য হলেই এই বুড়োবয়সে ব্রতটি খোয়াবেন । ইলিশমাছ অমনি দিব্যি থাকে, ধরলেই মারা যায় ; প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধলেই তার সর্বনাশ ।

রসিকের প্রবেশ

রসিকদাদার সম্মুখের মাথায় টাক, গোঁফ পাকা, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি

অক্ষয় । ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড ।

রসিক । কেন হে মত্তমন্থর কুঞ্জকুঞ্জর পুঞ্জঅঞ্জনবর্ণ ।

অক্ষয় । তুমি আমার শ্যালী-পুষ্পবনে দাবানল আনতে চাও ?

শৈলবালা । রসিকদাদা, তোমারই বা তাতে কী লাভ ।

রসিক । ভাই, সইতে পারলুম না, কী করি । বছরে বছরেই তোর বোনদের বয়স বাড়ছে, বড়োমা আমারই দোষ দেন কেন । বলেন দুবেলা বসে বসে কেবল খাচ্ছ, মেয়েদের জন্যে দুটো বর দেখে দিতে

পার না। আচ্ছা ভাই, আমি না খেতে রাজি আছি, তা হলেই বর জুটবে না তোর বোনদের বয়স কমতে থাকবে ? এ দিকে যে-দুটির বর জুটছে না তাঁরা তো দিব্যি খাচ্ছেন দাচ্ছেন। শৈলভাই, কুমারসম্ভবে পড়েছিস, মনে আছে তো ?—

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।

তা ভাই, দুর্গা নিজের বর খুঁজতে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন ; কিন্তু নাতনীদের বর জুটছে না বলে আমি বুড়োমানুষ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়োমার এ কী বিচার। আহা শৈল, ওটা মনে আছে তো ? তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং—

শৈলবালা। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভালো লাগছে না।

রসিক। তা হলে তো অত্যন্ত দুঃসময় বলতে হবে।

শৈলবালা। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা, রাজি আছি ভাই। যেরকম পরামর্শ চাও তাই দেব। যদি হাঁ বলাতে চাও হাঁ বলব, না বলাতে চাও না বলব। আমার এই গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই বলেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মতোই বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেছ, তার মধ্যে তোমার এই টাক একটি।

রসিক। আর একটি হচ্ছে 'যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে'— তা, আমি বাইরের লোকের কাছে বেশি কথা কই নে।

শৈলবালা। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও ?

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈলবালা। ধরা যদি পড়ে থাক তো চলো, যা বলি তাই করতে হবে।

রসিক। ভয় নেই দিদি। এমন দুটি কুলীনের ছেলে জোগাড় করেছি কন্যাদায়ের দুঃখের চেয়েও যারা হাজারগুণ অসহ্য। তাদের দেখলে বড়োমা তাঁর মেয়েদের জন্য এ বাড়িতে চিরকুমারী-সভা স্থাপন করবেন। যাই, তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

[প্রস্থান

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আজ্ঞা করো।

শৈলবালা। কুলীনের ছেলে দুটোকে কোনো ফিকিরে তাড়াতে হবে।

অক্ষয়। তা তো হবেই।—

গান

দেখব কে তোর কাছে আসে—
তুই রবি একেশ্বরী, একলা আমি রইব পাশে।

শৈলবালা। (হাসিয়া) একেশ্বরী ?

অক্ষয়। নাহয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হলে, শাস্ত্রে আছে : অধিকন্তু ন দোষায়।

শৈলবালা। আর, তুমিই একলা থাকবে ? ওখানে বুঝি অধিকন্তু খাটে না ?

অক্ষয়। ওখানে শাস্ত্রের আর-একটা পবিত্র বচন আছে সর্বমত্যন্তগর্হিতং।

শৈলবালা। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, ও পবিত্র বচনটা তো বরাবর খাটবে না। আরও সঙ্গী জুটবে।

অক্ষয়। তোমাদের এই একটি শালার জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে ? তখন আবার নূতন কার্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলেগুলোকে ঘেঁষতে দিচ্ছি নে।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। দুটি বাবু এসেছে।

[প্রস্থান

শৈলবালা। ঐ বুঝি তারা এল। দিদি আর মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্বেই ওদের কোনোমতে বিদায় করে দিয়ো।

অক্ষয়। কী বকশিশ মিলবে।

শৈলবালা। আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে 'শালীবাহন রাজা' খেতাব দেব।

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেন্ড্‌ ?

শৈলবালা। সেকেন্ড্‌ হতে যাবে কেন। সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট।

অক্ষয়। বল কী। আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন সাল প্রচলিত হবে ?

গান

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক—
দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ওই চোখ।

[শৈলবালার প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরের প্রবেশ

একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতা-পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালি পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা, বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি হইতে পারে। আর-একটি বেঁটে খাটো, অত্যন্ত দাড়ি-গোঁফ-সংকুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালোকোলো, গোলগাল

অক্ষয়। (অত্যন্ত সৌহার্দ্য-সহকারে উঠিয়া প্রবলবেগে শেক্‌হ্যান্ড করিয়া) আসুন মিস্টার ন্যাথানিয়াল, আসুন মিস্টার জেরেমায়া, বসুন বসুন। ওরে, বরফ-জল নিয়ে আয় রে, তামাক দে—

মৃত্যুঞ্জয়। (সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সংকুচিত হইয়া মৃদুস্বরে) আজ্ঞে আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি।

দারুকেশ্বর। আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অক্ষয়। ছি মশায়। ও নামগুলো এখনো ব্যবহার করেন বুঝি ? আপনাদের ক্রিশ্চান নাম ? (আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরুত্তর দেখিয়া) এখনো বুঝি নামকরণ হয় নি ? তা, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে।

অক্ষয়ের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে প্রদান। সে লোকটা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া

বিলক্ষণ ! আমার সামনে আবার লজ্জা। সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি। ধোঁয়া লেগে লেগে বুদ্ধিতে ঝুল পড়ে গেল। লজ্জা যদি করতে হয় তা হলে আমার তো আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার জো থাকে না।

তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড়্‌ ফড়্‌ শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্মার চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সদ্যস্থাপিত ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোনো গতিকে কাশি চাপিয়া রাখিল

অক্ষয়। এখন কাজের কথাটা শুরু করা যাক। কী বলেন।

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল

দারুকেশ্বর। তা নয় তো কী। শুভস্য শীঘ্রং।

অক্ষয়। (গম্ভীর হইয়া) মুর্গি না মটন ?

মৃত্যুঞ্জয় অবাক হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল
দারুকেশ্বর কিছু না বুঝিয়া অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল

আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি। তা হলে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়লে মারাই যাবেন। তা, যেটা হয় মনস্থির করে বলুন— মুর্গি হবে না মটন হবে।

তখন দুজনে বুঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল
দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল

ভয় কিসের মশায়। নাচতে বসে ঘোমটা ?

দারুকেশ্বর। (দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া, হাসিয়া) তা মুর্গিই ভালো, কট্‌লেট, কী বলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। (সাহস পাইয়া) মটনটাই বা মন্দ কী ভাই। চপ!

অক্ষয়। ভয় কী দাদা, দু'ই হবে। দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না। (চাকরকে ডাকিয়া) ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমদ্দি খানসামাকে ডেকে আন্‌ দেখি। (বুড়ো আঙুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে) বিয়ার না শেরি ?

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল

দারুকেশ্বর। হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি ?

অক্ষয়। (পিঠ চাপড়াইয়া) নেই তো কী। বেঁচে আছি কী করে।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি।

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্তব্য বোধ করিল
এবং দারুকেশ্বর ফস করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ বাজাইতে আরম্ভ করিল

দারুকেশ্বর। দাদা, ওটা শেষ করে ফেলো।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া) ধরো না হে, তুমিও ধরো।

সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল
অক্ষয় ডেস্ক চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন— এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া, গম্ভীর হইয়া

হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এ দিকে তো সব ঠিক, এখন আপনারা কী হলে রাজি হন।

দারুকেশ্বর। আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

অক্ষয়। সে তো হবেই। তার না কাটলে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে। দেশে আপনাদের মতো লোকের বিদ্যেবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছলে উঠবে।

দারুকেশ্বর। (অত্যন্ত খুশি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। বুঝলে ?

অক্ষয়। সে কিছু শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্‌টাইজ্‌ আজই তো হবেন?

দারুকেশ্বর। (হাসিতে হাসিতে) সেটা কিরকম।

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে) কেন, কথাই তো আছে, রেভারেন্ড্‌ বিশ্বাস আজ রাত্রেই আসছেন। ব্যাপটিজ্‌ম্‌ না হলে তো ক্রিশ্চান মতে বিবাহ হতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীত হইয়া) ক্রিশ্চান মতে কী মশায়।

অক্ষয়। আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন। সে হচ্ছে না— ব্যাপ্‌টাইজ্‌ যেমন করে হোক, আজ রাত্রেই সারতে হচ্ছে। কিছুতেই ছাড়ব না।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারা ক্রিশ্চান নাকি।

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীতভাবে) মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোয়াতে পারব না।

অক্ষয়। (হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে) জাত কিসের মশায়। এ দিকে কলিমদ্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত?

মৃত্যুঞ্জয়। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) চুপ, চুপ, চুপ করুন। কে কোথা থেকে শুনতে পাবে।

দারুকেশ্বর। ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি।

(মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া) বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে— তখন ডবল প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না। দেখলি তো কোনো শ্বশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান হতে আর বাকি কী রইল।

(অক্ষয়ের কাছে আসিয়া) বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা? তা হলে ক্রিশ্চান হতে রাজি আছি।

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আজ রাতটা থাক্‌।

দারুকেশ্বর। হতে হয় তো চট্‌পট্‌ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো; গোড়াতেই বলেছি, শুভস্য শীঘ্রং।

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম
দুই-থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ-জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

দারুকেশ্বর। কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেল না কি। কট্‌লেট কোথায়।

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে) আজকের মতো এইটেই চলুক।

দারুকেশ্বর। সে কি হয় মশায়। আশা দিয়ে নৈরাশ? শ্বশুরবাড়ি এসে মটন চপ খেতে পাব না? আর, এ-যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সর্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না। (গান জুড়িয়া) অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে টিপিয়া) ধরো-না হে, তুমিও ধরো-না— চুপচাপ কেন। (গানের উচ্ছ্বাস থামিলে আহার-পাত্র দেখাইয়া) নিতান্তই কি এটা চলবে না।

দারুকেশ্বর। (ব্যস্ত হইয়া) না মশায়, ও-সব রোগীর পথ্যি চলবে না। মুর্গি না খেয়েই তো ভারতবর্ষ গেল।

অক্ষয়। (কানের কাছে আসিয়া)

গান

কত কাল রবে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।

দারুকেশ্বর উৎসাহ-সহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল

অক্ষয়। (আবার কানে কানে ধরাইয়া দিয়া)—

দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন।

দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উর্ধ্বস্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোনোমতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে)—

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

যতই উৎসাহ-সহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উস্‌খুস্‌ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দারুকেশ্বর। (কলিমদ্দিকে) এই-যে চাচা। আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি। অক্ষয়বাবু, কারি না কট্‌লেট।

অক্ষয়। (অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া) সে আপনারা যা ভালো বোঝেন।

দারুকেশ্বর। আমার তো মত, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ব'লে সব-কটাকেই আদর করে নিই।

অক্ষয়। তা তো বটেই, ওরা সকলেই পূজ্য।

কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া) মশায়রা কি তা হলে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান হতে চান।

দারুকেশ্বর। আমার তো কথাই আছে শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিশ্চান হব, এখনই ক্রিশ্চান হব, ক্রিশ্চান হয়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ঐ পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। আনুন আপনার পাদরি ডেকে।

উচ্চস্বরে গান

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (অক্ষয়ের কানে কানে) মাঠাকরুন একবার ডাকছেন।

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেল

জগত্তারিণী। এ কী। কাণ্ডটা কী।

অক্ষয়। (গম্ভীরমুখে) মা সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্ছে, কী করি। তোমার পায়ের মালিশ করবার জন্যে সেই-যে ব্রান্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে।

জগত্তারিণী। (হতবুদ্ধি হইয়া) বল কি বাছা। ব্রান্ডি খেতে দেবে?

অক্ষয়। কী করব মা, শুনেইছ তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দি হয়, মদ না খেলে আর-একটির মুখে কথাই বের হয় না।

জগত্তারিণী। ক্রিশ্চান হবার কথা কী বলছে ওরা।

অক্ষয়। ওরা বলছে হিঁদু হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অসুবিধে, পুঁইশাক কলায়ের ডাল খেলে ওদের অসুখ করে।

জগত্তারিণী। (অবাক হইয়া) তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিশ্চান করবে নাকি।

অক্ষয়। তা, মা, ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাত্র এখনই হাতছাড়া হবে। তাই ওরা যা বলছে তাই শুনতে হচ্ছে। (পুরবালার প্রতি) আমাকে-সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখছি।

পুরবালা। বিদায় করো, বিদায় করো, এখনই বিদায় করো।

জগত্তারিণী। (ব্যস্ত হইয়া) বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম। তাঁর দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়।

[রমণীগণের প্রস্থান

অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে
এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে
অক্ষয়ের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে

মৃত্যুঞ্জয়। (অক্ষয়কে রাগের স্বরে) না মশায়, আমি ক্রিশ্চান হতে পারব না। আমার বিয়ে করে কাজ নেই।

অক্ষয়। তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করছে।

দারুকেশ্বর। আমি রাজি আছি মশায়।

অক্ষয়। রাজি থাকেন তো গির্জেয় যান মশায়। আমার সাত পুরুষে ক্রিশ্চান করা ব্যাবসা নয়।

দারুকেশ্বর। ঐ-যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বললেন—

অক্ষয়। তিনি টেরিটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা ?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয় !

দারুকেশ্বর। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায় ? খাওয়াটাও কি—

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্তত হোটেলে ?

অক্ষয়। সে কথা ভালো।

টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন
নৃপর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দমকা হাওয়ার মতো ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়, দিদি তা দুটির কোনোটিকেই বাদ দিতে চান-না।

নৃপবালা। (নীরর কপোলে গুটি দুই-তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া) ফের মিথ্যে কথা বলছিস !

অক্ষয়। ব্যস্ত হোস নে ভাই, সত্যমিথ্যের প্রভেদ আমি একটু-একটু বুঝতে পারি।

নীরবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, এ দুটি কি রসিকদাদার রসিকতা না আমাদের সেজদিদিরই ফাঁড়া ?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে। প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করছিলেন, এ দুটো ফসকে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধল কেবল আমারই কপালে।

[কপালে চপেটাঘাত

নৃপবালা। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্‌টিস চলবে নাকি মুখুজ্জেমশায়। তা হলে তো আর বাঁচা যায় না।

নীরবালা। কেন ভাই, দুঃখ করিস। রোজই কি ফসকাবে। একটা-না-একটা এসে ঠিক-মতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ

নীরবালা। রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি।

রসিক। সে তো সুখের বিষয়।

নীরবালা। হাঁ। সুখ দেখিয়ে দেব। তুমি থাক হোগলার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও ? আমাদের হাতে টিকে নেই ? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ তা হলে তোমার দু-দুটো বিয়ে দিয়ে দেব ; মাথায় যে-কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না।

রসিক। দেখ্ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই তো রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হত তা হলেই তো বিপদ ঘটত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলোবামাত্র চট্‌পট্‌ শব্দে লেজ নড়ে উঠল। কিন্তু, মা বলছেন কী।

রসিক। সে যা বলছেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম। যা হোক, শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরবালা। বল কী রসিকদাদা। তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নমুনো দেখা বন্ধ ?

নৃপবালা। তোর এখনো শখ আছে নাকি।

নীরবালা। এ কি শখের কথা হচ্ছে। এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে ; যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বুঝতে কষ্ট হবে না।

নৃপবালা। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীরবালা। সেই কথাই ভালো— তুইও নিজের জন্যে ভাবিস, আমিও নিজের জন্যে ভাবব, কিন্তু রসিকদাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

অক্ষয়। অ্যাঁ, শৈল, এই বুঝি ! আজ রসিকদা হলেন রাজমন্ত্রী ! আমাকে ফাঁকি !

শৈলবালা। (হাসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখুজ্জেমশায়। পরামর্শ যে বুড়ো না হলে হয় না।

অক্ষয়। তবে রাজমন্ত্রীপদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।

গান

আমি কেবল ফুল জোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে,
বুদ্ধি আমার খেলে নাকো
পাহারা বা মন্ত্রণাতে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, আমরা যে চিরকুমার-সভার সভ্য হব— তুমি আমার বাহন হবে।

রসিক। ভগবান হরি নারীছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস তা হলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাব। কিন্তু, মা যদি টের পান ?

শৈলবালা। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু, সভায় কিরকম করে সভ্যতা করতে হয় সে আমি কিছুই জানি নে।

শৈলবালা। আচ্ছা, সে আমি চালিয়ে নেব। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি। রসিকদা, তোমার তো মার সঙ্গে কাশী গেলে চলবে না।

অক্ষয়। মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সেজন্যে ভাবনা নেই।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, তুমি তাদের কী বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে— শেষ কালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর-কি। লেজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। (কেরোসিন ল্যাম্প্‌টা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া) বেহারা কিরকম আলো দিয়ে গেছে, মিট্‌মিট্‌ করছে। ওকে ব'লে ব'লে পারা গেল না।

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশি মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্ছে নাকি। এটা তো নতুন দেখছি।

অক্ষয়। আমি বলছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেছে।

পুরবালা। ওঃ, তাই ভালো। তা, ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও।— কিন্তু রসিকদাদা, আজ কী কাণ্ডটাই করলে।

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুরবালা। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দুটো-একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভালো হত।

শৈলবালা। সে ভার আমি নিয়েছি দিদি।

পুরবালা। তা আমি বুঝেছি। তুমি আর তোমার মুখুজ্জেমশায় মিলে ক দিন ধরে যেরকম পরামর্শ চলছে একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্ছে, চিরকুমার-সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

পুরবালা। শৈল তার মধ্যে কে।

রসিক। হনুমান তো নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্ছেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে লেজে করে নিয়ে যাবেন।

পুরবালা। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। শৈল, তুই চিরকুমার-সভায় যাবি নাকি।

শৈলবালা। আমি যে সভ্য হব।

পুরবালা। কী বলিস তার ঠিক নেই। মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী।

শৈলবালা। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি।

পুরবালা। বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হতে যাচ্ছিস বুঝি। চুলটা তো কেটেইছিস, ঐটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুশি করো, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না না, তুমি এ দলে ভিড়ো না। আর যার খুশি পুরুষ হোক, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো— নইলে ব্রীচ অফ কনট্রাক্ট্‌— সে বড়ো ভয়ানক মকদ্দমা—

গান

চির-পুরানো চাঁদ,
চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ।

পুরানো হাসি পুরানো সুধা মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা,
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ।

[পুরবালার প্রস্থান

শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া

ভয় নেই! রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে— একটু অনুতাপও হবে— সেইটেই সুযোগের সময়।

রসিক।— কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছ— কোপ জিনিসটা কী, তা মুখুজ্জেমশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি। মুখুজ্জেমশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। (অত্যন্ত ত্রস্তভাবে) আবার মুখুজ্জেমশায়! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমারগুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয়। সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সব এই একটিমাত্র মুখুজ্জেমশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা। (হাসিয়া) মহাবীর হবার ঐ তো মুশকিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল নীল অঙ্গদকে তো কেউ পোঁছেও নি।

অক্ষয়। ওরে পোড়ারমুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ারমুখোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!

শৈলবালা। হাঁ গো, এত প্রেম!

অক্ষয়।— গান

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে।

অক্ষয়। আচ্ছা, তাই হবে। পঙ্গপাল ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তা হলে চট করে আমাকে একটা পান এনে দাও। তোমার স্বহস্তের রচনা।

শৈলবালা। কেন, দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে, দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে। এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈলবালা। আচ্ছা গো মশায়। পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ারমুখ আবার পুড়বে।

অক্ষয়।— গান

যারে মরণদশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের।

অক্ষয়। তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদনপত্র এবং প্রবেশিকার দশ টাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা

বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছি নে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ঐ পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈলবালা। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ, আর কিছু কি মনে রাখতে দিলে?—

গান

সকলই ভুলেছে ভোলা মন,
ভোলে নি ভোলে নি শুধু ওই চন্দ্রানন।

[শৈল ও রসিকের প্রস্থান

পুরবালার প্রবেশ

অক্ষয়। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না।

পুরবালা। আমি কি পণ্ডিতমশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি। আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়— শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

পুরবালা। ইস, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে? না? সহ্য করতে পারছ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাবছি নে। এখন তুমি দু দিন না রইলে, আরো কজন রয়েছেন, একরকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে। দেখো, ধর্মে-কর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না; স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব— তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূত কানে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে।

গান

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে
বিষ্ণুদূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে।

পুরবালা। আচ্ছা আচ্ছা, থামো।

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চলবে? উনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চললে?

পুরবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে।

পুরবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেইজন্যেই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।—

গান

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ
তাই ভাবতে বেলা অবসান।
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন;
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিনেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি—

বিরহযামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলই শাপিবে—

পুরবালা। রক্ষে করো, ও মিলটা ঐখানেই শেষ করো!

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারি নে, কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি 'আর্তনাদ-বধ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব। সখী, তার আরম্ভটা শোনো—

(সাড়ম্বরে) বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি
পুরবালা চলি যাবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয়!

পুরবালা। (সগর্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখো-না।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথা যদি বললে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা, ও কার্যটাও সুসাধ্য বলে জ্ঞান করি নে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না— ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে—
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।

কিন্তু, আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর পেলুম না? কৌতূহলে মরে যাচ্ছি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্যে। আপাতত সেই বিষ্ণুদূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্ছে। শুনেছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও জেতে, ফিরে এসে হয়তো এই ভৃত্যটিকে পছন্দ না হতেও পারে।

পুরবালা। আমি কাশী যাব না।

অক্ষয়। সে কী কথা। ভূতভাবনের যে ভৃত্যগুলি একবার মরে ভূত হয়েছে তারা যে দ্বিতীয়বার মরবে।

রসিকের প্রবেশ

পুরবালা। আজ যে রসিকদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

রসিক। ভাই, তোর রসিকদার মুখের ঐ রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে. বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুনলে তো বিবাহিত লোক? এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জানবে? সে এত রহস্যময় যে তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলে না, সে এত গভীর যে আমরাই হাতড়ে খুঁজে পাই নে— হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা। এই বুঝি!

রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম

অক্ষয়। (তাহাকে ফিরাইয়া) দোহাই তোমার, এ লোকটির সামনে রাগারাগি কোরো না— তা হলে ওর আস্পর্ধা আরো বেড়ে যাবে। দেখো দাম্পত্যতত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবত

আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয় ; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কানের কাছে মুখ আনতে গিয়ে মুখ বারংবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে— তখন তো খবর পাও না।

পুরবালা। আঃ, চুপ করো।

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে সেক্‌রা পর্যন্ত সেটা কারও অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ, থামো।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জন করে বলেন 'আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই— আমার হাড় কালি হল— আমার—

পুরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব ব'লে বসন্তনিশীথে গর্জন করেছে।

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা ? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই ? আবার সন তারিখ -সুদ্ধ মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে ? আমি কি এতবড়ো প্রতিভাশালী।

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বলতে পারে না— ওর এত ক্ষমতাই নেই— তাই উলটে বলে ; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা, বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী। তীর্থে যাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না— এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে—

মুগ্ধস্নিগ্ধবিদগ্ধলুব্ধমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং
চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ততে।

পুরবালা। সে তো খুব ভালো কথা, তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাই নে, এখন চন্দ্রচূড়চরণে চলো— তা হলে মাকে ডাকি।

রসিক। (করজোড়ে) বড়দিদিভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছেন— এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরঞ্চ এখনো নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্ছেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন— কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা, তা হলে আসি।

অক্ষয়। চললে নাকি মা ? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি—

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা। মা, আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি কেন দুঃখ করতে যাব।

অক্ষয়। বলছিলে না যে 'বড়োমা একলাই কাশী যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না' ?

রসিক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগতেই পারে, তবে কিনা মা যদি নিতান্তই—

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সামলাবে কে। ওঁকে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে-শুনতে পারতেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে-শুনে কাজ নেই। তোমার রসিকদাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা, মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্বদাই দিচ্ছি, ও তো চেপে রাখবার জো নেই— ধরা পড়তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে খড় খড় করে, তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেইজন্যেই বড়োমা, চুপচাপ করে থাকতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না।

জগত্তারিণী। আমি তা হলে হারানের বাড়ি চললুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠব; এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরা তো দিন ক্ষণ মানিস নে, ঠিক সময়ে ইস্টেশনে যাস।

পুরবালা। মা, আমি কাশী যাব না।

হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন

অক্ষয়। (শাশুড়ির মনের ভাব বুঝিয়া) সে কি হয়। তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধে হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাব।

জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিকদাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে
বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

পুরুষবেশধারী শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। কে মশায়। আপনি কে?

শৈলবালা। আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। (অক্ষয়ের সঙ্গে শেকহ্যান্ড্) মুখুজ্জেমশায়, চিনতে তো পারলে না?

পুরবালা। অবাক করলি। লজ্জা করছে না?

শৈলবালা। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ— পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখুজ্জেমশায় যদি মেয়ে সাজেন উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিকদাদা চুপ করে রইল যে?

রসিক। আহা, শৈল যেন কিশোর কন্দর্প। যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল। ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আসছি, চোখের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল; ও সুন্দরী কি মাঝারি কি চলনসই সে কথা কখনো মনেও ওঠে নি— আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর রূপখানি ধরা দিলে। পুরোদিদি, লজ্জার কথা কী বলছিস, আমার ইচ্ছে করছে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি।

অক্ষয়। (স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) সত্যি বলছি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।

শৈলবালা। (ঈষৎ বিচলিত হইয়া) আমিও না মুখুজ্জেমশায়।

পুরবালা। (শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া) এই বেশে তুই কুমার-সভার সভ্য হতে যাচ্ছিস?

শৈলবালা। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বল রসিকদাদা।

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভাই, শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়।

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখেপ'ড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কিনা।

পুরবালা। (একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তোর মুখুজ্জেমশায়কে আর এই বুড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর— আমি মার সঙ্গে কাশী চললুম।

পুরবালা জিনিসপত্র গুছাইতে গেল, এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল নীর দরজার আড়াল হইতে আর-একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া মেজদিদি বলিয়া ছুটিয়া আসিল

নীরবালা। মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন্‌ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছ।

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল

নীরবালা। (তাহাকে টানিয়া লইয়া) অমন করে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস কেন। যা মনে করছিস তা নয়, ও তোর দুষ্মন্ত নয়— ও আমাদের মেজদিদি।

রসিক।— ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌।

অক্ষয়। মূঢ়ে, তোরা কেবল চাপকানটা দেখেই মুগ্ধ। গিল্‌টির এত আদর ? এ দিকে যে খাঁটি সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে।

নীরবালা। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশি, আমাদের এই গিল্‌টিই ভালো। কী বল ভাই মেজদিদি।

শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্ছে ভাই, এখনো কোনো ট্যাকশালে গিয়ে কোনো মহারানীর ছাপটি পর্যন্ত পড়ে নি।

নীরবালা। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান করলুম। (রসিকদাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস তো ভাই ?

নৃপবালা। তা আমি রাজি আছি।

রসিকদাদাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া সে তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল
নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

শৈলবালা। আঃ, কী করছিস, আমার গোঁফ পড়ে যাবে।

রসিক। কাজ কী, এ দিকে আয়-না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীরবালা। আবার ! ফের ! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কী করতে। আচ্ছা রসিকদাদা, তোমার মাথার দুটো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী করে।

রসিক। কারও কারও মাথা পাকবার আগে মুখটা পাকে।

অক্ষয়। তা হলে আমি একবার চিরকুমার-সভার মাথায় হাত বুলিয়ে আসি।

নীরবালা।— গান

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব।
আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি—
ফিরে এলে হে বিজয়ী, হৃদয়ে বরিয়া লব।

অক্ষয়। রথ প্রস্তুত, এখন কী আনব বলো।

নীরবালা।—

আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে—
নববসন্তশোভা এনো এ শূন্যবনে।
সোনার প্রদীপে জ্বালো আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।

অক্ষয়। আর সব ভালো, কেবল তোমার ফর্দের মধ্যে সোনার প্রদীপটাই আক্‌কারা ঠেকছে। চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

নীরবালা। দিদিদের সভাটা কোন্‌ ঘরে বসবে মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীরবালা। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিইগে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করছি একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি ?

নীরবালা। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে, তবু বুঝি আশা মিটল না ?

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। কী হচ্ছে তোমাদের।

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা, উনি বলছেন ওঁর বাইরের ঘরটা ভালো করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্ছি। আয় ভাই।

নৃপবালা। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা-না— আমি যাব না।

নীরবালা। বাঃ, আমি একা খেটে মরব, আর তুমি-সুদ্ধ তার ফল পাবে সে হবে না।

নৃপকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল

পুরবালা। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেন যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস করতে চাও তা হলে ঢের দেরি আছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি। চিরকুমার-সভার ঘর

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা, যাই বল, অক্ষয়বাবু যখন আমাদের সভায় ছিলেন তখন আমাদের চিরকুমার-সভা জমেছিল ভালো। আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবু কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকতে রস কিছু বেশি জমে উঠেছিল— চিরকৌমার্যব্রতের পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয়, আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উলটো। আমাদের ব্রত কঠিন বলেই রসের দরকার বেশি। রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। চিরজীবন বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই বলেই কি সব দিক থেকেই শুকিয়ে মরতে হবে।

বিপিন। যাই বল, হঠাৎ কুমার-সভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করে অক্ষয়বাবু আমাদের সভাটাকে যে আল্‌গা করে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরো বেড়েছে। যে ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা করতে পারে তার উপরে শ্রদ্ধা থাকে না।

বিপিন। একটা সুখবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে নাকি।

বিপিন। হয়েছে বৈকি— তোমার দৌহিত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা রাখো, পূর্ণ কাল কুমারসভার সভ্য হয়েছে।

শ্রীশ। পূর্ণ! বল কী। তা হলে তো শিলা জলে ভাসল।

বিপিন। শিলা আপনি ভাসে না হে। তাকে আর-কিছুতে অকূলে ভাসিয়েছে।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, পূর্ণ যে খামকা চিরকুমার-সভার সভ্য হল তার তো কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সভায় কৈশিককর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি কোনো আকর্ষণের বালাই নেই।

বিপিন। কে বললে নেই। পর্দার আড়ালে আছে।

শ্রীশ। আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা কিরকম শুনি।

বিপিন। পূর্ণ এ সভার সভ্য হবার পর থেকে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তার দুটি চক্ষু সর্বদা ঐ দরজার দিকে পর্দাটার রহস্যভেদ করবার জন্যই নির্দিষ্ট। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি পর্দার নীচের ফাঁক দিয়ে দুখানি চরণ দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা গেল, সেই চরণের দিকে যার মন বিচরণ করে কুমার-ব্রত রক্ষা করতে গিয়ে সে বিব্রত হবে।

শ্রীশ। সেই চরণযুগলের চরম তত্ত্বটা ধরতে পারলে? যাকে একটু করে জানলে মন উতলা হয় অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ জানলে মন শান্তি পায়। চরণ দুটি কার শুনি।

বিপিন। তবে ইতিহাসটা বলি শোনো। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসঙ্গেই একটু সকাল সকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় এসেছিলেম। তিনি একটা মিটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন জ্বেলে দিয়ে গেছে, পূর্ণ বইয়ের পাত ওলটাচ্ছে, এমন সময়— কী আর বলব ভাই, সে যেন বঙ্কিমবাবুর কোন্ এক অলিখিত নভেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক কন্যে, পিঠে দুলছে বেণী—

শ্রীশ। বল কী, বল কী বিপিন।

বিপিন। শোনোই-না। এক হাতে থালায় করে চন্দ্রবাবুর জন্যে জলখাবার, আর-এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লজ্জায় মুখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট। পূর্ণর মুখ দেখেই বোঝা গেল, তার মনটা দোদুল্যমান বেণীর পিছন পিছন ছুটেছে। ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেত্রিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

শ্রীশ। বল কী বিপিন, দেখতে ভালো বুঝি।

বিপিন। দিব্যি দেখতে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো এসে পড়ে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত করে গেল।

শ্রীশ। আহা, কই আমি তো একদিনও দেখি নি। মেয়েটি কে হে।

বিপিন। আমাদের সভাপতির ভাগ্নী, নাম নির্মলা।

শ্রীশ। ভাগ্নী? সর্বনাশ! এইখানেই থাকেন?

বিপিন। সন্দেহমাত্র নেই। সভাপতিমশায় নিজে নিরোগ, কিন্তু রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে ফেরেন।

শ্রীশ। কিন্তু ভাগ্নেজামাই ব'লে বালাই নেই বুঝি?

বিপিন। সে বালাইটি অপরিণীত আকারে চিরকুমার-সভায় ঢুকে পড়েছে। পূর্ণ পরিণত আকারে যখন বেরিয়ে পড়বে তখন প্রজাপতি কুমার-সভার গুটি বিদীর্ণ করে দেবেন।

শ্রীশ। তিনি তবে কুমারী?

বিপিন। কুমারী বৈকি। কুমার-সভার মহামারী। এই ঘটনার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমার-সভায় নাম লিখিয়েছে।

শ্রীশ। পূজারি সেজে ঠাকুর চুরি করবার মতলব। আমাকেও তো ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বিপিন। নারীতত্ত্বের গবেষণা স্বাস্থ্যকর না হতে পারে।

শ্রীশ। তোমার স্বাস্থ্যের যদি ব্যাঘাত না হয়ে থাকে তা হলে আমারও—

বিপিন। আরম্ভেতে রোগের প্রবেশ ধরা পড়ে না। কিন্তু, কুমারের মার যখন ভিতর থেকে ফুটে উঠবে তখন অশ্বিনীকুমারেরও সাধ্য নেই রক্ষা করে। গোড়ায় সাবধান হওয়া ভালো।

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন। কী মশায়, আপনি কে।

প্রৌঢ় ব্যক্তি। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য, ঠাকুরের নাম ৺রামকমল ন্যায়চঞ্চু, নিবাস—

শ্রীশ। আর অধিক আমাদের ঔৎসুক্য নেই। এখন কী কাজে এসেছেন সেইটে—

বনমালী। কাজ কিছুই নয়। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়—

শ্রীশ। কাজ আপনার না থাকে আমাদের আছে। এখন, অন্য কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আলাপ-পরিচয় করতে যান তা হলে আমাদের একটু—

বনমালী। তবে কাজের কথাটা সেরে নিই।

শ্রীশ। সেই ভালো।

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরি-মশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে— তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী।

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী। আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় করছেন।

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায়। আপনাদের বিনয়গুণে আরো মুগ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মুগ্ধভাব যদি রাখতে চান তা হলে এইবেলা সরে পড়ুন। বিনয়গুণে অধিক টান সয় না।

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন।

শ্রীশ। শহরে ভিক্ষুকের তো অভাব নেই। ওহে বিপিন, তোমার আমোদ বোধ হচ্ছে, কিন্তু এরকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না।

বিপিন। পালাই কোথায়। ভগবান এঁকেও যে লম্বা একজোড়া পা দিয়েছেন।

শ্রীশ। যদি পিছু ধরেন তা হলে ভগবানের সেই দান মানুষের হাতে প'ড়ে খোয়াতে হবে।

বনমালী। আমিই যাই। [প্রস্থান

চন্দ্রমাধববাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ।

শ্রীশ। আজ্ঞে, আমি শ্রীশ।

চন্দ্রবাবু। আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারও হতাশ্বাস হবার কোনো কারণ নেই—

শ্রীশ। হতাশ্বাস? সেই তো আমাদের সভার গৌরব। এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত। আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্রবাবু। (কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া) কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্তব্য; সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্পসাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখো পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয়জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব এবং কোনো রকম শপথেও বদ্ধ হতে চাই নে। আমাদের মত এই যে, কোনো কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হওয়া ভালো।

পাশের ঘরে ঈষৎ-মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছায় দুই-একটা চাবি যে একটু ঠুন শব্দ করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

চন্দ্রবাবু। আমাদের সভ্যকে অনেকেই পরিহাস করেন ; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কৌমার্যব্রত গ্রহণ করছ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাকবে যার জন্যে কোনো কাজ করা কারও দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই-সকল পরিহাস বহন করি ; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই ?

তিনি তাঁহার তিনটিমাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন

পূর্ণ। (নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে) আছে বৈকি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ করে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা— সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি-চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরাই কি সেই দুটি-চারটি লোক তবে স্পর্ধাপূর্বক কে নিশ্চয়রূপে বলতে পারে। হাঁ, আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা টিঁকতে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারও নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতিমশায় একলামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনোই ব্যর্থ হবে না।

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধববাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্মলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল

বিপিন। আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো-এক সময়ে শুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই, কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (উৎসাহিত হইয়া) এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, কী করতে হবে। এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কী করতে হবে। বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। এক সঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিনবাবু আজ এই-যে প্রশ্ন করছেন 'কী করতে হবে', এই প্রশ্নকে নিবতে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়গণ, আপনারা উত্তর করুন কী করতে হবে।

শ্রীশ। (অস্থির হইয়া) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন 'কী করতে হবে' আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুলতে হবে, আমাদের সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেলতে হবে।

বিপিন। (হাসিয়া) সে ঢের সময় আছে, যা কালই শুরু করা যেতে পারে এমন একটা-কিছু কাজ বলো। 'মারি তো গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার' যদি পণ ক'রে বস তবে গণ্ডারও বাঁচবে, ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়াশুনো এবং শরীরমনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপর থাকবে।

শ্রীশ। এই তোমার কাজ ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি ? শেষকালে ছেলে মানুষ করতে হবে ! তা হলে নিজের ছেলে কী অপরাধ করেছে।

বিপিন। (বিরক্ত হইয়া) তা যদি বল তা হলে সন্ন্যাসীর তো কর্মই নেই ; কর্মের মধ্যে ভিক্ষে আর ভ্রমণ আর ভণ্ডামি !

শ্রীশ। (রাগিয়া) আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি

যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল।

বিপিন। (আরক্তবর্ণ হইয়া) নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে, কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সন্ন্যাসগ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগস্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্রবাবু। (চোখের কাছ হইতে কার্যবিবরণের খাতা নামাইয়া) উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অভিপ্রায় জানতে পারলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।

পূর্ণ। অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্য-বিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তা হলে বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে— অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, সভাপতিমশায় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব, কার্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল
এবং তাহার চাবি ঝন্ করিয়া উঠিল

চন্দ্রবাবু। আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন, এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারি নে, কিন্তু তার সূত্রপাত করতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হলে দেশে সস্তা দেশালাই-নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না। আমি বলছি শুধু ও জিনিসটা প্রস্তুত করার প্রণালী জানলেই তো হবে না। আমাদের দেশে যত রকম কাঠ মেলে তার মধ্যে কোন্ কাঠটা সব চেয়ে দাহ্য তার সন্ধান করা চাই।

বিপিন। দাহনতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর কিছু অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়।

চন্দ্রবাবু। তাই নাকি। কী পূর্ণ, তুমি কি দাহ্য পদার্থের পরীক্ষা করেছ নাকি।

পূর্ণ। আমার মনে হয় খ্যাংরা কাঠি জিনিসটা সস্তাও বটে অথচ—

বিপিন। হাঁ, অথচ ওটা সহজেই জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কুমার-সভায় তার পরীক্ষা সহজ নয়।

চন্দ্রবাবু। কী বলছেন বিপিনবাবু। কথাটা শুনতে পেলুম না।

বিপিন। আমি বলছিলুম, আমাদের দেশে দাহ্য পদার্থ যথেষ্ট আছে, যাতে দাহন করে এমন জিনিসেরও অভাব নেই; কিন্তু পরীক্ষাটা খুব বিবেচনাপূর্বক করা চাই।

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা বলেছেন। অনেক কাঠ আছে, যেমন শীঘ্র জ্বলে ওঠে তেমনি শীঘ্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বিপিন। আছে বৈকি।

চন্দ্রবাবু। শীঘ্র জ্বলবে, অল্প অল্প করে জ্বলবে, অনেকক্ষণ ধরে শেষ পর্যন্ত জ্বলবে, এমন জিনিসটি চাই। খুঁজলে পাওয়া যাবে না কি?

শ্রীশ। খুব পাওয়া যাবে, হয়তো দেখবেন হাতের কাছেই আছে।

পূর্ণ। পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। মশায়, প্রবেশ করতে পারি?

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া
ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন

অক্ষয়। মশায়, ভয় পাবেন না এবং এমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না। আমি অভূতপূর্ব নই, এমন-কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব— আমার নাম—

চন্দ্রবাবু। আর নাম বলতে হবে না। আসুন, আসুন অক্ষয়বাবু—

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল

বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সদ্যোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্বের চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।

অক্ষয়। পূর্ণবাবু বুদ্ধিমানের মতো কথাই বলেছেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্য লোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার-সভার ভূতটিকে সভা থেকে ঝাড়াবেন না পূর্বসম্পর্কের মমতা-বশত একখানি চৌকি দেবেন— এই বেলা বলুন।

চন্দ্রবাবু। চৌকি দেওয়াই স্থির।

একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন

অক্ষয়। সর্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম। আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বসতে বললেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাকব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না। বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ঐ তিনটে বদ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে, সুতরাং চট্‌পট্‌ কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (হাসিয়া) আপনি যখন সভ্য নন তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম নাই খাটালেম ; পান-তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব, কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই—

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়।

চন্দ্রবাবু পান-তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন

পূর্ণ 'আমি ডাকিয়া দিতেছি' বলিয়া উঠিল—

পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল

অক্ষয়। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার, কোনো প্রভেদ নেই। এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন।

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন

অক্ষয়। আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার-সভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেছেন।

চন্দ্রবাবু। (বিস্মিত হইয়া) বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন— বিবাহ সে কোনোক্রমেই করবে না, আমি তার জামিন রইলুম। তার দূর সম্পর্কের এক দাদা-সুদ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মতো সুকুমার নন, কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশি কুমার, তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে— সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

চন্দ্রবাবু। সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই, সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যাবে না— সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ-সুদ্ধই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই এক তলার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয় ; আপনাদের এই চিরকুমার-ক'টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

চন্দ্র। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া) অক্ষয়বাবু, আপনি জানেন তো আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফুল্লকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন-না, আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্য দিয়া বার বার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল

পূর্ণ। সভার স্থান-পরিবর্তনটা কিছু নয়।

অক্ষয়। কেন, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি করলেই কি আপনাদের চিরকৌমার্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে।

পূর্ণ। এ ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।

শ্রীশ। সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন। একটা কাজে প্রবৃত্ত হলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্যব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ো না। আলোক এবং বাতাস স্ত্রীজাতীয় নয়, অতএব সভার মধ্যে ও দুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরো বিবেচনা করে দেখো, এ স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতিকের চর্চা করছ করো, কিন্তু বাতের চর্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কী বল শ্রীশবাবু। বিপিনবাবুর কী মত।

শ্রীশ ও বিপিন। ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক-না।

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাবি একবার ঠুন করিল কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এখনই আসুন-না, দেখিয়ে আনি।

চন্দ্রবাবু। চলুন।

[চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়ের প্রস্থান

বিপিন। দেখো পূর্ণবাবু, সত্যি কথা বলছি তোমাকে, চিরকুমার-সভার ফ্রন্টিয়ার পলিসিতে আমরা পর্দা জিনিসটার অনুমোদন করি নে। ঐখান থেকেই শত্রুপ্রবেশের পথ।

পূর্ণ। মানে কী হল।

বিপিন। পর্দার মতো উড়ুক্ষু জিনিস, অল্প একটু হাওয়াতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, কুমার-সভার সে যোগ্য নয়।

শ্রীশ। এখানকার সীমানা রক্ষার জন্য পাকা ইঁটের দেওয়ালের মতো অচল পদার্থ চাই। ঐ পর্দাটা ভালো ঠেকছে না।

পূর্ণ। তোমাদের কথাগুলো কিছু রহস্যময় শোনাচ্ছে।

বিপিন। সে কথা ঠিক। রহস্য পদার্থটাই সর্বনেশে। চিরকুমারদের সকলের চেয়ে যে বড়ো শত্রু পর্দা-বেষ্টনীর মধ্যেই তার বাস।

শ্রীশ। আমাদের ব্রত হচ্ছে পর্দাটাকে আক্রমণ করা, তাকে ছিন্ন করে ফেলা। পর্দার ছায়ায় ছায়ায় ফেরে যে মায়ামৃগী আলো ফেললেই মরীচিকার মতো সে মিলিয়ে যাবে।

পূর্ণ। শ্রীশবাবু, মরীচিকা মেলাতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণা তো মেলায় না।

শ্রীশ। কেন মেলাবে। ওটা থাকা চাই। তৃষ্ণা না থাকলে আমাদের ছোটাবে কিসে। কেবল জানা দরকার কোন্ পথে ছুটলে ফল পাওয়া যাবে।

নেপথ্যে গান। ওগো, তোরা কে যাবি পারে।

বিপিন। একটু আস্তে। গান শুনতে পাচ্ছ না? খাসা গান বটে।

পূর্ণ। ঐ গানটাও কি পর্দা নয়। ওর আড়ালে যে রহস্য গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে পথে বিপথে ছোটাবার ক্ষমতা তারও আছে।

বিপিন। থাক্ ভাই। তত্ত্বকথাটা এখন থাক্। একটু শুনতে দাও। খুব কাছের বাড়ি থেকেই গানটা আসছে, শুনেছি অক্ষয়বাবুর বাসা ঐখানেই।

শ্রীশ। গানের কথাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যে গান

আমি ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে।
ও পারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
সূর্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে।

শ্রীশ। গানটা বোধ হচ্ছে যেন কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান। খেয়া বন্ধ হয়ে গেলেই তো মুশকিল।

বিপিন। ঐ শুনলে না বললে— 'এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে'?

পূর্ণ। তা হলে আর দেরি কেন। পারে যাবার জোগাড় করো।

শ্রীশ। গলাটা শুনে বোধ হচ্ছে পারে নিয়ে যাবে না, অতলে তলিয়ে দেবে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীশের বাসা

শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিনের বারান্দায় একখানা বড়ো হাতাওয়ালা কেদারার দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবিতে একটি গ্লাসে বরফ-দেওয়া লেমনেড ও স্তূপাকার কুন্দফুলের মালা

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। কী গো সন্ন্যাসীঠাকুর।

শ্রীশ। (উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) এখনো বুঝি ঝগড়া ভুলতে পার নি? আচ্ছা ভাই শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারি নে।

বিপিন। কেন পারবে না। কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য এই যে, কেউ-বা আমার বেলফুলের মালা গেঁথে দেবে, কেউ-বা বাজার থেকে

লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আনবে, এই তো ? তাতে ক্ষতিটা কী। যে সন্ন্যাসধর্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচু দরের সন্ন্যাস।

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সন্ন্যাসধর্ম বলতে সেইরকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোনো, তুমি কি মনে কর ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই। একজনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ আর-একজনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থই হয় তা হলে মন ব'লে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী করতে।

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কী অর্থ করছেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এইরকম— গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত-আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাকলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ, একদল কার্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরোতে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায় ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমার-সভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন। তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটিমাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিনজোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগুণ বেশি বলেই জানতেন। আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হল ?

শ্রীশ। ঐ দেখো। মানুষকে অহংকারে কী রকম মাটি করে। তুমি ঠিক করে রেখেছ, পালোয়ান বললেই তোমাকে বলা হল। তুমি কলিযুগের ভীমসেন। আচ্ছা, এসো, যুদ্ধং দেহি। একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক।

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত-কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল
বিপিন হঠাৎ 'এইবার ভীমসেনের পতন' বলিয়া ধপ করিয়া শ্রীশের কেদারাটা অধিকার করিয়া
তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল এবং 'উঃ অসহ্য তৃষ্ণা' বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল
তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া 'কিন্তু বিজয়মাল্যটি আমার' বলিয়া সেটা মাথায়
জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া পড়িল

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এইরকম সংসার পরিত্যাগ ক'রে পরিপাটি সজ্জায়, প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে, গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে বেড়ায় তাতে উপকার হয় কি না।

বিপিন। আইডিয়াটা ভালো বটে।

শ্রীশ। অর্থাৎ, শুনতে সুন্দর, কিন্তু করতে অসাধ্য। আমি বলছি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে ; তার ছাই ঝেড়ে, তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে, তার জটা মুড়িয়ে, তাকে সৌন্দর্যে এবং কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ানো এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না।

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যেরকম চেহারা গলা এবং আসবাবের প্রয়োজন আমার তো তার কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার কুণ্ডল, অন্তত চোখে যদি সোনার চশমাটা প'রে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চলতে পারবে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা।

বিপিন। না ভাই, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি, তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে তুলতে পার তা হলে খুব ভালোই হয়। তবে এরকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রীজাতির কোনো সংস্রব রাখব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুণ্ডল সবই রাখতে চাও, কেবল ঐ একটা বিষয়ে এত বেশি দৃঢ়তা কেন ?

শ্রীশ। ঐগুলো রাখছি ব'লেই দৃঢ়তা। যেজন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে কঠিন শাসনে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম অনুরাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সেজন্যেই তাঁর পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে।

শ্রীশ। আমার নিজের জন্যে লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনো একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য ? কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক, তোমরা একবার পড়লে ব্যাট্‌বল গুলিডাণ্ডা সবসুদ্ধ ঘাড়-মোড় ভেঙে পড়বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভালো নয়। সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না। সময় তো রথে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি ; কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বল্‌ছ তাকে বাহন-অভাবে ফিরতেই হবে।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

উভয়ে। এসো পূর্ণবাবু।

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটি তো মন্দ রচনা কর নি, মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভালো।

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব হতেই আমার আছে। কিন্তু দেখো পূর্ণবাবু, ঐ দেশালাই করা-টরা ওগুলো আমার ভালো আসে না।

পূর্ণ। (ফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে নাকি।

শ্রীশ। সেই কথাই তো হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম তুমি কাকে বল শুনি।

পূর্ণ। যে ধর্মে দর্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হয়, পিয়ার্স্‌ সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃক্‌পাত করতে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম তো বুড়ো হয়ে মরে গেছে। এখন নবীন সন্ন্যাসী ব'লে একটা সম্প্রদায় গড়তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন, কিন্তু তিনি তো চিরকুমার-সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চলতেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পারতেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে। এই তো ? বিনি সুতার মালা গাঁথতে হবে, কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে।

শ্রীশ। স্বদেশের। কথাটা কিছু উচ্চ শ্রেণীর হয়ে পড়ল, কী করব বলো, মালিনী মাসি এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ— কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণবাবু—

পূর্ণ। ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্ছে না— ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খট্‌খটে শুকনো।

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার-সভা থেকে এমন-একটি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি শিক্ষা ও কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার -খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে—

পূর্ণ। অর্থাৎ, মনোহরণ এবং প্রাণহরণ দুই কর্মেই মজবুত হবে। পুরুষ দেবীচৌধুরানীর দল আর-কি।

শ্রীশ। বঙ্কিমবাবু আমার আইডিয়াটা পূর্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন, কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতিমশায় কী বলেন।

শ্রীশ। তাঁকে ক'দিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু, তিনি তাঁর দেশালাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে, এক টাকা ক'রে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড়ো বড়ো পল্লীতে নূতন নিয়মে এক-একটা দোকান বসিয়ে আসবে— ভারতবর্ষের চারি দিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাবুর কী মত।

বিপিন। যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ব'লে জ্ঞান করি নে, কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজতে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজতে খরচ আছে মশায়। কেবল কৌপীন নয় তো, অঙ্গদ কুণ্ডল আভরণ কুন্তলীন দেলখোশ—

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর চিরকুমার-সভা সন্ন্যাসীসভা হবেই। আমরা এক দিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শৌর্য এবং ললিত সৌন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব, সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে—

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু— কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়। এবং তাকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে। তার কী উপায় করলে।

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ, নরজাতিকে তিনি লতারমতো বেষ্টন করে ধরেন। যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাকত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই— পাণিগ্রহণ করে ফেললে নিজের পাণিকেও বদ্ধ করে ফেলতে হবে, সে হলে চলবে না পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শুভবিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসি নি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, মনুষ্যজন্ম আর পাব কি না সন্দেহ, অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর-কিছু জুটবে কি। মুসলমানের স্বর্গে হুরী আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর-কিছু পাওয়া যাবে কি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু বল কী। তুমি যে—

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনো মরিয়া হয়ে উঠি নি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ঐ ফুলের গন্ধ কি কৌমার্যব্রত-রক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়াই ভালো বোধ করি ; চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্‌দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে। যাই হোক, যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর তো আমিও যোগ দেব— কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন ? কী হয়েছে ?

পূর্ণ। অক্ষয়বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করছেন, এটা আমার ভালো ঠেকছে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিসটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে, এ-সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে। ভালোই হবে, যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে, চিরকুমার-সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি— অক্ষয়বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কী অনিষ্ট করতে পারেন। কেবল গলির এক নম্বর থেকে আর-এক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে-পথে দেশে-দেশে সঞ্চরণ করে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্‌বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু— বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড়ো কাজ হয় না।

বিপিন। দিনকতক দেখাই যাক-না। যদি কোনো অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে— আমাদের সেই অন্ধকার বিবরটি ফস্ করে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধববাবুর সবেগে প্রবেশ। তিনজনের সসম্ভ্রমে উত্থান

চন্দ্রবাবু। দেখো, আমি সেই কথাটা ভাবছিলুম—

শ্রীশ। বসুন।

চন্দ্রবাবু। না না, বসব না, আমি এখনই যাচ্ছি। আমি বলছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কিংবা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কিরকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে— ডাক্তার রামরতনবাবু ফি রবিবারে আমাদের দু ঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু, তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্রবাবু। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়— আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসুন—

চন্দ্রবাবু। না শ্রীশবাবু, বসতে পারছি নে, আমার একটু কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে— গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবার গ্রীষ্মের অবকাশে কেদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—

চৌকি অগ্রসর-করণ

চন্দ্রবাবু। না না, আমি এখনই যাচ্ছি। দেখো, আমার মত এই যে, এই-সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যেরকম আন্দোলন হবে বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকালের ঢেঁকি-ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে—

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসবেন না কি।

চন্দ্রবাবু। থাক্-না। একবার ভেবে দেখো, আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসছি, উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কল-কারখানা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, না তার সম্বন্ধে চিন্তা করলুম। যা ছিল তা তেমনিই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি— ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল

পথের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে— কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক।— ক'টা বাজল শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্রবাবু। তা হলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য-সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু, তা হলে আমার দুই-একটা কথা বলবার আছে—

চন্দ্রবাবু। না, আজ আর সময় নেই—

পূর্ণ। বেশি কিছু নয়, আমি বলছিলুম আমাদের সভা—

চন্দ্রবাবু। সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। কিন্তু কালই তো সভা বসছে—

চন্দ্রবাবু। আচ্ছা, তা হলে পরশু। আমার সময় নেই—

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয়বাবু যে—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে।— কিন্তু দেখো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার-সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তা হলে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না, অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে—

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্রবাবু। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সেদিন একটি কথা যা বললেন সেও আমার মন্দ লাগল না। তিনি বলেন, চিরকুমার-সভার সংস্রবে আর-একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ-সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমত কোনো-না-কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে— এইটে হচ্ছে সাধারণ ব্রত। আমাদের এক দল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর-এক দল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য -অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটক-সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ-প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে ; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন— তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে, হন্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না—

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, যদি বসেন তা হলে একটা কথা—

চন্দ্রবাবু। না, আমি বলছিলুম, যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে ; শিলালিপি তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে— অতএব প্রাচীন-লিপি-পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত—

চন্দ্রবাবু। না না, আমি বলছি নে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোনো কালে শেষ হবে না। অভিরুচি-অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউ-বা একটা কেউ-বা দুটো-তিনটে শিক্ষা করব—

শ্রীশ। কিন্তু, তা হলেও—

চন্দ্রবাবু। ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরোতে পারব। যারা চিরজীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে ; যাঁরা টিঁকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর-কোনো সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্ছে—

চন্দ্রবাবু। না পূর্ণবাবু, আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। পূর্ণবাবু, আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আপাতত মনে হতে পারে অসাধ্য, কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য

বটে— তা, ভালো কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু, আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিস—

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোটো মনে করে উপেক্ষা করি নে এবং বড়ো কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করি নে—

পূর্ণ। কিন্তু, সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও—

চন্দ্রবাবু। সে-সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু। আজ তবে চললুম।

[প্রস্থান

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে। এক মাতালের মাতলামি দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে, কেবল বকাবকি করে। কখনো বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু, হঠাৎ পালাচ্ছ যে?

পূর্ণ। সভাপতিমশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি, পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো-একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উলটো হবে। তাঁর যে-ক'টা কথা বাকি আছে সেইগুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। ভালো আছেন শ্রীশবাবু। বিপিনবাবু ভালো তো? এই-যে পূর্ণবাবুও আছেন দেখছি। তা, বেশ হয়েছে। আমি অনেক ব'লে ক'য়ে সেই কুমারটুলির পাত্রী দুটিকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা একটা গুরুতর কিছু করে ফেলব।

পূর্ণ। আপনারা বসুন শ্রীশবাবু। আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তার চেয়ে আপনি বসুন পূর্ণবাবু। আপনার কাজটা আমরা দুজনে মিলে সেরে দিয়ে আসছি।

পূর্ণ। তার চেয়ে তিন জনে মিলে সারাই তো ভালো।

বনমালী। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন দেখছি। আচ্ছা, তা আর-এক সময় আসব।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

চন্দ্রমাধববাবু নির্মলা

চন্দ্রবাবু। নির্মল।

নির্মলা। কী মামা।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্ছি নে।

নির্মলা। বোধ হয় ঐখানেই কোথাও আছে।

চন্দ্রবাবু। (নিশ্চিন্তভাবে) একবার খুঁজে দেখো তো ফেনি।

নির্মলা। তুমি কোথায় কী ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি!

চন্দ্রবাবু। (মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হওয়ায়, স্নিগ্ধকণ্ঠে) তুমিই তো পার নির্মল। আমার সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে এত ধৈর্য আর কার আছে?

নির্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল— নিঃশব্দে সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্মলার কাছে আসিলেন। নির্মলার মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন

(মৃদুহাস্যে) নির্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখছি যেন। কী হয়েছে বলো দেখি।

নির্মলা। (ক্ষুব্ধস্বরে) এতদিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন। আমি কী করেছি।

চন্দ্রবাবু। (আশ্চর্য হইয়া) চিরকুমার-সভা থেকে তোমাকে বিদায়? তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কী।

নির্মলা। দরজার আড়ালে থাকলে বুঝি যোগ থাকে না? অন্তত সেই যতটুকু যোগ তাই বা কেন যাবে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, তুমি তো এ সভার কাজ করবে না, যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই—

নির্মলা। আমি কেন কাজ করব না। তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্যে যোগ দিতে পারব না। তবে আমাকে এতদিন শিক্ষা দিলে কেন। নিজের হাতে আমার সমস্ত মন প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কী বলে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, এক সময়ে তো বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে, চিরকুমার-সভার কাজ—

নির্মলা। বিবাহ আমি করব না।

চন্দ্রবাবু। তবে কী করবে বলো।

নির্মলা। দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।

চন্দ্রবাবু। আমরা তো সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি।

নির্মলা। ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয় নি।

চন্দ্রমাধববাবু নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত-গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না। আমি তোমাদের কৌমার্যসভার কেন সভ্য না হব।

চন্দ্রবাবু। (দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে) অন্য যাঁরা সভ্য আছেন—

নির্মলা। যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন, তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না। তা যদি হয় তা হলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কখুস্ক করিয়া তুলিলেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল নির্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধববাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া দিল— চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোনো খবর লইলেন না— চুলের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ককুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। নির্মলার প্রস্থান

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখলেন। আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হচ্ছে না।

চন্দ্রবাবু। আজ আর-একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণবাবু তোমার সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জান?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী ?

চন্দ্রবাবু। হাঁ, তাঁর নাম নির্মলা। আমাদের চিরকুমার-সভার সঙ্গে তার হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী।

চন্দ্রবাবু। আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে। স্ত্রীলোক হয়ে তিনি—

চন্দ্রবাবু। আমিও সেই কথা ভাবছি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে— আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করছি।

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমারও কি ঐ মত।

পূর্ণ। কী মত বলছেন ?

চন্দ্রবাবু। অর্থাৎ, যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন।

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর, তাঁদের উৎসাহে আমাদের উদ্দীপনা। পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মতো মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। তা তো পারে পূর্ণবাবু, কিন্তু, সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু। না না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে।

শ্রীশ। গলায় তো একটা বোতাম লাগানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, আরো কি প্রয়োজন আছে। যদি-বা থাকে, আর ছিদ্র পাবেন কোথা।

চন্দ্রবাবু। (গলায় হাত দিয়া) তাই তো !— আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি, এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভালো, কী বল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। সে বেশ কথা, কিন্তু এ দিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?

চন্দ্রবাবু। না, এখনো সময় আছে। শ্রীশবাবু, তোমরা একটু বোসো-না, কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একটি ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্মলা—

পূর্ণ হঠাৎ কাশিয়া লাল হইয়া উঠিল

আমাদের কুমার-সভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল।

শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুকভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল

এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া
চন্দ্রবাবুও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন

এ কথা আমি ভালোরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি, স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্যের মহৎ অবলম্বন। কী বল পূর্ণবাবু ?

পূর্ণ। (নিস্তেজভাবে) তা তো বটেই।

চন্দ্রবাবু। (হঠাৎ সবেগে) নির্মলা যদি কুমার-সভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে, তা হলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন।

পূর্ণ। বলেন কী চন্দ্রবাবু।

শ্রীশ। আমরা কখনো কল্পনা করি নি যে, কোনো স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই—

বিপিন। নিষেধও নেই।

শ্রীশ। স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সভার যে-সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।

বিপিন। আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয়, এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যেরকম পারবেন তুমি সেরকম পারবে না, এবং তুমি যেরকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সেরকম পারবেন না— অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেমনি দরকার।

শ্রীশ। যারা কাজ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ আমি তত বৃহৎ মনে করি নে।

বিপিন। আমাদের সভার কার্যক্ষেত্র অন্তত এতটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ করেছে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে, তা হলে আরো একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন।

শ্রীশ। উদারতা অতি উত্তম জিনিস, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাই নে, বিভক্ত করতে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না, এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক, উদরটা পরিপাক করতে থাক্— পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশচেষ্টা না করলেই বস্।

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিন্ন করে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর-এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না।

শ্রীশ। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল। উপমা কেবল খানিক দূর পর্যন্ত খাটে—

বিপিন। অর্থাৎ, যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

পূর্ণ। (অত্যন্ত বিমনা হইয়া) বিপিনবাবু, আমার মত এই যে, আমাদের এই-সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য নষ্ট হয়।

চন্দ্রবাবু। (একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া) মহৎ কার্যে যে মাধুর্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য সযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য নয়।

শ্রীশ। না চন্দ্রবাবু, আমি ও-সব সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা আনছিই নে। সৈন্যদের মতো এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্বলতা বশত যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।

এমন সময় নির্মলা অকুণ্ঠিত মর্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল
হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র

নির্মলা। আপনাদের কী উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কত দূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানি নে, কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি— তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছেন।

শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত-অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত-গম্ভীর, চন্দ্রবাবু সুগভীর চিন্তামগ্ন

নির্মলা। (পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া) আমি যদি কাজ করতে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু, মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শুভচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন। আপনারা আমাকে কী জানেন।

শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্মাক্ত

নির্মলা। আমি আপনাদের কুমার-সভা বা অন্য কোনো সভা জানি নে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমার-সভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমার-সভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই তা হলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এঁরা আমাকে কী জানেন। এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে তর্ক করছেন।

শ্রীশ। (বিনীত মৃদুস্বরে) মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোনো তর্ক করি নি, আমি সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই বলছিলুম।

নির্মলা। আমি স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে— আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশি আমার আর-কিছু জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন
পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল—
কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না

পূর্ণ। (মনে মনে অনেক আবৃত্তি করিয়া) দেবী, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না, পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা
গদ্যের মধ্যে পদ্যের মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল—
লজ্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল

বিপিন। (স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্ত স্বরে) পৃথিবী যত বেশি পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধনকার্য তত বেশি পবিত্র।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়মমত প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্মলা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল

চন্দ্র। (হঠাৎ) ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা?
নির্মলা। (সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে) গলাতেই আছে।
চন্দ্র। (গলায় হাত দিয়া) হাঁ হাঁ, আছে বটে।

তিন ছাত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

নৃপবালা ও নীরবালা

নৃপবালা। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্ছিস বল্ তো নীরু।
নীরবালা। আমাদের বাড়ির যত কিছু গাম্ভীর্য সব বুঝি তোর একলার? আমার খুশি আমি গম্ভীর হব।
নৃপবালা। তুই কী ভাবছিস আমি বেশ জানি।

নীরবালা। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কী ভাই। এখন তোর নিজের ভাবনা ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপবালা। (নীরর গলা জড়াইয়া) তুই ভাবছিস, মাগো মা, আমরা কী জঞ্জাল— আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা এত ঝঞ্ঝাট।

নীরবালা। তা, আমরা তো ভাই, ফেলে দেবার জিনিস নয় যে অমনি ছেড়ে দিলেই হল। আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গামা হচ্ছে সে তো গৌরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস গৌরীর বিয়ের জন্য একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যদি কোনো কবির কানে ওঠে তা হলে আমাদের বিবাহের একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপবালা। না ভাই, আমার ভারি লজ্জা করছে।

নীরবালা। আর, আমার বুঝি লজ্জা করছে না ? আমি বুঝি বেহায়া ? কিন্তু কী করবি বল্। ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর-বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লজ্জাও করে, প্রাইজও ছাড়ি নে, আমার এই স্বভাব।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, এবারে যে প্রাইজটার কথা চলছে সেটার জন্যে তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস।

নীরবালা। কোন্‌টা বল্ দেখি। চিরকুমার-সভার দুটো সভ্য ?

নৃপবালা। যেই হোক-না কেন, তুই তো বুঝতে পারছিস।

নীরবালা। তা ভাই সত্যি কথা বলব ? (নৃপর গলা জড়াইয়া কানে কানে) শুনেছি কুমার-সভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না— নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই তো সেই যুগল দেবতার জন্যে এত পূজার আয়োজন করছি ভাই। জোড়হস্তে মনে মনে বলছি, হে কুমার-সভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে এক বোঁটার দুই ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ করো।

বিরহসম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল
এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্ দেখি। আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে।

নীরবালা। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তা হলে কি ছেড়ে যাই। ভাই, ওঁর তো স্বামী নেই, আমাদেরও নাহয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশি সুখে আমাদের দরকার কী।

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ

নীরবালা। (টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া) আমরা দুই স্বয়ম্বরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।

শৈলবালাকে প্রণাম করিল

শৈলবালা। ও আবার কী।

নীরবালা। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতিনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি সেজদিদি আমার সঙ্গে পারবে না— আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বলছি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি আর কোথাও পাব। কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস।

নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল

শৈলবালা। (তাহার চোখ মুছিয়া দিয়া) ও কী ও নৃপ, ছি। তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস। আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর-কারও হাতে তোদের দিতে পারতুম।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। ভাই, আমার মতো অসভ্যটাকে তোরা সভ্য করলি— আজ তো সভা এখানে বসবে, কিরকম করে চলব শিখিয়ে দে।

নীরবালা। ফের পুরোনো ঠাট্টা? তোমার ঐ সভ্য-অসভ্যর কথাটা এই পরশু থেকে বলছ।

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুতের কন্যার মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। হয়েছে কী, যতদিন চিরকুমার-সভা টিকে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দু বেলা শুনতে হবে।

নীরবালা। তবে ওটাকে তো একটু সকাল-সকাল সেরে ফেলতে হচ্ছে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়— রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোনো হতে দেব না, চিরকুমার-সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব। তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কিরকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস?

শৈলবালা। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যেরকম মাথায় আসে।

নীরবালা। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। 'আমি কি ডরাই সখী কুমার-সভারে। নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?'

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

শৈলবালা। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো দেখি যে দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে।

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্জেমশায়, কালিদাস।

অক্ষয়। না, আরো একজন বড়োলোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীরবালা। ডাল দুটি কে।

অক্ষয়। (বামে নীরকে টানিয়া) এই একটি (দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া) এই আর-একটি।

নীরবালা। আর, কুড়ুল বুঝি আজ আসছে?

অক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ-যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দৌড় দৌড়। শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল
চুড়িবালার ঝংকার এবং ত্রস্ত পদপল্লব কয়েকটির দ্রুত পতন শব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

অক্ষয়। পূর্ণবাবু এলেন না যে?

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আসতে পারলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন, আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধ মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই। কাছাকাছি এমন স্থানও আছে, যেখানে কুমার-সভার অধিবেশন কোনোমতেই প্রার্থনীয় নয়।

[অক্ষয়ের প্রস্থান

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরে দুটি দীপ জ্বলিতেছে
সেই দুটিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজ রঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি
মৃদু এবং রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো

বিপিন। (ঈষৎ হাসিয়া) যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার-সভার উপযুক্ত নয়।
শ্রীশ। (চকিত হইয়া) কেন নয়।
বিপিন। ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশি বোধ হচ্ছে।
শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে বেশি কিছু হতে পারে না।
বিপিন। কেবল নারী ছাড়া।
শ্রীশ। হাঁ, ঐ একটিমাত্র।

অন্য দিনের মতো কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না

বিপিন। দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচরকমে এ ঘরটিতে সেই নারীজাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।
শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্বত্রই আছে।
বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোনোখানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষমানুষের নিষ্কৃতি পাবার জো নেই।
শ্রীশ। (হাসিয়া) কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসার সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।
বিপিন। বেচারা চিরকুমার ক'টির জন্যে একটা কোনো ফাঁক রাখে নি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।
শ্রীশ। এই দেখো-না।

কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল

বিপিন। (কাঁটা দুটি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া) ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।
শ্রীশ। ফুলও আছে, কাঁটাও আছে।
বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ অপর কোণের ছোটো বইয়ের শেলফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল— কতকগুলি নভেল
কতকগুলি ইংরাজি কাব্যসংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল
মার্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা— তখন গোড়ার পাতাটা উলটাইয়া দেখিল
দেখিয়া একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল

বিপিন। নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষমানুষের নয়। কী বোধ কর।
শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্যজাতীয় বলে ঠেকছে হে।

আর-একটা বই দেখাইল

বিপিন। নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমার-সভায়—
শ্রীশ। কুমার-সভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখি নে।
বিপিন। পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল, রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।
শ্রীশ। কি রকম।
বিপিন। লক্ষ্য করে দেখ নি বুঝি?
শ্রীশ। না না, ও তোমার অনুমান।
বিপিন। হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিস— না যায় দেখা, না যায় ধরা।
শ্রীশ। পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?
বিপিন। না, এ-সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোনো লেক্‌চার চলে না।

শ্রীশ। এ বাড়ির দরজায় ঢুকতেই রসিক চক্রবর্তী বলে যে বৃদ্ধ যুবকটির সঙ্গে দেখা হল তাঁকে চিরকুমার-সভার দ্বারীর উপযুক্ত বলে বোধ হল না।

বিপিন। মনে হল শিবের তপোবন আগলাবার জন্য স্বয়ং পঞ্চশর নন্দীর ছদ্মবেশে এসেছেন, লোকটাকে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে, আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলুম।

বিপিন। পূর্ণবাবুর যেরকম দুর্বল অবস্থা দেখছি পূর্ব হতেই তাঁর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবুকে তো বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না।

অক্ষয় ও রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। মাপ করবেন। এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি।

রসিক। (হাসিয়া) আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়—

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন— ক্রমশ পরিচয় পাবেন। ইনিই হচ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবর্তী।

রসিক। পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্যপালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়, তার পরে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ'।

[অক্ষয়ের প্রস্থান

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু ঝাপসাভাবে তাহাকে দেখিলেন—
বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল
শৈলের পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল
শৈল ছোটো ছোটো রুপার থালাগুলি লইয়া সাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল

রসিক। ইনি আপনাদের সভার আর্-একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোনো তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেছেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েছেন দেখছি— হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম— ইনি বালক নন।

চন্দ্রবাবু। এঁর নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ। অবলাকান্ত?

রসিক। নামটি আমাদের সভায় চলতি হবার মতো নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই— যদি পরিবর্তন করে বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে 'স্বনামা পুরুষো ধন্য'— কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ। বলেন কী মশায়। নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয় যে, বদল করলেই হল।

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশবাবু, নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন-না কেন, অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত— পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত। দেখুন, নামটাকে আপনারা বেশি সত্য মনে করবেন না; ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত না'ও বলেন উনি লাইবেলের মকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ। (হাসিয়া) আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্ছেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম— কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না, নাম ভুল করব না মশায়।

রসিক। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন ; সেইজন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বলতে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি এ-সমস্ত কী আয়োজন করেছেন। আমাদের সভার কার্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন করেছেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শৈল। (থালা সাজাইতে সাজাইতে) শ্রীশবাবু, আহারটাও কি আপনাদের নিয়মবিরুদ্ধ।

শ্রীশ। (বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিয়া) এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।

বিপিন। নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্তবাবু, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিস মাত্রই নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে ; ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ করেছেন এ সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না ; এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। তোমার হল কী বিপিন। তোমাকে খেতে দেখেছি বটে, কিন্তু এক নিশ্বাসে এত কথা কইতে শুনি নি তো।

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরস বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায় ?

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।

নূতন ঘরের বিলাসসজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার
উৎসাহস্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্যবিবরণের খাতা
ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুর সম্মুখে গিয়ে) সভার কার্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি তো মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, কিছু জলযোগ—

চন্দ্রবাবু। এ-সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই।

রসিক। আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখুন, মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য রোধ হয় তা হলে—

বিপিন। (মৃদুস্বরে) তা হলে ভবিষ্যতে নাহয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালালেই হবে।

শ্রীশ। আসুন রসিকবাবু। আপনি উঠছেন না যে ?

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার-সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু—

শৈলবালা। 'কিন্তু' আবার কী রসিকদাদা। তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি।

রসিক। দেখছেন মশায় ! নিয়ম আর-কারও বেলায় নয়, কেবল রসিকদাদার বেলায়। নাঃ, 'বলং বলং বাহুবলম্'। উপরোধ-অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজনপাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না ?

শৈলবালা। না, আমি পরিবেশন করব।

শ্রীশ। সে কি হয়।

শৈলবালা। আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুশি হব।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এটা কি ঠিক হচ্ছে।

রসিক। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। উনি পরিবেশন করতে ভালোবাসেন, আমরা আহার করতে ভালোবাসি, এরকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে।

সকলের আহার

শৈলবালা। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারি আছে। জলের গ্লাস খুঁজছেন? এই-যে গ্লাস।

চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল, তিনি সেটাকে ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না— অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশ্যক আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজনব্যাপারটি নির্বিঘ্ন করিতে লাগিল

চন্দ্রবাবু। শ্রীশবাবু, স্ত্রীসভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেছেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিন। সমাজকে অনেক সময় শিশুর মতো গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চললে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

শ্রীশ। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতির আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে-সকল কার্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিকবাবু কী বলেন।

রসিক। অবস্থাগতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি— স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য সুবিধা যদিবা না'ও হয় তবু বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা করে দেখুন, চিরকুমার-সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তা হলে গোপনে এই সভাটিকে নষ্ট করবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাকত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—

শৈলবালা। কুমার-সভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিকদাদা কোথায় পেলে।

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই। একচক্ষু হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল— কুমার-সভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কানা হন তা হলে সেই দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদুস্বরে) একচক্ষু হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েছেন, একটি সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্রবাবু। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায় তারা এক পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যই খানিক দূর গিয়ে তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত— সেইজন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি। দেখো অবলাকান্তবাবু, এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো করে মনে করে রেখো— স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নিচু করে রাখি তা হলে তারাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা হলে তাদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়, দু পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি তা হলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লজ্জাবোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

শৈলবালা। আশীর্বাদ করুন আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। আমার ভাগ্নী নির্মলাকে কুমার-সভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই?

রসিক। আর-কোনো আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমার-সভায় কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা হলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈলবালা। বোপদেবের অভিশাপ এ কালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অন্তত লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চলতে হবে? আমি তো বোধ করি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষসভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্তন করে আসেন তা হলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা হলে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাতনী বলে কারও হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

শৈল অদূরবর্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল

চন্দ্রবাবু। দেখুন রসিকবাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার-সভার অর্থের যদি পরিবর্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কী।

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই— তা নামপরিবর্তন বা বেশপরিবর্তন যাই হোক-না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইল না

রসিক। আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ। কিছু না— অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চলত, আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশি হয়েছে। আজ তা হলে এইখানেই সভা ভঙ্গ করা হোক, কারণ এর পরে আর-কোনো আলোচনা চলবে না। এ দিকে দেরিও হয়ে গেছে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয়, নীর ও নৃপ

নীরর গান

যেতে দাও গেল যারা।
তুমি যেয়ো না, যেয়ো না—
আমার, বাদলের গান হয় নি সারা।
কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার,
নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল—
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।

অক্ষয়। হল কী বলো দেখি। আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়ু বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দুবেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চলবীজনে চঞ্চল হয়ে উঠছে যে।

নীরবালা। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ ব'লে দয়া ক'রে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাবদিহি ?

অক্ষয়। দয়াময়ী চোর, শূন্য হৃদয়টা চুরি করবার জন্যে শূন্য ঘরে উঁকিঝুঁকি ? মতলব কি বুঝি নে ?

গান

ওগো দয়াময়ী চোর ! এত দয়া মনে তোর !
বড়ো দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর !
বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শূন্য হৃদয় মোর।

নীরবালা। আমাদের এমন বোকা চোর পাও নি। এখন হৃদয় আছে কোথায় যে চুরি করতে আসব।

অক্ষয়। ঠিক করে বলো দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কত দূরে।

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্জেমশায়। বলব ? ৪৭৫ মাইল।

নীরবালা। সেজদিদি অবাক করলি। তুই কি মুখুজ্জেমশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটেছিলি নাকি।

নৃপবালা। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইম্‌টেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়। গান

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া,
বেগে বহে শিরা ধমনী।
হায় হায় হায় ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী।
বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেণী দুলে চঞ্চল—
এ কী রে রঙ্গ, আকুল-অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গগমনী।

নীরবালা। কবিবর, সাধু সাধু। কিন্তু, তোমার রচনায় কোনো কোনো আধুনিক কবির ছায়া দেখতে পাই যেন।

অক্ষয়। তার কারণ, আমিও অত্যন্ত আধুনিক। তোরা কি ভাবিস তোদের মুখুজ্জেমশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুনে দিচ্ছিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল ? তা হলে আর বিদুষী শ্যালী থেকে ফল হল কী। এতবড়ো আধুনিকটাকে তোদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয় ?

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐরকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্যরকম ঠেকেছিল। তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন।

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকত তা হলে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হত। আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা ?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কী করছিলে।

অক্ষয়। তোদের গয়লাবাড়ির দুধের হিসেব লিখছিলুম।

নীরবালা। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লাবাড়ির হিসেব ? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর-নবনীর অংশটাই বেশি।

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না না, ওটা নিয়ে গোল করিস নে, আহা, দিয়ে যা—

নৃপবালা। নীরুভাই, জ্বালাস নে, চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে— ওখানে শ্যালীর উপদ্রব সয় না। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, তুমি দিদিকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন কর বলো-না।

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন করে থাকি—

নৃপবালা। আজ কী করেছ বলো দেখি।

অক্ষয়। শুনবে? তবে সখী, শোনো। চঞ্চলচকিতচিত্তচকোরচৌর চঞ্চুচুম্বিতচারুচন্দ্রিকরুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীরবালা। চমৎকার চাটুচাতুর্য।

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি নেই, চর্বিতচর্বণশূন্য।

নৃপবালা। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, রোজ রোজ তুমি এইরকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরি হয়?

অক্ষয়। ঐজন্যেই তো নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না। ভগবান যে আমাকে সদ্য সদ্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটাতে দিলে না। ভগ্নীপতির কথা বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বলো দেখি।

নীরবালা। রাগ কোরো না, শান্ত হও মুখুজ্জেমশায়, শান্ত হও। সেজদিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে, এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করেছিলুম

নৃপবালা। তার পরে?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উলটো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল— সেই অবধি স্তবরচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ? কী স্তব লিখেছিলে মুখুজ্জেমশায়, আমাদের শোনাও-না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট্ করবি।

নৃপবালা। না, আমরা দিদিকে বলে দেব না।

অক্ষয়। তবে অবধান করো।

গান

মনোমন্দিরসুন্দরী।
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।
রোষারুণরাগরঞ্জিতা
গোপনহাস্য -কুটিল-আস্য-
কপটকলহগঞ্জিতা।
সংকোচনত-অঙ্গিনী।
চকিতচপল- নবকুরঙ্গ-
যৌবনবনরঙ্গিণী।
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা।
লুব্ধ-পবন -ক্ষুব্ধ লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।
চুম্বনধনবঞ্চিনী।
রুদ্ধ কোরক- সঞ্চিত মধু-
কঠিনকনককঞ্জিনী।

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হোন।

নীরবালা। কেন, এত অপমান কেন। দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বুঝি তার ঝাল ঝাড়তে হবে ?

অক্ষয়। এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। আরে দুর্বৃত্তে, এখনই লোক আসবে।

নৃপবালা। তার চেয়ে বলো-না দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে।

নীরবালা। তা, আমরা থাকলেমই বা, তুমি চিঠি লেখো-না, আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব না কি।

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌঁছয় না। না, ঠাট্টা নয়, পালাও। এখনই লোক আসবে— ঐ একটি বৈ দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপবালা। এই সন্ধেবেলায় কে তোমার কাছে আসবে।

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো, তারা নয়।

নীরবালা। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না, তুমি আজকাল সেটা বেশ বুঝতে পারছ, কী বল মুখুজ্জেমশায়। দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়।—

গান

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন।
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,
কুঞ্জে পূর্ণিমা-চাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।

অক্ষয়। সংগ্রহ হল কোথা থেকে।

নীরবালা। তোমারই শ্রীমুখ থেকে।

অক্ষয়। অবশেষে বিরহের দিনে আমারই শ্রীবক্ষে হানতে এসেছিস। আচ্ছা, তা হলে দয়া করিস নে, একেবারে শেষ করে দে।

নীরবালা।—
আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধারা—
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা
পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা।
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন ?

সহসা শ্রীশের প্রবেশ

'মাপ করবেন' বলিয়া পলায়নোদ্যম। নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান

অক্ষয়। এসো এসো শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি, কিন্তু অপরাধটা কী আগে বলো।

শ্রীশ। খবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যুনিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন নাহয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি, তা হলেই হল।

অক্ষয়। তাই বললেম। তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার। শ্রীশবাবু, স্বয়ং বিধাতা সর্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোসো, অবলাকান্তবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না। [প্রস্থান

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক জোড়া মায়াস্বর্ণমৃগী ছুটে পালালো। ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ, তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই। নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল।

রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ। সন্ধেবেলায় এসে আপনাদের তো বিরক্ত করি নি রসিকবাবু?

রসিক। ভিক্ষুকক্ষে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ? শ্রীশবাবু, আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এতবড়ো হতভাগ্য।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু বাড়ি আছেন তো?

রসিক। আছেন বৈকি। এলেন ব'লে।

শ্রীশ। না না, যদি কাজে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই— আমি কুঁড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুঁড়ে, এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সম্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ। এই কুঁড়ে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধেবেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা-চারটে। আর সন্ধেবেলাটা, সত্যি কথা বলছি, চিরকুমার-সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্‌মুখ সৃজন করেন নি। কী বলেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈকি। সন্ধ্যা চিরকুমার-সভার অনেক পূর্বেই সৃজন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবুর নিয়ম মানে না—

রসিক। সে যে-চন্দ্রের নিয়ম মানে, তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি, হাসবেন না শ্রীশবাবু, আমার এক তলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে; শুক্লসন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো। শুভ্র একটি হংসদূত কোন্ বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে—

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্‌-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গারচিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনীম্‌॥

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাবু, চমৎকার। কিন্তু ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনুস্বার-বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

রসিক। বাংলায় একটা তর্জমাও করেছি; পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি— শুনবেন শ্রীশবাবু?—

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর—
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়,
কিশলয়পাখাখানি দোলাইব গায়?

শ্রীশ। বা বা, রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত আছে তা তো জানতুম না।

রসিক। কী করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু, এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই।

শ্রীশ। আহাহা রসিকবাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ অলিন্দ-ওয়ালা কুঞ্জকুটিরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু। শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী। সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে!

রসিক। দেখি দেখি। তাই তো। দুর্লভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি। বাঃ, দিব্য গন্ধ। শ্লোকের লাইনটা বদলাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক গে— বাসন্তীনবপরিমলোদ্গাররুমালাং। শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে তো আমাদের কুমার-সভার পতাকা নির্মাণ চলবে না। দেখেছেন কোণে একটি ছোট্ট 'ন' অক্ষর লেখা রয়েছে?

শ্রীশ। কী নাম হতে পারে বলুন দেখি। নলিনী? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা? ভয়ংকর মোটা। নীহারিকা? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলুন-না রসিকবাবু, আপনার কী মনে হয়।

রসিক। নাম মনে হয় না মশায় আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত 'ন' আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, 'ন'য়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে— নির্মলনবনীনিন্দিতনবীন— বলুন-না শ্রীশবাবু, শেষ করে দিন-না—

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ— নির্মলনবনীনিন্দিতনবীননবমল্লিকা। গীতগোবিন্দ মাটি হল। আরো অনেকগুলো ভালো ভালো 'ন' মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পারছি নে— নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনূপুরনিক্বণ, নিবিড়নীরদনির্মুক্ত— অক্ষয়দাদা থাকলে ভাবতে হত না। মাস্টারমশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে তেমনি অক্ষয়দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।— শ্রীশবাবু, বুড়ো মানুষকে বঞ্চনা করে রুমালখানা চুপি চুপি পকেটে পুরবেন না—

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপর—

রসিক। আমার ঐ রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশবাবু। আপনাকে তো বলেছি আমার নির্জন ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে একটুমাত্র চাঁদের আলো আসে, আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

কুঞ্জ- পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কী দিয়ে ভোলাই বলুন তো। কাব্যশাস্ত্রের রসালো জায়গা যা-কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। সেই দুর্ভিক্ষের সময় ঐ রুমালখানি বড়ো কাজে লাগবে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিকবাবু?

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ঐ রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি। আর ঐ-যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাক-বিশেষ, ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিত্বের মধু। আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি।

দীর্ঘনিশ্বাসপতন

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধেবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু।

শৈলবালা। রোজ সন্ধেবেলায় যদি এইরকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈলবালা। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন। বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যাবসা ধরবে নাকি।

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্‌রার চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈলবালা। কিরকম।

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি করবার মূলধন আমার নেই। আমি খুচরো মালের কারবারী— রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাবুর যেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার-সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন— রুমাল কেন, সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন। আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক্‌, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈলবালা। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এ কী রকম জবরদস্তি। আর, 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর।

রসিক। শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈলবালা। শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন।

শ্রীশ। দেখি নি কে বললে।

শৈলবালা। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি— তা, এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না: একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন ? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই— আমি একবার চট করে দেখা করে আসব।

শৈলবালা। পালাবেন না তো ?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারও দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈলবালা। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান ? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা। এখানকার রুমালে বইয়ে চৌকিতে টেবিলে যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে— আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে।

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার পিলে যকৃৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে। সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈলবালা। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর।

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়্‌দিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি।

নীরবালা।— দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া—
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়া।

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে। পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই। যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

নীরবালা।— গান

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে
কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।
চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে!

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ঐ রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি। আর ঐ-যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাক-বিশেষ, ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিত্বের মধু। আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি।

দীর্ঘনিশ্বাসপতন

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধেবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু।

শৈলবালা। রোজ সন্ধেবেলায় যদি এইরকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈলবালা। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন। বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যাবসা ধরবে নাকি।

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্‌রার চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈলবালা। কিরকম।

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি করবার মূলধন আমার নেই। আমি খুচরো মালের কারবারী— রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাবুর যেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার-সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন— রুমাল কেন, সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন। আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক্‌, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈলবালা। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এ কী রকম জবরদস্তি। আর, 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর।

রসিক। শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈলবালা। শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন।

শ্রীশ। দেখি নি কে বললে।

শৈলবালা। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি— তা, এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না: একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন ? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই— আমি একবার চট করে দেখা করে আসব।

শৈলবালা। পালাবেন না তো ?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারও দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈলবালা। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান ? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা। এখানকার রুমালে বইয়ে চৌকিতে টেবিলে যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে— আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে।

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার পিলে যকৃৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে। সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈলবালা। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর।

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়্‌দিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি।

নীরবালা।— দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া—
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়া।

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে। পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই। যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

নীরবালা।— গান

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে
কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।
চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে!

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ঐ রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি। আর ঐ-যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাক-বিশেষ, ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিত্বের মধু। আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি।

দীর্ঘনিশ্বাসপতন

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধেবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু।

শৈলবালা। রোজ সন্ধেবেলায় যদি এইরকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈলবালা। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন। বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যাবসা ধরবে নাকি।

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্‌রার চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈলবালা। কিরকম।

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি করবার মূলধন আমার নেই। আমি খুচরো মালের কারবারী— রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাবুর যেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার-সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন— রুমাল কেন, সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন। আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক্, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈলবালা। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এ কী রকম জবরদস্তি। আর, 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর।

রসিক। শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈলবালা। শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন।

শ্রীশ। দেখি নি কে বললে।

শৈলবালা। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি— তা, এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না: একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন ? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই— আমি একবার চট করে দেখা করে আসব।

শৈলবালা। পালাবেন না তো ?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারও দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈলবালা। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান ? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা। এখানকার রুমালে বইয়ে চৌকিতে টেবিলে যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে— আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে।

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার পিলে যকৃৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে। সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈলবালা। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর।

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়্‌দিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি।

নীরবালা।— দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া—
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়া।

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে। পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই। যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

নীরবালা।— গান

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে
কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।
চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে !

আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে—
ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন ?

বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচকিত হইয়া দণ্ডায়মান

নীরবালা মুহূর্ত হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিষ্ক্রান্ত

শৈলবালা। আসুন বিপিনবাবু।

বিপিন। ঠিক করে বলুন, আসব কি। আমি আসার দরুন আপনাদের কোনোরকম লোকসান নেই ?

রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিনবাবু, ব্যাবসার এইরকম নিয়ম। যা গেল তা আবার দুনো হয়ে ফিরে আসতে পারে, কী বল অবলাকান্ত।

শৈলবালা। রসিকদাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আসছে।

রসিক। গুড় জমে যেরকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু, বিপিনবাবু কী ভাবছেন বলুন দেখি।

বিপিন। ভাবছি কী ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না।

শৈলবালা। বন্ধুত্বে যদি বাধে ?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না।

শৈলবালা। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভালো হয়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিনবাবু। আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি তো বৃদ্ধ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর, আমাদের সুকুমারমূর্তি অবলাকান্তবাবুকে কোনো স্ত্রীলোক পুরুষ বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী কিশোরী ত্রস্তহরিণীর মতো পলায়ন করে থাকেন তা হলে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা করেছেন। হায় রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোনো তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না।

বিপিন। রসিকবাবু আপনাকেও যে দলে টানছেন অবলাকান্তবাবু। এ কিরকম হল।

শৈলবালা। কী জানি বিপিনবাবু, আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে— কোনো অবলা তো এ পর্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈলবালা। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকত তা হলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কী বেদনা রয়েছে, নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণ ভাব থাকত না। এটা কিসের খাতা। গান লেখা দেখছি। 'নীরবালা দেবী'। (পাঠ)

শৈলবালা। কী পড়ছেন বিপিনবাবু।

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করছি, হয়তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার সুযোগ পাব না এবং হয়তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগুলি মানিক এবং হাতের অক্ষরগুলি মুক্তো। যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন।

শৈলবালা। বিধাতা মাপ করতে পারেন, কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির 'পরে আমার লোভ আছে বিপিনবাবু।

রসিক। আর, আমি বুঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি ? আহা, হাতের অক্ষরের মতো জিনিস আর আছে ? মনের ভাব মূর্তি ধ'রে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে— অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে। অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়ো না ভাই। তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মতো দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে তো ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গণ্ডূষ ভরে উঠেছে— এ জিনিসের দাম আছে। বিপিনবাবু, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী করবেন।

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন, খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কী। এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়। সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা নীরবালা— এ কী, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ওঁর যেরকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ঐ চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটি বীণা নিয়ে, সকালবেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন।

রসিক। বুঝতে পারছি নে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুরি দরকার হয়েছে।

শ্রীশ। চিরকুমার-সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী। তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন।

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যেরূপ উত্তাপ আছে আপনি উত্তরমেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন।— বিপিন, উঠছ নাকি।

বিপিন। যাই, আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরত পাওয়া যাবে।

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক্।

শৈলবালা। (মৃদুস্বরে) শ্রীশবাবু ইতস্তত করছেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে নাকি।

শ্রীশ। (মৃদুস্বরে) আজ থাক্, আর-একদিন খুঁজে দেখব।

[শ্রীশ ও বিপিনের প্রস্থান

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কী রকমের ডাকাতি দিদি। আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীরবালা। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, তোমার অভিধান জাহির করতে হবে না— আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। পুলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যাবসা নয়।

নীরবালা। কেন দিদি, তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে।

শৈলবালা। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস কেন।

নীরবালা। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি।

রসিক। লোকে সেইরকম সন্দেহ করছে।

নীরবালা। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা।

[নীরবালার সক্রোধে প্রস্থান

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ

রসিক। কী নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

নৃপবালা। না, আমার কিছু হারায় নি।

রসিক। সে তো অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস। (শৈলর হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই।

নৃপবালা। ও আমার নয়।

পলায়নোদ্যত

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিসটা খোওয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোনো দাবিও রাখতে চায় না।

নৃপবালা। রসিকদাদা, ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলদিঘির পথ

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনই ঘুমোতে কিংবা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তা হলে দেবতারা ধিক্কার দেবেন।

বিপিন। তাঁদের ধিক্কার খুব সহজে সহ্য হয়, কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিংবা—

শ্রীশ। দেখো, ঐজন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিনে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় ব'লে মলয়-সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরিটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে।

বিপিন। এবং—

শ্রীশ। এবং যা-কিছু ভালো লাগবার মতো জিনিস সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারি আশ্চর্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরো আশ্চর্য। তোমার লাগে ভালো, কিন্তু বল অন্যরকম— আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো— সে চলে ঠিক, বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোরম জিনিসই মনোহর লাগতে লাগল তা হলে তো আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করি নে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই, স্পষ্টই কবুল করছি, স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে— চিরকুমার-সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তা হলে তাঁকে খুব তফাত দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল। তুমি তফাতে থাকলে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসাররক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্টি করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐ-যে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হয়েছে, এতদিন পরে কুমার-সভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু, কেবল একটিমাত্র মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বন্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা-হাওয়া বন্ধ-হাওয়া বুঝি নে ভাই। যার সর্দির ধাত তাকে সর্দি থেকে রক্ষা করতে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী বলছে হে।

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বললেই বুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল আছে। নাড়িটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ির মতো চলে তা জাঁক করে বলতে পারব না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর-একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ির উপরে উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও— কোনো ভয় নেই, বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো ব্রত যাদের তারা কি হৃদয়টিকে

তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে। তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই করো।

বিপিন। ও কে হে। পূর্ণ দেখছি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ঐ বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্ছে। ওকে একবার ডাক দেব ?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দুজনকে অন্বেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে না।

বিপিন। পূর্ণবাবু, খবর কী।

পূর্ণর প্রবেশ

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল-পরশু যে খবর চলছিল আজও তাই চলছে।

শ্রীশ। কাল-পরশু শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে— এতে দুটো-একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের সৃষ্টি হয় কুমার-সভার খবরের কাগজে তার স্থান নেই। তপোবনে একদিন অকালে বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল, তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে— আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক-না পূর্ণবাবু— সে কাব্যে যে দেবতা দগ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার-সভা দগ্ধ হোক। যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান। না, আমি ঠাট্টা করছি নে শ্রীশবাবু, আমাদের চিরকুমার-সভাটি একটি আস্ত জতুগৃহবিশেষ। আগুন লাগলে রক্ষে নেই। তার চেয়ে বিবাহিত সভা স্থাপন করো, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাকবে। যে ইঁট পাঁজায় পুড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে।

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ ক'রে বিবাহ জিনিসটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণবাবু। সেইজন্যেই তো কুমার-সভা। আমার যতদিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর ?

শ্রীশ। আসুন তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস্‌, আর ভয় নেই।

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু—

শ্রীশ। দেখব আর কী। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংসরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
  জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
  তোমার অনল দিয়া।
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
  দীপ্ত শিখাটি বাহি
  আছি তাই পথ চাহি।
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
  আমার নীরব হিয়া
  আপন আঁধার নিয়া।
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
  জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,

পূর্ণ। ওহে শ্রীশবাবু, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখে নি—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
  জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,

ঘরটি সাজানো রয়েছে— থালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবনপ্রদীপটি জ্বলছে না, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হতে চলল। বাঃ, দিব্যি লিখেছে। কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি।

শ্রীশ। বইটার নাম 'আবাহন'।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভালো। (আপন মনে)—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।' (দীর্ঘনিশ্বাস)

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেছ।

শ্রীশ। বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই।

পূর্ণ। আজ পথ ভোলবার মতোই রাতটা হয়েছে বটে। কী বল বিপিনবাবু।

শ্রীশ। বিপিনবাবু এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে। কৃপণ যে জিনিসটার বেশি আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুঁতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ করতে চাই নে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি। মরতে হলে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো।

পূর্ণ। এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসংগত কথা। বিপিনবাবু একেবারে অন্তিম কালের জন্যে কবিত্ব সঞ্চয় করে রাখছেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর। আশীর্বাদ করি অন্যের সেই বাক্যগুলি যেন মধুমাখা হয়—

শ্রীশ। এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ না হয়—

পূর্ণ। বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। সেদিন নিদ্রা যেন না আসে—

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়—

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক গে শ্রীশবাবু, তোমার সেই 'আবাহন' থেকে আর-একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

আহা! একটি জীবনপ্রদীপের শিখাটুকু আর-একটি জীবনপ্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়— দুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে দীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁইয়ে যাওয়া, তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত।

(আপন মনে)— নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, যাও কোথায়?

পূর্ণ। চন্দ্রবাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি, সেইটে খুঁজতে যাচ্ছি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে তো? চন্দ্রবাবুর বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা— সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না।

[পূর্ণের প্রস্থান

শ্রীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন।

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওআটারের ছিপির মতো একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়।

শ্রীশ। যায় তো যাক-না। কোনোমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ। মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাত দিন মুটের বোঝার মতো মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি কেন। দাও ভাই তার কেটে, একবার উড়ুক। সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম—

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক.
পথ ভুলে মর্ ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো হিয়ার কুঞ্জ—
ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতরু-তলে
রক্তকুসুমপুঞ্জ,
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূলসিন্ধুতীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।

বিপিন। আজকাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুশকিলে পড়বে দেখছি।

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মুশকিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মুশকিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুশকিলের মধ্যে পা ফেললেই বিপদ। আসুন আসুন রসিকবাবু, রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে!

রসিকের প্রবেশ

রসিক। আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী—

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ।

শ্রীশ। অস্যার্থঃ ?

রসিক। অস্যার্থ হচ্ছে—

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

অনেকগুলো দিন রাত এ-পর্যন্ত এসেছে এবং গেছে, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না— তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন, ও দুটোর 'পরে আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনই যদি হঠাৎ এসে পড়েন।

রসিক। তা হলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন।

শ্রীশ। তা হলে তদ্দণ্ডেই তিনি অরসিক বলে প্রমাণ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং পরদণ্ডেই পরমানন্দে কালযাপন করতে থাকবেন। তা, আমি ঈর্ষা করতে চাই নে শ্রীশবাবু। আমার ভাগ্যে যিনি আসতে বহু বিলম্ব করলেন আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করলুম। দেবী, তোমার বরমাল্য গেঁথে আনো। আজ বসন্তের শুক্লরজনী, আজ অভিসারে এসো।—

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর।
কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জমা করে রেখেছেন।

রসিক। বিস্তর। লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করছি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার-ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্বার চালাবার জন্যে চিরকুমার-সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখো-না।

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিস আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙা স্ট্রীট ? সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী পরে মনোরাজ্যের পথে ঐরকম করে বেরিয়ে থাকে— বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না— সত্যিকার মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত। কী বলেন রসিকবাবু।

রসিক। সে কথা মানতেই হয়— অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়িঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান। আশীর্বাদ করি শ্রীশবাবু, এইরকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোনো-একটি জালনা থেকে কোনো-এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্ছি। বিশে-ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত আমার অজানা অভিসারিকা তেমনই পূর্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর-একটি চৌকি সাজানো থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আসবেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগুড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ানো আবশ্যক সেটা যে ফেলে এলেন।

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে ?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কী।

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা কও, অমি চট্‌ করে আসছি।

[প্রস্থান

বিপিন। আচ্ছা রসিকবাবু, রাগ করবেন না—

রসিক। যদি বা করি আপনার ভয় করবার কোনো কারণ নেই, আমি ভারি দুর্বল।

বিপিন। দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো ?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সেদিন যে মহিলাটিকে দেখলুম, তিনি—

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সংকোচ করবেন না বিপিনবাবু— তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না, আমরাও ঠিক ঐ কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বুঝি—

রসিক। তাঁর কথা বলবেন না, তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি—

রসিক। হাঁ, তাই বটে। তবে হয়েছে কী, তিনি নৃপবালা নীরবালা দুজনের কাকে যে বেশি ভালোবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না— তিনি দুজনের মধ্যে সর্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু, তাঁদের কেউ কি ওঁর প্রতি—

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে তো কোনো গোলই ছিল না।

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছু—

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভালোবাসেন ?

রসিক। বাসেন বটে, আপনার পকেটের মধ্যেই তো তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ-না-কেউ করতেম।

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জনা করতেন, কিন্তু আমি— বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো—

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব—

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষটুকু হয়েছে রক্ষণে নাহয় তাতে আর-একটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন ?

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কিরকম ?

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারই।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু।

রসিক। দলে টানছি মশায়।

বিপিন। (খাতা পুনর্বার পকেটে পুরিয়া) ইংরেজিতে বলে, দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম-পালনটাই সাব্যস্ত করলেন।

বিপিন। দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ন্যাসী করতে চাও নাকি।

শ্রীশ। যা হোক, অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম— একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্বার কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি ? মানবধর্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরছে। [বিপিনের প্রস্থান

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি তা হলে কি—

রসিক। তা হলে আমি খুশি হব, আপনারও সেটা ভালো লাগতে পারে, এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে—

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রারোগ জন্মাতে পারে। কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ তো তাই বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি।

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লাল রঙের রেশমের শাড়ি পরা ছিল ?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন, অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন— তাই মুহূর্তকালের জন্য হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সামনের দুই-এক গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল— চাবির-গোচ্ছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ তো নৃপবালাই বটে। পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ত্রস্ত, চুলগুলি কুঞ্চিত, দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি— সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকোনো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশিরটুকুর মতো করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু—

কবিন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্ ভির্বিদধতি সভারঞ্জনময়ীং।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্তকমলবনের কিরণলেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্প দিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি, তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখছি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন— ধরা পড়ে ভালোরকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উলটেপালটে নিরীক্ষণ করছে। তফাত থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না— আহা, চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

শ্রীশ। এই-যে অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়। ঐ রে। একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর একটা ডাকাত পথের ধারে। হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করছে তারা মেনকা উর্বশী রম্ভা হলে আমার কোনো খেদ ছিল না— মনের মতো ধ্যানভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই, কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশি হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে।

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। এই-যে অক্ষয়বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল।—

In such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Trojan walls
And sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night.

শ্রীশ। in such a night আপনি কী করতে বেরিয়েছেন অক্ষয়বাবু।

রসিক।—

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।

চক্ষু-'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে।

অক্ষয়বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়।

অক্ষয়। তুমি কে হে।

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র— দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবনসাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিকদাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানি নে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশবাবু, আপনার কিরকম বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। এখনো সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি।

রসিক। আমার মতো পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি?— অক্ষয়দা, আজ তোমাকে বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

অক্ষয়। তুমি তো অন্যমনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।— বিপিনবাবু, তুমি আমাকে খুঁজছিলে বললে বটে, কিন্তু খুব যে জরুরি দরকার আছে ব'লে বোধ হচ্ছে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই— একটু বিশেষ কাজ আছে।

[প্রস্থান

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চলল।
শ্রীশ। অক্ষয়বাবু আছেন বেশ। রসিকবাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড়ো বোন? তাঁর নাম?
রসিক। পুরবালা।
বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কী নাম বললেন।
রসিক। পুরবালা।
বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়ো?
রসিক। হাঁ।
বিপিন। সব-ছোটোটির নাম?
রসিক। নীরবালা।
শ্রীশ। আর নৃপবালা কোন্‌টি।
রসিক। তিনি নীরবালার বড়ো।
শ্রীশ। তা হলে নৃপবালাই হলেন মেজো।
বিপিন। আর নীরবালা ছোটো।
শ্রীশ। পুরবালার ছোটো নৃপবালা।
বিপিন। তাঁর ছোটো হচ্ছেন নীরবালা।
রসিক। (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে শুরু করলে। আমার মুশকিল। আর তো হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। এই-যে আপনারা এখানে। আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলুম।
শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন, আমরা বাড়ি যাই।
বনমালী। আপনারা সর্বদাই ব্যস্ত দেখতে পাই।
বিপিন। তা, আপনাকে দেখলে একটু বিশেষ ব্যস্ত হয়েই পড়ি।
বনমালী। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান—
শ্রীশ। রসিকবাবু, একটু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না?
রসিক। আপনাদের এতক্ষণে বোধ হল, আমার অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হচ্ছে।
বনমালী। চলুন-না ঘরেই চলুন-না।
শ্রীশ। মশায়, এত রাত্রে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা হলে কিন্তু—
বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনারা কিছু ব্যস্ত আছেন দেখছি, তা হলে আর-এক সময় হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

রসিক ও শৈলবালা

রসিক। ভাই শৈল।
শৈলবালা। কী রসিকদাদা।
রসিক। একি আমার কাজ। মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন, আর আমি বৃদ্ধ—
শৈলবালা। তুমি তো বৃদ্ধ, তেমনি যুবক দুটিও তো যুগল মহাদেব নন।

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাওর করেই দেখেছি। সেইজন্যেই তো নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু, তাদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই।

শৈলবালা। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মরা কাঠ তাতেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপ বুড়ো মানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈলবালা। কই, তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলে বুঝতে পারতিস ভাই।

শৈলবালা। কী বল রসিকদা। তোমারই তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী করবে।

রসিক। শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিম্। যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হুহুংশব্দে জ্বলে ওঠে— সেইজন্যেই তো 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' বিপত্তির কারণ। কী আর বলব ভাই।

নীরবালার প্রবেশ

রসিক। আগচ্ছ বরদে দেবি। কিন্তু, বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানি নে, আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরছি। শিব তো কিছুই করছেন না, তবু তোমাদের পুজো পাচ্ছেন ; আর এই-যে বুড়ো খেটে মরছে, এ কি কিছুই পাবে না।

নীরবালা। শিব পান ফুল, তুমি পাবে তার ফল— তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিকদাদা।

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়— আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস, যখনই দরকার হবে তখনই ফিরে পাবি। তার চেয়ে ভাই, আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়ো মানুষের কাজে লাগবে।

নীরবালা। তা দেব— একজোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি সেও শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে। কিন্তু নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট— আপাদমস্তক নাই হল, সেজন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁরই জন্যে রেখে দে।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে— লক্ষণ খারাপ।

শৈলবালা। নীরু, তুই করছিস কী। আবার এ ঘরে এসেছিস ? আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে— এখনই কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্ছে।

নীরবালা। দেখো রসিকদাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা হলে গলাবন্ধ পাবে না বলছি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ঐরকম করে হাস, তা হলে ওঁর আস্পর্ধা আরো বেড়ে যাবে।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, নীরু আজকাল ঠাট্টাও সইতে পারছে না, মন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে।— নীরুদিদি, কোনো কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এইরকম শাস্ত্রে আছে। তোর রসিকদাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগল।

নীরবালা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্ছি— তানটা যদি একটু কমে।

শৈলবালা। নীরু, আর ঝগড়া করিস নে— আয়, এখনই সবাই এসে পড়বে।

[নীর ও শৈলের প্রস্থান

পূর্ণর প্রবেশ

রসিক। আসুন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন? আরো সকলে আসবেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিকবাবু।

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন। কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে সে ব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এত দূর অধিকার হল কী করে।

রসিক। আমার পানে কেউ কোনোদিন তাকায় নি পূর্ণবাবু, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত পরের চক্ষু পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মতো শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম। কিন্তু, যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির মতো এমন আশ্চর্য সৃষ্টি আর-কিছু হয় নি— শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিকবাবু। ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিংবা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দুটি চোখে।

রসিক।— নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং
অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং। —বুঝেছেন পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক।— আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল
না দেখিয়ে পরস্পরে তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় তো? সেই রকম অর্থ করেই নিন-না। শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিকবাবু!—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

অথচ সে বেচারা বন্দী— খাঁচার পাখির মতো কেবল এ পাশে ও পাশে ছট্‌ফট্ করে— প্রিয়চক্ষু যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কিরকম নিদারুণ তাও শাস্ত্রে লিখছে—

হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

পূর্ণ। রসিকবাবু, বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোনো অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐরকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু। এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিশ্বাসে) বড়ো বিশ্রী জায়গা রসিকবাবু।— কিন্তু, ওটা আপনি বেশ বলেছেন—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

রসিক। আহা পূর্ণবাবু, নয়নের কথা যদি উঠল, ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না—

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ।

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে।
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কী কাজ লেপিয়া গরলে।

পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু। ঐ বুঝি কারা আসছেন।

চন্দ্রবাবু ও নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। এই-যে অক্ষয়বাবু।

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ করবেন রসিকবাবু, হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল।

রসিক। মাপ করবার কী কারণ ঘটেছে মশায়। আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন।— পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণ বিজ্ঞানচর্চা করছিলুম চন্দ্রবাবু।

চন্দ্র। আমাদের কুমার-সভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান-আলোচনার জন্যে স্থির করব মনে করছিলুম। আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। না, সে কিছুই না চন্দ্রবাবু।

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিকবাবু।

রসিক। শক্ত বৈকি। পূর্ণবাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উলটো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে কোনো মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে। সোজা দেখা, বাঁকা দেখা, এই-সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড়ো সংকটময়।

চন্দ্র। নির্মলার সঙ্গে রসিকবাবুর পরিচয় হয় নি। ইনিই আমাদের কুমার-সভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধিবিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্রবাবু। শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূতা হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না। কী বলেন পূর্ণবাবু।

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে ?

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না, এখনো সময় হয় নি। অবলাকান্তবাবু, আমার ভাগ্নী নির্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈলবালা। (নির্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন, পুরুষেরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যেই বিশেষ করে বদ্ধ করে রাখতে চায়। চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈলবালা। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রবাবুকে ভালো করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য।

নির্মলা। আমি ওঁকে জানব না তো কে জানবে।

শৈলবালা। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো করে তোলে বটে, তেমনি বড়োকেও ছোটো করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্মলা। কিন্তু, আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খুব সহজ, ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে !

শৈলবালা। দেখুন, সেইজন্যেই তো ওঁকে ঠিকমত জানা শক্ত। দুর্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝতে পারে। তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এত দিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব।

শৈলবালা। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেইরকম আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্তবাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলেম সেটা পড়েছ ?

শৈলবালা। পড়েছি এবং তার থেকে সমস্ত নোট করে আপনার ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে, আমি বড়ো খুশি হলুম অবলাকান্তবাবু। পূর্ণ নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ওঁর শরীর ভালো ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে ?

শৈলবালা। এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান

রসিক। পূর্ণবাবু, আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি, অসুখ করেছে কি।

পূর্ণ। না, কিছুই না। রসিকবাবু, যিনি গেলেন এঁরই নাম অবলাকান্ত ?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেকছে না।

রসিক। অল্পবয়স কিনা সেইজন্যে—

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি। মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না— কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয়তো অল্প বয়সের ধর্ম।

পূর্ণ। আমাদেরও তো বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো—

রসিক। তা তো দেখছি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন— কিন্তু উনি হয়তো সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়তো ভ্রম হচ্ছে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কী রসিকবাবু। কী করব বলুন তো। আমি তো ভেবেই পাই নে, কী কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন, তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, আমার একটা কথাও বেরোয় না। কী বলব আপনিই বলুন-না।

রসিক। এমন কোনো কথাই বলবেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কিরকম গরম পড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন 'হাঁ গরম পড়েছে' তার পরে কী বলব।

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবুকে ও নির্মলাকে নমস্কার করিয়া, নির্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চলছে। এই দেখুন, এখনো সাড়ে ছটা বাজে নি।

নির্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেইজন্যে সভা বসবার পূর্বেই এসেছি— প্রথম সভ্য হবার সংকোচ ভাঙতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু, আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ করে চলবেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন ; লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুন গে।

পূর্ণ। কী বলব।

নির্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন।

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে। কিন্তু, আগুন তো লোহাকে চালাচ্ছে— আমাদের মতো ভারী জিনিসগুলোকে চলনসই করে তুলতে আপনাদের মতো দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুনছেন তো পূর্ণবাবু ?

পূর্ণ। আমি কী বলব বলুন-না।

রসিক। বলুন, লোহাকে চালাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই।

বিপিন। কী পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো ?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি।

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে খপ্ করে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই-যে-পূর্ণবাবু, গেল বারে আপনার শরীর খারাপ ছিল, এবারে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে তো ?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমার-সভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি, সোনার মুকুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল— আজ সেইটি বসানো হয়েছে। কী বলেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশক্তি আমার নেই— আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারি নে, বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পূর্ণবাবু, আশা করি ক্রমে উন্নতি লাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিকবাবু, আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথা আছে। দেখুন, সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম আর ক্ষমা করা দেবীর— সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিলেম—

বিপিন। তাতে কী বললেন।

রসিক। কিছু না ব'লে বিদ্যুতের মতো চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন!

রসিক। কিন্তু, সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জন?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে?

রসিক। এক প্রান্তে কিংবা অন্য প্রান্তে একটু হয়তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ?

রসিক। কী জানি মশায়। অর্থও থাকতে পারে, অনর্থও থাকতে পারে।

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি কী বলেন আমি কিছু বুঝতে পারি নে।

রসিক। কী করে বুঝবেন— ভারি শক্ত কথা।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কী কথা শক্ত মশায়।

রসিক। এই বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের কথা।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শক্ত কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণর কাছে যাও।

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি শখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশি দুরূহ— সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা করে এসো গে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের আলোচনা করে নিই। [বিপিনের প্রস্থান

রসিকবাবু, ঐ-যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বললেন তিনি— তিনি— তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারছি নে।

রসিক। বিস্তারিত করে বললে কৌতূহল আরো বেড়ে যাবে। এরকম কৌতূহল 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে'। আমি তো তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসছি, কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে 'ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি'।

শ্রীশ। আচ্ছা, তিনি— আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করছি—

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।

শ্রীশ। তা, তিনি— কী আর প্রশ্ন করব। তাঁর সম্বন্ধে যা হয় কিছু বলুন-না— কাল কী বললেন, আজ সকালে কী করলেন, যত সামান্য হোক আপনি বলুন— আমি শুনি।

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খুশি হলুম শ্রীশবাবু, আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন— আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এটুকু কী করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই। তিনি যদি বলেন 'রসিকদা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উস্‌কে দাও' তো আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম আদিকবির প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো। কী বলব শ্রীশবাবু, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সুতো পরাচ্ছেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে— আমার মনে হল এক আশ্চর্য দৃশ্য। কতবার কত দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মুখ তুলে দেখি নি, কিন্তু—

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন ?

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদার সঙ্গে কী পরামর্শ করছেন।

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষিবিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ— আজ— (কাশি)

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা—

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদুস্বরে) বলে যান পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণবাবু, বলে যান।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব (কাশি)— যে নূতন সৌন্দর্য (পুনরায় কাশি) অভিনন্দন—

রসিক। (উঠিয়া) সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সংবরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখি প্রত্যূষেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছে। কিন্তু দেহ রুগ্‌ণ, তাই পূর্ণহৃদয়ের আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করবার শক্তি নেই, অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নবপ্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের সভার কার্য বন্ধ থাকে সেও ভালো, তথাপি বর্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারি নে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।

চন্দ্রবাবু। আমি জানি কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভালো নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষত অবলাকান্তবাবু ঘরে বসে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এ-পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্মেন্ট্ থেকে যতগুলি রিপোর্ট বাহির হয়েছে সবগুলি আমি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম, তাঁর থেকে উনি জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সংকলন করে রেখেছেন— সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রস্তুত হয়েছেন। ইনি যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্যে যোগদান করেছেন সেজন্য ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিপিনবাবু য়ুরোপীয় ছাত্রাগার-সকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী -সংকলনের ভার নিয়েছিলেন। এবং শ্রীশবাবু স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লন্ডন নগরে কত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ-রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন— বোধ হয় এখনো তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি— সকলেই জানেন আমাদের দেশের গোরুর গাড়ি এমন ভাবে নির্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই উঠে পড়ে এবং গোরুর গলায় ফাঁস লেগে যায়, আবার কোনো কারণে গোরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই-সুদ্ধ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে— এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি, কৃতকার্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে

নিরীক্ষণ করে থাকি— আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর-কিছুই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান-পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেষ্টায় আছি। শ্রীমতী নির্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগিচর্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করছেন— ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই-একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমার-সভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ করতে থাকবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু, করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চলছে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবছি।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবুকে ধন্য বলতে হবে— উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্ছেন কিছু বোঝবার জো নেই।

বিপিন। তাই তো বড়ো আশ্চর্য। অথচ মনে হয় যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসি গে।

[শৈলর নিকট গমন

পূর্ণ। রসিকবাবু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু, সকলে আমার মতো নয় পূর্ণবাবু— আন্দাজে বুঝবে না, বলা-কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু— আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন-না।

পূর্ণ। ঐ দেখুন-না, অবলাকান্তবাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেছেন—

রসিক। তা হোক-না, তিনি তো ওঁকে চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো ব্যূহের মতো ভেদ করে যেতে হবে না। আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান-না।

পূর্ণ। আচ্ছা, আমি দেখি।

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) আমাকে এত করে বলবেন না— আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করছেন।— কিন্তু, বেচারা পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আপনি আসবেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন, অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি ওঁকে—

নির্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক করে দেখছেন বলে আমি বড়ো সংকোচ বোধ করছি— আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন, মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈলবালা। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে। যে

লোক গুণের দ্বারা নৌকোকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দূরে থাকতে হয়। চন্দ্রবাবু আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন, তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে, সুতরাং আপনাকে পৃথক থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে বসে গেছি।

নির্মলা। আপনাকেও কর্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক বোধ হয়। একদিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এ সভার মধ্যে আপনি আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈলবালা। সে তো আমার সৌভাগ্য। এই-যে আসুন পূর্ণবাবু। আমরা আপনার কথাই বলছিলেম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা, ঠিক হয়েছে— পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যেই নূতনের প্রয়োজন।

শৈলবালা। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। কিন্তু, আমার সেই রুমালটি ? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি, আবার রুমালটিও খোয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে। এ যে তার উচিত মূল্য তা বলতে পারি নে— তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈলবালা। মশায়, এ ছলনাটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি, যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ করে এগুলি—

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, ভগবান বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্ছে— হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্কটুকু একেবারে দূর হয়।

শৈলবালা। আচ্ছা, আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আপনি সভার জন্য যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব— রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। বুঝেছেন রসিকবাবু, আমি তাঁর গানের নির্বাচনচাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন, নির্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা। লতায় ফুল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সুরুচি তো তারই।

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে ?—

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।
নবীন তরী নতুন চলে,
দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।

সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

রসিক। যাক ডুবে, কী বলেন বিপিনবাবু।

বিপিন। যাক গে, কিন্তু কোথায় ডুবল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিকবাবু, এ গানটা কেন তিনি খাতায় লিখে রাখলেন।

রসিক। স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এইরকম একটা প্রবাদ আছে, রসিকবাবু তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্রবাবুর কাছে একবার যাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্তব্যে আমরা ঢিল দিয়েছি— ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুশি হবেন।

বিপিন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই-যে সেলাইয়ের কথা বলছিলেন— উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহকর্ম করেন?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সেদিন গিয়ে দেখলেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নিচু করে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর বসে—

রসিক। না, খাটে নয়, বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন—

রসিক। হাঁ, ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— পা দুটি ছড়ানো, মাথা নিচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে পড়েছে, বিকেল বেলার আলো—

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান।

[শ্রীশের প্রস্থান

রসিক। (স্বগত) আর কত বকব।

অন্য প্রান্তে

নির্মলা। (পূর্ণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভালো নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে— হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে, বিশেষ কিছু নয়— তবু একটু ইয়ে বৈকি— তেমন বেশ (কাশি)— আপনার শরীর বেশ ভালো আছে?

নির্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি— জিজ্ঞাসা করছিলুম যে আপনি— আপনি— আপনার ইয়ে কিরকম বোধ হয়— ঐ-যে— মিলটনের আরিয়োপ্যাজিটিকা— ওটা কিনা আমাদের এম· এ· কোর্সে আছে, ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না?

নির্মলা। আমি ওটা পড়ি নি।

পূর্ণ। পড়েন নি? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে— আপনি— এবারে কিরকম গরম পড়ছে— আমি একবার রসিকবাবু— রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

[নির্মলার নিকট হইতে প্রস্থান

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ও গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে করে লিখেছেন।

রসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে। পূর্বে ওটা ভাবি নি।

বিপিন।— তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

—আচ্ছা রসিকবাবু, এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে।

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথরটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন— রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে— যদি—

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্ছি। [রসিকের নিকট হইতে প্রস্থান

পূর্ণ। আমার মতো নির্বোধ জগতে নেই রসিকবাবু।

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে— যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালা পাই যদি আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর করতে পারেন ?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে, গোলদিঘির ধারে— কী বলেন।

রসিক। (স্বগত) কী সর্বনাশ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ, পূর্ণবাবু কথা কচ্ছেন বুঝি ? আচ্ছা, এখন থাক্। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিকবাবু ?

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মতো— কী বলেন। কাল দেখলেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো।

রসিক। জমে বৈকি। (স্বগত) সর্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়।
[শ্রীশের প্রস্থান

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু, আপনি হলে কী বলে কথা আরম্ভ করতেন।

রসিক। হয়তো বলতুম— সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি।

পূর্ণ। তিনি যদি বলতেন, হাঁ—

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি, শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু— চমৎকার— এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে ? থাক্ তবে, আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কী বলেন।

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে— কী বলেন।

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

অন্যত্র

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ঐ বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারি আমি অল্প অল্প চর্চা করেছি— বেশি নয়— কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন।

নির্মলা। বেলুন ?

পূর্ণ। হাঁ, ঐ বেলুন (সকলে নিরুত্তর)— রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমাকে মাপ করবেন— আপনাদের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম— আমি অত্যন্ত হতভাগ্য।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয় ও পুরবালা

অক্ষয়। দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।

পুরবালা। কী শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গে কৃশতার তো কোনো লক্ষণ দেখছি নে!

পুরবালা। শ্রীঅঙ্গ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেছে।

পুরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখছি।

অক্ষয়। হতে দিল কই। তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল— বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝতে দিলে না।—

গান

বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পণ—
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ।
ভেবেছিনু অশ্রুজলে ডুবিব অকূল-তলে
কাহার সোনার তরী করিল তারণ।

—প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝি পঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না।

পুরবালা। তা হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে— কোম্পানির শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি।

অক্ষয়। এখন দিদি বৈ আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদদহনে উত্তরোত্তর তপ্তকাঞ্চনের মতো শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের ক'টিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে।

নীরবালা। শুনছ দিদি। এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি, কেবল চিঠি লিখেছেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েছেন। তুমি এসেছ, এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন—

নৃপবালা। দিদি, তুমিও তো ভাই, এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখ নি।

পুরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই। মাকে নিয়ে দিন রাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে 'তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম' তা হলে কি লোকে নিন্দে করত।

নীরবালা। তা হলে ভগ্নীপতির আস্পর্ধা আরো বেড়ে যেত। মুখুজ্জেমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও-না। দিদি এতদিন পরে এসেছেন, আমরা কি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প করতে পাব না।

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষলধারাবর্ষণ-দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিশলয়োদ্‌গম ক'রে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ—

নীরবালা। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব—

শৈলবালার প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো— উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীরবালা। উত্তমমধ্যম হয় না।

শৈলবালা। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই, একটু যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী বুঝতে পারছিস তো নীরু? হরিনাম-কথা নয়।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার আর বকতে হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈলবালা। দিদি, নৃপ-নীরর জন্যে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন?

পুরবালা। হাঁ, কথা একরকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলে দুটি মন্দ নয়— তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈলবালা। যদি পছন্দ না করে?

পুরবালা। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভালো।

শৈলবালা। নৃপ নীরু যদি পছন্দ না করে?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব।

পুরবালা। পছন্দ আবার না করবে কী? তোদের সব বাড়াবাড়ি, স্বয়ম্বরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না। স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্তমান ভগ্নীপতির কী দুর্দশাই হত শৈল!

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, ছেলে দুটিকে তা হলে তো খবর দিতে হয়। তারা তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিকদাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

জগত্তারিণী। পোড়া কপাল। তোমার রসিকদাদার যেরকম বুদ্ধি। তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই।

পুরবালা। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে দুটিকে আনবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগত্তারিণী। মা পুরী, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরীর হাতযশ আছে। পুরী তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে। আজকালকার ছেলে কী করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে—

পুরবালা। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে।

জগত্তারিণী। মা, তোমরা পরামর্শ করো। কায়েৎদিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি।

শৈলবালা। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো, ছেলে দুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখ নি, হঠাৎ—

জগত্তারিণী। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল, আর বিবেচনা করতে পারি নে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময়মত এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক।

জগত্তারিণী। বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো।

[প্রস্থান

পুরবালা। মিথ্যে তুই ভাবছিস শৈল— মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ আমি মানি ভাই। যার সঙ্গে যার হবার, হাজার বিবেচনা করে মলেও সে হবেই।

অক্ষয়। সে তো ঠিক কথা— নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর-একজনের সঙ্গে হত।

পুরবালা। কী যে তর্ক কর তোমার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্বোধ।

পুরবালা। যাও এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এসো গে।

[প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা শুনেছ তো সব? মুশকিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুশকিল কিসের। কুমার-সভারও কৌমার্য রয়ে গেল, নৃপ-নীরুও পার পেলে, সব দিক রক্ষা হল।

শৈলবালা। কোনো দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্তত এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে— দুটো অর্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, তুমি না হলে রসিকদাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না— উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মানতেন সে বয়স পেরিয়েছে কিনা। তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করছে। আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। চলো তো রসিকদা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিপিনের বাসা

বিপিন ও গুরুদাস

তানপুরা হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসুরো গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন

বিপিন। ভাই গুরুদাস, তুমি তো ওস্তাদ মানুষ, আমার এই উপকারটি তোমার করে দিতেই হবে। এই খাতার সব গানগুলিই তোমাকে সুর বসিয়ে দিতে হবে। যেটা গাইলে ওটা খাসা হয়েছে। যদি কষ্ট নাহয় তো আর একবার— আগে ঐ গানের কথা দেখেই মজে গিয়েছিলুম এখন দেখি কথাটি মানস-সরোবরের পদ্ম, আর তার উপরে গানটি বসেছে যেন বীণাপাণি স্বয়ং। ভাই আর-একবার—

গুরুদাস।— গান

তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে।
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে।
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে। কান্নারই গান বীণায় এনেছি সে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে।

দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি, রঙিন পালে কবে আসবে তরী—
পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবু? কিরকম বাবু রে।

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভৃত্য আছে।

বিপিন। (তানপুরা রাখিয়া) নিয়ে আয়, এখনই নিয়ে আয়। ওরে ওরে, তামাক দিয়ে যা। বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টানতে বলে দে। আর দেখ্, চট করে গোটাকতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন্ তো রে। দেরি করিস নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস— বুঝেছিস?

[ভৃত্যের প্রস্থান

(পদশব্দ শুনিয়া) রসিকবাবু, আসুন।

বনমালীর প্রবেশ

বিপিন। রসিকবাবু— এ যে সেই বনমালী!

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য।

বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যক। আমি একটু বিশেষ কাজে আছি।

বনমালী। মেয়েদুটিকে আর রাখা যায় না— পাত্রও অনেক আসছে—

বিপিন। শুনে খুশি হলেম— দিয়ে ফেলুন, দিয়ে ফেলুন—

বনমালী। কিন্তু আপনাদেরই ঠিক উপযুক্ত হত—

বিপিন। দেখুন বনমালীবাবু, এখনো আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি— যদি একবার পান তা হলে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে।

বনমালী। তা হলে আমি উঠি, আপনি ব্যস্ত আছেন, আর-এক সময় আসব।

বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা—

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কী হে বিপিন, একি। কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ? গুরুদাস যে?

বিপিন। ওস্তাদজি, আজ ছুটি। কী করব বলো, গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না। গুরুদাসকে গুরু মেনেছি। ওর কাছে নবীন-সন্ন্যাস-ব্রতের দীক্ষা নিচ্ছি।

শ্রীশ। সে কিরকম।

বিপিন। রস ভরে উঠলে তবেই তো ত্যাগ সহজ হয়। মেঘ যখন জলে ভারী হয় তখনই জল বর্ষণ করে।

শ্রীশ। রাখো তোমার নতুন ফিলসফি, কুমার-সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনো হাত দিতে পারি নি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি।

শ্রীশ। না, আমিও হাত দিই নি। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারি অন্যায় হচ্ছে। ক্রমেই আমরা আমাদের সংকল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছি।

বিপিন। অনেক সংকল্প ব্যাঙাচির লেজের মতো, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি লেজটুকুই থেকে যেত, আর ব্যাঙটা যেত শুকিয়ে সে কিরকম হত। এক সময় একটা সংকল্প করেছিলেম বলেই যে সে সংকল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে আমি তো তার মানে বুঝি নে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সংকল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়। অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত-পরিমাণ রসসঞ্চার হচ্ছে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি ভুল করেছিলুম ভাই বিপিন— সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে, চিত্তকে কোনো মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না। এবার থেকে রসচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব, এইরকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু, সব তৃণেই তো ধান ফলে না— শুকোতে গেলে কেবল নাহক শুকিয়ে মরাই হবে, ফল ফলবে না। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করেছি সে সংকল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না— অতএব আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনোরকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন তোমার তম্বুরা ফেলো—

বিপিন। আচ্ছা, ফেললুম, তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।

গুরুদাস। সংযমচর্চা যদি আরম্ভ করেন তা হলে আমাকে আর দরকার নেই।

বিপিন। দরকার আরো বেশি। রৌদ্র যত প্রখর হবে, জলের প্রয়োজন ততই বাড়বে। এই দুঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না— সকাল-সন্ধ্যায় যেন দর্শন পাই। সেই গানটা যদি এর মধ্যে তৈরি হয়ে যায় তো আজ সন্ধেবেলায়— কী বল?

গুরুদাস। আচ্ছা, তাই হবে।

[প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন।

বিপিন। বুড়ো বাবু? জ্বালালে দেখছি। বনমালী আবার এসেছে।

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এই খানিকক্ষণ হল আমার কাছেও এসেছিল।

বিপিন। ওরে, বুড়োকে বিদায় করে দে।

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আনুক, আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

বিপিন। একি। এ তো বনমালী নয়, এ যে রসিকবাবু।

রসিক। আজ্ঞে হাঁ— আপনাদের আশ্চর্য চেনবার শক্তি— আমি বনমালী নই। 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—'

শ্রীশ। না রসিকবাবু, ও-সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

রসিক। আঃ, বাঁচিয়েছেন।

শ্রীশ। অন্য সকল-প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্তমনে কুমার-সভার কাজে লাগব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী বলে একজন বুড়ো, কুমোরটুলির নীলমাধব চৌধুরীর দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, আমরা তাকে সংক্ষেপে বিদায় করে দিয়েছি— এ-সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসংগত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত।

বিপিন। রসিকবাবু, কিছু জলযোগ করে যেতে হবে।

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো-একটা বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না না, তাই ব'লে কথা থাকলে বলবেন না কেন।

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে।

বিপিন। না, সেদিন যে রসিকবাবু বলছিলেন আমারই সঙ্গে ওঁর দুটো-একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই, থাক্।

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাত্রে গোলদিঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশবাবু, মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও-না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিকবাবু—

রসিক। না না, দরকার কী—

বিপিন। তার চেয়ে রসিকবাবু, তেতালার ঘরে চলুন— শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন।

রসিক। না, আপনারা দুজনেই বসুন, আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়। কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে। সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা তো পূর্বেই আপনারা শুনেছেন—

শ্রীশ। শুনেছি বৈকি— তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু—

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ—

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো?

রসিক। তার চেয়ে বেশি। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ—

শ্রীশ। বলেন কী রসিকবাবু। বিবাহের তো কোনো কথা শোনা যায় নি—

রসিক। কিচ্ছু না— হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে-দুটির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ তো কিছুতেই হতে পারে না রসিকবাবু।

রসিক। মশায়, পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন করতে হবে—

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ করতে হবে—

রসিক। তা তো বটেই, কিন্তু করে কে মশায়।

শ্রীশ। আমরা করব। কী বল বিপিন।

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু, কী করবেন।

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলেদুটোকে পথের মধ্যে—

রসিক। বুঝেছি, সেটা মনে করলেও শরীর পুলকিত হয়। কিন্তু, বিধাতার বরে অপাত্র জিনিসটা অমর— দুটো গেলে আবার দশটা আসবে।

বিপিন। এদের দুটোকে যদি ছলে বলে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তা হলে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাববার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শুক্রবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে।

বিপিন। এই শুক্রবারে ?

শ্রীশ। সে তো পরশু।

রসিক। আজ্ঞে, পরশুই তো বটে। শুক্রবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা, আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কিরকম শুনি।

শ্রীশ। সেই ছেলেদুটোকে বাড়ির কেউ চেনে ?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তারা বাড়ি চেনে ?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হলে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনো রকম করে আটকে রাখতে পারে তো আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে—

বিপিন। জানই তো ভাই, আমার কোনো রকম কৌশল মাথায় আসে না। তুমি ইচ্ছে করলে কৌশলে ছেলেদুটোকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে— আমি বরঞ্চ নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে—

রসিক। কিন্তু মশায়, এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না। দুটি ছেলে আসবার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দুজন বলে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে—

শ্রীশ। ও, তা বটে।

বিপিন। হাঁ, সে কথা ভুলেছিলেম।

শ্রীশ। তা হলে তো আমাদের দুজনকেই যেতে হয়। কিন্তু—

রসিক। সে দুটোকে ভুল রাস্তায় চালান করে দিতে আমিই পারব। কিন্তু, আপনারা—

বিপিন। আমাদের জন্যে ভাববেন না রসিকবাবু।

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক, এরকম ত্যাগস্বীকার—

শ্রীশ। বিলক্ষণ ! এর মধ্যে ত্যাগস্বীকার কিছুই নেই।

বিপিন। এ তো আনন্দের কথা।

রসিক। না না, তবু তো মনে আশঙ্কা হতে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই পড়তে হয়।

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘটুক তাতেই আমরা সুখী হব।

রসিক। এ তো আপনাদের মহত্ত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি— এই শুক্রবারের দিনটা আপনারা কোনোমতে উদ্ধার করে দিন, তার পরে কখনো আপনাদের আর বিরক্ত করব না।

শ্রীশ। আমাদের বিরক্ত করবেন না এই কথা শুনে দুঃখিত হলেম রসিকবাবু।

রসিক। আচ্ছা, করব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত। আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন ?

রসিক। মাপ করবেন— আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বলুন, ফস্ করে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শক্ত।

রসিক। সেইজন্যেই তো এত দিন অপেক্ষা করে শেষে এই বিপদ। বিবাহের প্রসঙ্গমাত্রই আপনাদের কাছে অপ্রিয়, তবু দেখুন আপনাদের সুদ্ধ—

বিপিন। সেজন্যে কিছু সংকোচ করবেন না—

শ্রীশ। আপনি যে আর-কারো কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে, পাখাটা টান্।

শ্রীশ। রসিকবাবুর জন্যে জলখাবার আনাবে বলেছিলে—

বিপিন। সে এল বলে। ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান—

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন রসিকবাবু, পান খান।

বিপিন। ওদিকে হাওয়া পাচ্ছেন? এই তাকিয়াটি নিন-না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব—

রসিক। সে আর বলতে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি করছেন?

বিপিন। আচ্ছা, নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ঐ রে, শুরু হল। আমার লেমনেডে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিন্তু এখনই উঠতে হচ্ছে।

শ্রীশ। বলেন কী।

বিপিন। সে কি হয়।

রসিক। সেই ছেলেদুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আসতে হবে, নইলে—

শ্রীশ। বুঝেছি, তা হলে, এখনই যান।

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

নির্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। (স্বগত) বেচারা নির্মলা বড়ো কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখছি কদিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে। (প্রকাশ্যে) নির্মল।

নির্মলা। (চমকিয়া) কী মামা।

চন্দ্রবাবু। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবছ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই-একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই কদিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিনে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি নে— ভারি অন্যায় হচ্ছে, আজ আমি যেমন করে হোক—

চন্দ্রবাবু। না না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই-একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে—

নির্মলা। অবলাকান্তবাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন— আমি তাঁকে রোগীশুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরেজি বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন। বোধ হয় এখনই পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্রবাবু। ঐ ছেলেটি বড়ো ভালো—

নির্মলা। খুব ভালো— চমৎকার—

চন্দ্রবাবু। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্যতৎপরতা—

নির্মলা। আর, এমন সুন্দর নম্রস্বভাব—

চন্দ্রবাবু। ভালো প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

নির্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্রবাবু। এত অল্প কালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করি নি। আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকলপ্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি।

নির্মলা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি। আচ্ছা, এরকম প্রস্তাব করে একবার দেখোই-না— ঐ-যে বেহারা আসছে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আয়।

বেহারার প্রবেশ

ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি-প্রদান

মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্রবাবু। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্তবাবু বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কী লিখেছেন।

চন্দ্রবাবু। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ লিখছেন— 'গুরুদেব, আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।'

নির্মলা। হয়েছে কী। বোধ হয় পূর্ণবাবু চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন, তাই এত ভূমিকা করছেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয়, পূর্ণবাবু আজকাল কুমার-সভার কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্রবাবু। 'দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা গুরুভার— সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা চরণসমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।'

নির্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে, শ্রান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে।

চন্দ্রবাবু। 'সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্যে হাত দিতে যাই তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।'— নির্মল, আমরা তো ঠিক এই কথাই বলছিলেম।

নির্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেছেন সেটা সত্য— মানুষের সঙ্গ না হলে কেবলমাত্র সংকল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্রবাবু। 'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ কথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত

সাধারণ লোকের জন্য নহে— তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত— তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।'

তোমার কী মনে হয় নির্মল। (নির্মলা নিরুত্তর) অক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন— তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি।

নির্মলা। তা, হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্রবাবু। 'গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।'

নির্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেছেন।

চন্দ্রবাবু। আমিও কিছুদিন থেকে মনে করছিলেম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। কী বল মামা। অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন। অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নির্মলা। তবু একবার অবলাকান্তবাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্রবাবু। মত তো নিতেই হবে।

(পত্রপাঠ) 'এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।'

নির্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়তো কোনো গোপনীয় কথা লিখছেন, তুমি চেঁচিয়ে পড়ছ কেন।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছ ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কী আশ্চর্য, আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ। এতদিন তো আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। নির্মল, পূর্ণবাবুর কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নির্মলা। হাঁ, পূর্ণবাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল।

চন্দ্রবাবু। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তা হলে তোমাকে খুলে বলি— পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন—

নির্মলা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও, তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্রবাবু। আমি যে তোমার অভিভাবক, এই পড়ে দেখো—

নির্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিমমুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। আমি তাঁকে কী বলব।

নির্মলা। বোলো, কোনোমতে হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। কেন নির্মল, তুমি তো বলছিলে কুমারব্রত-পালনের নিয়ম সভা হতে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে—

নির্মলা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না— আমার কাজ আছে।

[প্রস্থানোদ্যম

মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উঁচু হয়ে আছে।

চন্দ্রবাবু। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম, বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী অন্যায়, অবলাকান্তবাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে, আমাকে দাও নি। আমি ভাবছিলেম তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন। ভারি অন্যায়।

চন্দ্রবাবু। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশি অন্যায় ভুল আমি প্রতি দিনই করে থাকি ফেনি— তুমিই তো আমাকে প্রত্যেক বার মাপ করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়— আমিই অবলাকান্তবাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় করছিলেম, ভাবছিলেম— এই-যে, রসিকবাবু আসছেন। আসুন রসিকবাবু, মামা এইখানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই-যে রসিকবাবু এসেছেন; ভালোই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্রবাবু, তা হলে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সুলভ। যখনই বলবেন তখনই আসব, না বললেও আসতে রাজি আছি।

চন্দ্রবাবু। আমরা মনে করছি আমাদের সভা থেকে চিরকুমারব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব— আপনি কী পরামর্শ দেন।

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই-ই সমান। আমার পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোন্‌ দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবাসকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছেন রসিকবাবু, যে জিনিস বলপূর্বক আসবেই তাকে বলপ্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভালো। আসছে রবিবারের পূর্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা, শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্রবাবু। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে, কিন্তু সময় খুব যে বেশি—

নির্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাকলে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্তবাবু আমাকে তাঁর সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন— আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সেজন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

জগত্তারিণী পুরবালা ও অক্ষয়

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি। নেপো বসে বসে কাঁদছে; নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনোমতেই বেরোবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও।

[প্রস্থান

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা—

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর-কাউকে ওরা পছন্দ করছে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়। তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি না বলো। তুমি না বললে ওরা শুনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী। আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও— দেখি।

[পুরবালার প্রস্থান

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। না, মুখুজ্জেমশায়, সে কোনোমতেই হবে না।

নৃপবালা। মুখুজ্জেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের যার-তার সামনে ও-রকম করে বের কোরো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলেছিল আমাকে বেশি উঁচুতে চড়িয়ো না, আমার মাথা ঘোরা ব্যামো আছে। তোদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এখন দেখা দিতে লজ্জা করলে চলবে কেন।

নীরবালা। কে বললে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি?

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু হৃদয় দুর্বল এবং দৈব বলবান, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়—

নীরবালা। না, ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভয়ে এসো, যুবক-দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও— হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীরবালা। অকারণে প্রাণিহত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু, সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কী। তোদের মা দিদি যখন ধরে পড়েছেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়িভাড়া করে আসছে তখন একবার মিনিট-পাঁচেকের মতো দেখা দিস, তার পরে আমি আছি— তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীরবালা। কোনোমতেই না?

অক্ষয়। কোনোমতেই না।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। আয়, তোদের সাজিয়ে দিই গে।

নীরবালা। আমরা সাজব না।

পুরবালা। ভদ্রলোকদের সামনে এইরকম বেশেই বেরোবি! লজ্জা করবে না!

নীরবালা। লজ্জা করবে বৈকি দিদি, কিন্তু সেজে বেরোতে আরো বেশি লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন, শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল— কালিদাস বলেন, সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল— তোমার বোনেরা সেই-সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সাজতে চায় না।

পুরবালা। সে-সব হল সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুষ্মন্ত মহারাজারা সাজ-সজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা—

পুরবালা। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে, মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্যে না জানি কত শোভা হবে।

পুরবালা। আচ্ছা, তুমি থামো। নীরু, আয়।

নীরবালা। না ভাই দিদি—

পুরবালা। আচ্ছা, সাজ নাই করলি, চুল তো বাঁধতে হবে?

অক্ষয়।— গান

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো।

পুরবালা। তুমি আবার গান ধরলে! আমি কখন কী করি বলো দেখি। তাদের আসবার সময় হল— এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

[নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত?

রসিক। সমস্তই। বীরপুরুষ দুটিও সমাগত।

অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র-দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তা হলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো, আমি একটু অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই।

[রসিক ও অক্ষয়ের প্রস্থান

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সংগীতবিদ্যার উপর চীৎকারশব্দে ডাকাতি আরম্ভ করেছ— কিছু আদায় করতে পারলে?

বিপিন। কিছু না। সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার জো আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল।

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়ছিলুম—

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে।
চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।

—মনে হচ্ছিল এর সুরটা যেন জানি কিন্তু গাবার জো নেই।

বিপিন। জিনিসটা মন্দ নয় হে— তোমার কবি লেখে ভালো। ওহে, ওর পরে আর-কিছু নেই? যদি শুরু করলে তবে শেষ করো।

শ্রীশ।—

নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চলো নিরবধি
সেই ফুলবন তলাশিয়া।

বিপিন। বাঃ, বেশ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্‌ফের কাছে তুমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছ।
শ্রীশ। সেই-যে সেদিন যে বইটাতে নাম লেখা দেখেছিলাম সেইটে—
বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয়।
শ্রীশ। কী-সব নয়।
বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনো রকম—
শ্রীশ। কী আশ্চর্য বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা করতে পারি যাতে—
বিপিন। রাগ কোরো না ভাই— আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রসিকবাবুর সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি, আজ সে ভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে— বুঝছ না—
শ্রীশ। কেন বুঝব না। আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিলুম মাত্র— একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না—
বিপিন। না, আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি।
শ্রীশ। বিপিন, তোমার সঙ্গে—
বিপিন। না ভাই, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, আমি হারলুম— কিন্তু বইটা রাখো।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। এই-যে আপনারা এসে একলা বসে আছেন— কিছু মনে করবেন না—
শ্রীশ। কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নিয়েছিল।
রসিক। আপনাদের কত কষ্ট দেওয়া গেল।
শ্রীশ। কষ্ট আর দিতে পারলেন কই। একটা কষ্টের মতো কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।
রসিক। যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যে চুকে যাবে এই এক সুবিধে। তার পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি, যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তা হলেই 'পরিণামে বন্ধনভয়ম্‌'। বিবাহ জিনিসটা মিষ্টান্ন দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দুঃখিতভাবে এরকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বলুন দেখি। আমি বলছি, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা বনের বিহঙ্গ, দুটিখানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন— কেউ আপনাদের বাঁধবে না। নাত্র ব্যাধশরাঃ পতন্তি পরিতো নৈবাত্র দাবানলঃ। দাবানলের পরিবর্তে ডাবের জল পাবেন।
শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিকবাবু, আমরা ভাবছি— আমাদের দ্বারা কতটুকু উপকারই বা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দূর করতে পারছি নে।
রসিক। বিলক্ষণ! যা করছেন তাতে আপনারা দুটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করছেন— অথচ নিজেরা কোনোপ্রকার পাশেই বদ্ধ হচ্ছেন না।
জগত্তারিণী। (নেপথ্যে মৃদুস্বরে) আঃ, নেপো কী ছেলেমানুষি করছিস। শিগ্‌গির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা, লক্ষ্মী মা আমার— কেঁদে চোখ লাল করলে কী রকম ছিরি হবে ভেবে দেখ্‌ দেখি।— নীরো যা না। তোদের সঙ্গে আর পারি নে বাপু। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি। কী মনে করবেন।
শ্রীশ। ঐ শুনেছেন রসিকবাবু? এ অসহ্য। এর চেয়ে রাজপুতদের কন্যাহত্যা ভালো।
বিপিন। রসিকবাবু, এঁদের এই সংকট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি।
রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেব না। কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান, তার পরে আপনাদের আর-কিছুই ভাবতে হবে না।

শ্রীশ। ভাবতে হবে না ? কী বলেন রসিকবাবু। আমরা কি পাষাণ। আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্যে ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়— গৌরবের বিষয়।

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর-কোনো কষ্ট করতে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন।

বিপিন। এদের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশি কষ্ট পেতে হবে না ব'লে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন— এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন— আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ করব না। আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন।

শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিনলেন না।

রসিক। চিনেছি বৈকি, সেজন্যে আপনারা কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিকবাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে—

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরও বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স, মান্য অতিথিদের কিরকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না। নৃপদিদি, নীরদিদি, কী বল ভাই। যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি।

নৃপ ও নীরু লজ্জিত নিরুত্তর

না, একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কী বলি বলো তো ভাই। বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও।

নীরবালা। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা, কী বক তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি— আমরা কি জানতুম এঁরা এসেছেন।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন—

সখা, কী মোর করমে লেখি—
তাপন বলিয়া তপনে ডরিনু,
চাঁদের কিরণ দেখি।

— এর উপরে আপনাদের আর কিছু বলবার আছে ?

নীরবালা। (জনান্তিকে) আঃ রসিকদাদা, কী বলছ তার ঠিক নেই। ও কথা আমরা কখন বললুম।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারি নি বলে এঁরা আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। এঁরা বলতে চান চাঁদের কিরণ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না— তার চেয়ে আরো যদি—

নীরবালা। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব।

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্‌ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্। (শ্রীশ ও বিপিনের

প্রতি) এঁরা বলছেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এঁরা লজ্জায় এ ঘর থেকে চলে যাবেন।

[নীরবালা ও নৃপবালার প্রস্থানোদ্যম

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দোষদের সাজা দেবেন কেন। আমরা তো কোনোপ্রকার প্রগল্‌ভতা করি নি।

নৃপবালা ও নীরবালার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না।

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেকদিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করছে।

নীরবালা। (জনান্তিকে) অপরাধ কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে যাব।

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলছেন আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি। কিন্তু, আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত— আইনের বিশেষ ধারায় এইরকম লিখছে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু। আপনারা সর্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্যে দণ্ডভোগ করে কৃতার্থ হন। আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ করবার সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না।

রসিক। বিপিনবাবু, একেবারে হতাশ হবেন না। শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে, কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্‌ করে মুক্তি না পেতেও পারেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। জলখাবার তৈরি।

[নৃপবালা ও নীরবালার প্রস্থান

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছি রসিকবাবু। জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন।

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়। (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এঁদের তো প্রতারণা করে যেতে পারব না।

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড।

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্তব্য কী।

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে।

রসিক। আপনারা দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন। কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন করেই হোক আমি আপনাদের উদ্ধার করবই।

শ্রীশ ও বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল

ঘরের অন্য দিকে অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। দেখলে তো বাবা, কেমন ছেলে দুটি ?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ কথা তো আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

জগত্তারিণী। মেয়েদের রকম দেখলে তো বাবা ? এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। ঐ তো ওদের দোষ। কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্বাদ ক'রে ছেলেদুটিকে দেখতে হচ্ছে।

জগত্তারিণী। সে কি ভালো হবে অক্ষয়। ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে।

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্বাদ করে গেলেই চট্‌পট্‌ স্থির হয়ে যায়।

জগত্তারিণী। তা বেশ, তোমরা যদি বল, তা যাব, আমি ওদের মার বয়সী— আমার লজ্জা কিসের।

পুরবালার প্রবেশ

জগত্তারিণী। কী আর বলব পুরো, এমন সোনার চাঁদ ছেলে।

পুরবালা। তা জানতুম। নীর-নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে।

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি।

পুরবালা। আচ্ছা, থামো। যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করো গে; কিন্তু শৈল গেল কোথায়।

অক্ষয়। সে খুশি হয়ে দরজা বন্ধ করে পুজোয় বসেছে।

শ্রীশ ও বিপিনের নিকট আসিয়া

ব্যাপারটা কী। রসিকদা, আজকাল তো খুব খাওয়াচ্ছ দেখছি। প্রত্যহ যাকে দু বেলা দেখছ তাকে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নূতন আদর, পাতে যা পড়ছে তাতেই খুশি হচ্ছেন। তোমার আদর পুরোনো হয়ে এল, তোমাকে নূতন করে খুশি করি এমন সাধ্য নেই ভাই।

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এ পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে— এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্ছেন নাকি। ওহে রসিকদা, ভুল কর নি তো?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়োমা জানেন তাঁর বুড়ো রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কী রসিকদাদা। করেছ কী। সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি।

অক্ষয়। সে বেচারাদের কী গতি হবে।

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরীর বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করেছেন। বনমালী ভট্টাচার্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকম হবে। এইবেলা ভ্রম সংশোধন করে নাও। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু, কিছু মনে কোরো না— এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিকবাবু সে রহস্য আমাদের নিকট ভেদ করেই দিয়েছেন। আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি।

বিপিন। মিষ্টান্নের থালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কী বিপিনবাবু। তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশুনে, ইচ্ছাপূর্বক?

রসিক। না না, তুমি ভুল করছ অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল নাকি।—

গান

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়।
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়।
আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে উছলিয়া হোক কূলময়।

রসিক। এ কী, বড়োমা আসছেন যে!

অক্ষয়। আসবারই তো কথা। উনি তো কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগত্তারিণীর আশীর্বাদ। জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগত্তারিণীর আলাপ

অক্ষয়। মা বলছেন, তোমাদের আজ ভালো করে খাওয়া হল না, সমস্তই পাতে পড়ে রইল।

শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি।

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে ওটা তৃতীয় কিস্তি।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

জগত্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্তা কও বাছা, আমি আসি। [প্রস্থান

রসিক। না, এ ভারি অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কী হল।

রসিক। আমি ওঁদের বার বার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন, কোনোরকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিকবাবু। আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ তো, এমনিই কী মহাবিপদে ফেলেছেন।

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই।

রসিক। না না, শ্রীশবাবু, সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে—

বিপিন। রসিকবাবু, আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না— দায়ে পড়ে—

রসিক। দায় নয় তো কী মশায়। সে কিছুতেই হবে না। আমি বরঞ্চ সেই ছেলেদুটোকে বনমালীর হাত ছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনো ফিরিয়ে আনব, তবু—

শ্রীশ। আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি রসিকবাবু।

রসিক। না না, এ তো অপরাধের কথা হচ্ছে না। আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন— আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না— এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করছি— আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করছেন কেন।

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না।

বিপিন। নিশ্চয় দেব, যদি না আপনি স্থির হয়ে শুভকর্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনো সাবধান করছি—

গতং তদ্‌গাম্ভীর্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ
সখে হংসোত্তিষ্ঠ ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

শ্রীশ। কিছুতেই না। তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুঁড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছুতেই এখান থেকে নড়ছেন না।

রসিক। স্থান খারাপ বটে, নড়বার জো নেই। আমি তো অচল হয়ে বসে আছি— হায় হায়—

অয়িকুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। চন্দ্রবাবু এসেছেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর-দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হোক।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই-যে, আপনারা এসেছেন। পূর্ণবাবুকেও দেখছি।

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে।

চন্দ্রবাবু। অক্ষয়বাবু। তা, বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল।

অক্ষয়। আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি— বলুন কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। আমি ভেবে দেখেছি আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে। শ্রীশবাবু বিপিনবাবুকে এই কথাটা একটু ভালো করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ।

চন্দ্রবাবু। একবার একটা মতকে ভালো ব'লে গ্রহণ করেছি ব'লেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য—

চন্দ্রবাবু। কেন বাহুল্য। আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে—

চন্দ্রবাবু। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনো সেই মতেই—

রসিক। এই-যে পূর্ণবাবু আসছেন। আসুন আসুন।

পূর্ণর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমারব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। কিন্তু, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে পারলেই—

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করি নি চন্দ্রবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপনার মতো বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে—

রসিক। ফল যা পেয়েছি 'তা ফলেন পরিচীয়তে'।

চন্দ্রবাবু। কি বলছেন ভালো বুঝতে পারছি নে।

অক্ষয়। ওহে রসিকদা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই এনে উপস্থিত করছি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ভালো আছেন তো?

পূর্ণ। হাঁ।
বিপিন। আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে।
পূর্ণ। না, কিছু না।
শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।
পূর্ণ। না।

নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (নৃপবালা ও নীরবালার প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু, ইনি তোমাদের গুরুজন, এঁকে প্রণাম করো। (নৃপ ও নীরর প্রণাম) চন্দ্রবাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুটি সভ্য বাড়ল।
চন্দ্রবাবু। বড়ো খুশি হলেম। এঁরা কে।
অক্ষয়। আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এঁরা আমার দুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরো ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিকবাবু এই যুবক-দুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন সে কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা নয়।
চন্দ্রবাবু। বড়ো আনন্দের কথা।
পূর্ণবাবু। শ্রীশবাবু, বড়ো খুশি হলুম। বিপিনবাবু, আপনাদের বড়ো সৌভাগ্য। আশা করি অবলাকান্তবাবুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরও একটি—

নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। নির্মলা, শুনে খুশি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।
নির্মলা। কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত তো নেওয়া হয় নি— তাঁকে এখানে দেখছি নে—
চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম— তিনি আজ এখনো এলেন না কেন।
রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরো আশ্চর্য হবেন।
অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।
চন্দ্রবাবু। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।
অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না— বাসরঘরে ভূতপূর্ব কুমার-সভাটিকে সাধ্যমত পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন। এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন।
শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্তবাবু—
অক্ষয়। আপনারা মত-পরিবর্তন করেছেন, ইনি বেশ-পরিবর্তন করেছেন মাত্র।
রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করলেন।
চন্দ্রবাবু। নির্মলা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।
নির্মলা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্তবাবু—
অক্ষয়। নির্মলা দেবী ঠিক বলেছেন— অন্যায়। কিন্তু, সে বিধাতার অন্যায়। এঁর অবলাকান্ত হওয়াই

উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কী হবে ? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল— আমার মতো অযোগ্য—

চন্দ্রবাবু। কিছু অন্যায় হয় নি পূর্ণবাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মলা না বুঝতে পারেন তো সে নির্মলারই বিবেচনার অভাব।

[নির্মলার নতমুখে নিরুত্তরে প্রস্থান

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর— প্রজাপতির আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন— কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরোবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈলবালা। পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না।

বিপিন। নিষ্কৃতি চাই নে।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল। এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক—

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল— গণেশ, কার্তিক, পার্বতী, তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদি ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।" রায়বাহাদুর বলিলেন, "টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।" দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামসুন্দর বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।"

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া অপমান তো সহা যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি

পড়িয়াছে ; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এ দিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁচা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, "আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।" শাশুড়ি ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।"

এমন-কি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, "ঐ ঢের হয়েছে।" অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন ; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারও-বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়িবিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্বকেশে শুষ্কমুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।" রামসুন্দর বলিলেন, "আচ্ছা।"

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই— নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন-কি, কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোট-কখানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন ; শহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন ; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ হাঁ বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।" এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র

তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারও মুখে আসে না— কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সে-সকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "সে এখন হচ্ছে না।" এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল— তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি'— খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, "দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?" বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তার পরে রামসুন্দর কহিলেন, "এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোনো গোল নাই।"

এমন সময় রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?"

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, "তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?" রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?"

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?"

নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"

রামসুন্দর বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি তা হলে তোর বাপের অপমান আর তোরও অপমান।"

নিরু কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ টাকা চান না।"

রামসুন্দর কহিলেন, "তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।"

নিরুপমা কহিল, "না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এ দিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়, এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন, তবে শাশুড়ি বলিতেন, "নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।" কখনো-বা বলিতেন, "দেখো-না একবার, ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।"

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, "ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।" অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল, "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।" শাশুড়ি বলিলেন, "কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।"

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না— যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরিদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল— এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এ দিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, "আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।" রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

১২৯৮ ?

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস ; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়— কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয় এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না— বলিত, "কী গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস্‌ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে ?" সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে

বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বার বার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন!' রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন— মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না; মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন

অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে ?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে ; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল— 'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে ; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই ; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।"

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।"

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না ; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না"— বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো

চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন— একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টআপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

১২৯৮?

গিন্নি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নীচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের দুই একত্রে ছিল। এ দিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ও দিকে তীব্র বাক্যজ্বালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মতো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই; ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মতো ভক্তি করে না; এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন; এবং মাঝে মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারও ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালিমূর্তি কি ধরা পড়ে না।

যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারও ভ্রম হইত না; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নাই। সুরলোকবাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুশি হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশি, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথপণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বৈ আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশি ভালোবাসে; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই না স্বীকার করে, এমন-কি, নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন-কি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়, মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশি মূল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেয়ে বানি, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়মবশত পণ্ডিতমহাশয় যখন শশিশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষত উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে।

আশু ক্লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড়ো লাজুক ; বোধ হয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত ; বেশ পড়া করিত ; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবামাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সেজন্য বড়ো অপ্রতিভ ; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে-যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছু, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছুক। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর-কোনো ত্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথপণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারিত না। সেজন্য মাঝে মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পিঠ নিচু করিয়া দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন ; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিতমহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শ্লেট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণ্ডিত শুষ্কহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে গিন্নি আসছে।"

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন্, তোরা সব শোন্।"

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণশক্তি সবলে বালককে নীচের দিকে টানিতে লাগিল ; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোটো বোন আছে ; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর কেহ নাই, সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দুই-চারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছুটিতে, গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারই আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল, কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের পুরুতঠাকুর হবে?"

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপণ্ডিত ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া এক দৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথপণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশুর 'গিন্নি' নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া চারি দিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল; এমন সময় একটা ঘণ্টা বাজিল, অন্য সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ কান টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন— ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া 'গিন্নি গিন্নি' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনোকালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

১২৯৮ ?

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

যাহারা বলে, গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্তূপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।"

এ দিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো!" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।"

রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন— কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই— এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য

কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হইয়াছে দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল 'মায়াকান্না'। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল— বলিল, "মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে—"

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন— এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে— কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমত আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, "দেখিব মুখাগ্নি কে করে— এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়। গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ্‌ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, "রাম, আমি যদি ক্রিশ্চান হই তো গোমাংস খাই।" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, "বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুই-চারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা নূতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।—

"ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বুঝি ? ওগো, তেমন যত্ন করে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।— তোরা একটুকু থাম, মেলা চেঁচাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো— আমি কেন বেঁচে রইলুম।" রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সে আমাদের কপালের দোষ।'

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়িসমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন— অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবদ্বীপের মা ফোঁস্‌ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না ; দাদা বললেন 'লেখ', ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ঐ কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্‌ পোড়ারমুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে— আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগগির মরছি নে।"

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এইসকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশে

ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোনার নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ-বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না ; সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে উইলখানি বাহির করিয়াছে, তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয় ; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন-কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি।" ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন— অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল— নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, 'রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর'— যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন, তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল-যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা এ কি সর্বনাশ করিয়াছিস!" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠির পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়!

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন— আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপ দুইদিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে

নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন— বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, "বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।"

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, "বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল— আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল; আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, "আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত"— কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

১২৯৮?

ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশুর যখন দন্ত এবং বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই, তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে এবং শিশুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শিরশ্চালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে ত্রুটি করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুর্মূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তরবাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক-একটি স্বভাব আছে যে, একটি ছোটো খেয়াল কিংবা একটি ছোটো শিশু কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করে ; এই বিপুল পৃথিবীতে একটিমাত্র স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তার পরে হয়তো সামান্য উপস্বত্বে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর-একটু বাড়িল, তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তর তারতম্যসত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছু ছিল না।

এইরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, চারি দিকেই তাহার মনের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমপ্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের শখ, হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির শখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মতো বাড়িয়া উঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহলদৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজবপন, কলম করা, সার দেওয়া, চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যান খণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যতপ্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব, তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া, গুড়গুড়ি লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোনো বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া হাতমুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনই তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত, এতক্ষণ ধৈর্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুইজনে বেঞ্চের উপর বসিত— দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত ; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না, তাহাও তাহার ভালোলাগিত ; যে-সকল কথা আর-কাহারও নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড়ো কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমত তাহার মাথায় জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বেঠিক কথাও বলিত, কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে

মাঝে দুটো-একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত, এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিনেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল ; প্রমাণ হইয়া গেল, নালা তাহারই এবং পাতিনেবুতে আর-কাহারও কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল কিন্তু নালা এবং পাতিনেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন-কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, এবং হিমাংশুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।

যেদিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সেদিন বাড়িতে বিশেষত অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্ণে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদিতে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীতে আর-কাহারও কিছু হয় নাই, কেবল তাহারই একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সেদিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়াকাপড় ঝুলিতেছে ; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল— হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষণ্ণমুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্ত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কে ও।"

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মামা, আমি।"

মামা বলিলেন, "কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।"

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল হিমাংশুদের বাড়ির জানলাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল ; দরজার ফাঁক দিয়া যে-দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশুদের বাড়ির সমুদয় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল, মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত, সে-যে একদিনও আসিবে না, এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনো মনে করে নাই, এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে ; এমন নিশ্চিন্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ কখন সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু একমুহূর্তে-যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ

ঘটিত, তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবার দিনে ভাবিল, পূর্বনিয়মমত আজও হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিলেই আসিবে।' ঘুম কখন ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দুরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুটি কাতর চক্ষু বড়ো-একটা মর্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দয়াময়!'

১২৯৮ ?

তারাপ্রসন্নের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না, এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজবুক রকমের মনে করিত এবং লোকেরও দোষ দেওয়া যায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারাপ্রসন্নকে বলিলেন, "মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একমুখে বলতে পারি নে"— তারাপ্রসন্ন নিরুত্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয়, 'তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার যে আনন্দ হয়েছে, এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি।'

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী যখন সায়াহ্নের প্রাক্কালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে মধ্যে বিনীত কাকুতিসহকারে ভোজ্যসামগ্রীর অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসন্নকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে থাকেন, "এ কিছুই না। অতি যৎসামান্য। দরিদ্রের খুদকুঁড়া, বিদুরের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলই কষ্ট দেওয়া"— তারাপ্রসন্ন চুপ করিয়া থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে মধ্যে এমনও হয়, কোনো সুশীল ব্যক্তি যখন তারাপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মতো অগাধ পাণ্ডিত্য বর্তমানকালে দুর্লভ এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসন্ন তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না, যেন সত্য সত্যই সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। তারাপ্রসন্নের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আত্মনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যুক্তি করিয়া থাকে— অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অম্লানবদনে গ্রহণ করে, তবে বক্তা আপনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্নের ভাব অন্যরূপ ; এমন-কি, তাঁহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানলুম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্‌যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসন্নের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না ; শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন, "তোমার একটি বৈ স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।" শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না— স্বামীর সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন, যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়, এমন-কি, নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে কোথাও দেখেন নাই।

তিনি মনে মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, "এ-সব লেখা ছাপাও।"

স্বামী বলিতেন, "বই ছাপানো সম্বন্ধে ভগবান মনু স্বয়ং বলে গেছেন ঃ প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বৈ আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই বিবাহ দিতে হইবে, এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্তমুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও, তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসন্ন কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সত্য নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্‌বিগ্নভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চলো, তোমার বইগুলা ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জানুক— তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কি না।"

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া বসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াসুদ্ধ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রীকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলিতাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে-টাকা'টি পাইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বই রেজেস্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে। অন্নদা, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন— তার পরে নিজের বড়োমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি ? তা নে-না মা, পড়্-না। তাতে লজ্জা কী।" বাবার বহির প্রতি শশীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ঐ আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশসুদ্ধ সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিল, "এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্‌ড্‌সের লন্ডনরহস্যের বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল, "দেশের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক-নবেলের পরিবর্তে যদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে বাহির হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।"

যে ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে বেদান্তের নাম কখনো শুনে নাই সেই কেবল লিখিল, "তারাপ্রসন্নবাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই— স্থানাভাববশত এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।" কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরি ছিল এবং ছিল না, তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, 'আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে।' চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু পুলকিতচিত্তে ঘর হইতে মাসুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরিতে 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপ অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফস্বল হইতে কে-একজন তাঁহার এই বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যালুপেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাসুল দণ্ড দিতে হইয়াছে, সেইজন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে-কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি 'গৌড়বার্তাবহ' আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে মেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন ; এবং তাঁহার লেখনীর মুখে মানসিক পুষ্পচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন 'নবপ্রভাত' আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড 'যুগান্তর' বাহির করিলেন। তাহার পর ? তাহার পর 'ভারতভাগ্যচক্র'। তাহার পর ? তাহার পর 'শুভজাগরণ'। তাহার পর 'অরুণালোক', তাহার পর 'সংবাদতরঙ্গভঙ্গ'। তাহার পর— আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরী-প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক, লাবণ্যলতিকা। হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর-একবার স্বামীর কীর্তিরশ্মিসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন— স্বামী বলিলেন, "এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম, লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "আহা, ও-সব কথা নয়— আর কী আনলে বলো-না।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "কতকগুলো চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "টাকা কত আনলে।" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে— এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, ওপাড়ার বিশ্বম্ভর চাটুজ্যে তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাঁহারই চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাঁহার স্বামী কলিকাতায় যাত্রা করেন, তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বম্ভর মাঝে মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্তা কয় না কি, এইজন্য তখন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো বুঝা যাইতেছে।

এ দিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থসংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গুণ দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর, বিধুভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল, কেবল যে মেয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মিবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্র মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

আসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারাপ্রসন্ন পাগলের মতো হইয়া বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া বলিল, "দাদা, আমার এই খানপঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।"

বিশ্বম্ভর বলিল, "ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব, তুমি বই লইয়া যাও।" এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, "যখনই তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না। আর, সেই সন্ন্যাসীর মাদুলিটা

কখনোই খুলিয়া রাখিয়ো না।" আর এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধ মাদুলি এবং মাথার দিব্য-সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তার পরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপিচুপি বলিলেন, "দেখো, আমার যে মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো 'বেদান্তপ্রভা', তার পরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।"

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। মনে মনে কহিলেন, 'কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।'

ধাত্রী যখন বলিল, "মা, একবার দেখো, মেয়েটি কী সুন্দর হয়েছে"— মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন 'বেদান্তপ্রভা'। তার পরে ইহসংসারে আর-একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

১২৯৮ ?

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ, ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন -কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্‌সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, 'মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।'

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার— এবং যখন মাকে

মা, পিসিকে পিচি; এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন'। বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত— আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন, ফু।'

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই ; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না— তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'দেখো দেখো ও— ই দেখো পাখি— ঐ উড়ে— এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।' এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা— বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, 'তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।' বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—

দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু— খোকাবাবু— লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় 'বাবু' 'খোকাবাবু আমার' বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, 'জানি নে মা।'

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন-কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, 'তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে— তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।' শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, 'কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না— রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে

না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না ; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ— কেশবেশ বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে— তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়— কিন্তু, যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল 'জয় হোক মা'।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে রে।'

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি রাইচরণ।'

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, 'মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।'

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—'

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, 'বলিস কী রে। কোথায় সে।'

'আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।'

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ— বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?'

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।'

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।'

কর্ত্রী বলিলেন, 'আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।'

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, 'যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।'

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, 'আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।'

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।'

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, 'সে আমি নয় প্রভু।'

'তবে কে।'

'আমার অদৃষ্ট।'

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, 'পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।'

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু, তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, 'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল;

তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎবৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

সম্পত্তি-সমর্পণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহাক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, 'আমি এখনই চলিলাম।'

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, 'বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহার পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো না।'

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন ; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা-আহারবিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়া-পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়া-কালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তারপরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রী হত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, 'কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না ? দামি ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে ! যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে।'

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, 'আমি চলিলাম।'

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধন-গ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; বিশেষত, যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল এ কালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল ; বলিল, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপর যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল, বৃন্দাবন কখন তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা তাঁহার সর্বদাই ছিল— যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষেরকল্পনা সর্বদা লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি বৎসর -বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়া-পরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল ; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুশকিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে ; বিশেষত বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্পীঅঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরো অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল ; এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল ; সেটি পলিতা-প্রস্তুত-করণ কিংবা অন্য কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন-কি, বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন-কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্ন ভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপূর্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে 'যজ্ঞনাশ' বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে 'চামচিকে' বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনোপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন ; দেখিলেন একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল— আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছু দূর যাইতে-না-যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মাণবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এরূপ অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী।'

সে বলিল, 'নিতাই পাল।'

'বাড়ি কোথায়।'

'বলিব না।'

'বাপের নাম কী।'

'বলিব না।'

'কেন বলিবে না।'

'আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।'

'কেন।'

'আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।'

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়বুদ্ধিহীনতার পরিচয় তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, 'আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?'

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এমনই অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্বাহ্ণেই তাহার পুরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ, কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশি দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, 'ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইব।' বালকের বয়স অল্প, কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, 'আহা, বাপ-মা'র মনে না-জানি কত কষ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়!'

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য-উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল ; ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারংবার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।'

বালকের ভারি কৌতূহল হইল ; কহিল, 'কোথায় দেখাইয়া দাও-না।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।'

নিতাই এই নূতন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ভারি মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে বলিল, 'চলো।'

যজ্ঞনাথ বলিলেন, 'এখনো রাত্রি হয় নাই।'

নিতাই আবার কহিল, 'রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।'

নিতাই মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল, 'এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।'

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রাসংবরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, 'এইখানে?'

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগৃহত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল নিম্নে একটা ঘরের মতো এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল হইল, সেইসঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল চারি দিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা, পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।'

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, 'সমস্তই! ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?'

'যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিংবা তাহার ছেলে কিংবা তাহার পৌত্র কিংবা তাহার প্রপৌত্র কিংবা তাহার বংশের কেহ আসে

তবে তাহার কিংবা তাহাদের হাতে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবে।'

বালক মনে করিল, যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, 'আচ্ছা।' যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'তবে এই আসনে বইস।'

'কেন।'

'তোমার পূজা হইবে।'

'কেন।'

'এইরূপ নিয়ম।'

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল, 'দাদা।'

যজ্ঞনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন, 'যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিংবা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিংবা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।'

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত-পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'দাদা, কোথায় যাও।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্— তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।'

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল, 'দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।'

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা।'

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙা মন্দিরের ইঁট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন অনেকদূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মুখ চাপা দিতে চাহে। ঐ কে ডাকে 'বাবা'।

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, 'চুপ কর্। সবাই শুনিতে পাইবে।'

আবার কে ডাকে 'বাবা'।

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল।

সেখানেও কে ডাকিল, 'বাবা।' যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, 'বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে, তাহাকে দাও।'

বৃদ্ধ চোখ মুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'তোর ছেলে ?'

বৃন্দাবন কহিল, 'হাঁ, গোকুল— এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি, নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।'

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেল। কহিল, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ ?'

বৃন্দাবন কহিল, 'না।'

'কান পাতিয়া শোনো দেখি বাবা বলিয়া কেহ ডাকিতেছে ?'

বৃন্দাবন কহিল, 'না।'

বৃদ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ ?' পাগলামির কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল ; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাতড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল, 'নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।'

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধুপ্‌ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল।

পৌষ ১২৯৮

দালিয়া

ভূমিকা

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারই গৃহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, 'তিন্নি।' ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল— 'তিন্নি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্মে যে একেবারে হাত

লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো—'

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, 'বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি।'

'তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি।'

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'আমি।'

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। তার পর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কাজ-কাম কিছু জানিস?'

আমিনা কহিল, 'বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।'

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই থাকিবি কোথায়।'

জুলিখা বলিল, 'আমিনার কাছে।'

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, 'খাইবি কী।'

জুলিখা বলিল 'তাহার উপায় আছে'— বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, 'বুঢ়া, আর-কোনো কথা কহিস না। তুই কাজে যা, বেলা হইয়াছে।'

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল, 'ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে আর তো কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না।'

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, সর্বাপেক্ষা ছায়াময় বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই।'

জুলিখা বলিল, 'ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির।'

আমিনা হাসিয়া কহিল, 'দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।'

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, 'তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোটো ছিলি— কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ্, পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।'

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী-একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুঢ়া খাইতে পাইবে না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া কহিল, 'কেও।'

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল, 'তুমি তো তিন্নি নও।' যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে 'তিন্নি' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সংবরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি।'

যুবক কহিল, 'তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়।'

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, 'দিদি, ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ, ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদপি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।— দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলে।'

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, 'চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও তো তিন্নি নয়।'

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, 'ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।'

যুবক কহিল, 'চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না; বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।'

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, 'না, তুমি অতি বর্বর, শাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।'

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গিতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল, 'এমনি করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।' যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

'আবার সেলাম করো।' আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা যুবককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল, 'ঘরে প্রবেশ করো।' যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, 'একটু ঘরের কাজ করো। আগুনটা জ্বালাইয়া রাখো।' বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, 'দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগুলো এইরকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।'

কিন্তু আমিনার মুখে কিংবা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, 'বাস্তবিক আমিনা, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড়ো তাহার সাহস।'

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, 'দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ্ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।'

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না; হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্বর যুবকটার জন্য।'

আমিনা কহিল, 'তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি— দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এইরকম; দু-ঘা মারিলে ভারি খুশি হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ দেখো-না, ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি— বড়ো আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বল্ তো বোন। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।'

জুলিখা কহিল, 'আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।'

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।'

এমন করিয়া বলিল, যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই— পাছে অন্য কোনো মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, 'আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি?'

'আসিয়াছে।'

'কোথায় গেল।'

'সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ঐ ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।'

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, 'যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।' (থলু অর্থে স্বর্ণমুদ্রা)

আমিনা কহিল, 'ভাবনা নাই বুঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।'

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে; এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে এখানে কিছু দিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর-কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বরকুটিরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে,

চিত্রকার নিজের সদ্যসমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জুলিখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত; ভাবিত, সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, 'দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?'

'পারি। কেন বলো দেখি।'

'আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাই।'

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই।— যদি পরিহাস বলো তো এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, 'আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন— তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।'

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে— এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।'

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, 'জান দালিয়া?— আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।'

দালিয়া হাসিয়া বলিল, 'সে তো বেশিক্ষণের জন্য নয়।'

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারই পাগলামি।'

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, 'রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।'

দালিয়া কথাটা সংগত জ্ঞান করিয়া কহিল, 'ফেরা কঠিন বটে।'

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।'

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল, 'রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।'

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্মিত কারুকার্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পূর্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই-যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, 'বুঢ়া, তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে।'

বুঢ়া একেবারে বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল, 'বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে তাহাকে এই আঙটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্নি যাইবার সময় দিয়া গেছে।'

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার, নিস্তব্ধ, জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তব্য যখন দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল— এখন সে কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল; মনে মনে কহিল, 'নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি।'

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্র দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, 'দিদি।'

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছে। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল 'দালিয়া!'— আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে

চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল— ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঘ ১২৯৮

কঙ্কাল

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়।— অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না। এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে গির্জার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট-পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল এই-যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন আর মানুষের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল, একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম, সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। কিন্তু, তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, 'কেও।' পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম, 'আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।'

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখানো কিছু নয়— পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিলাম, 'এই দুপুর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক?'

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, 'বল কী। আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল— একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?'

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, 'হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।'

সে বলিল, 'তুমি একলা আছ বুঝি? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের

বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।'

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, 'সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো।'

সে বলিল, 'সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।'

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল—

'যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ, কোন্-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়িকে কহিলেন, শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই। সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।— শুনিতেছ ? কেমন লাগিতেছে।'

আমি বলিলাম, 'বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।'

'তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কী মনে হয়।'

'খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।'

'দেখ নাই ? কেন। আমার সেই কঙ্কাল। হি হি হি হি।— আমি ঠাট্টা করিতেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃতদন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না— এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থি-বিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনক-চাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর সকল মনুষ্যই অস্থি-বিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমি সৌন্দর্যরূপী ফুলের মতো ছিলাম। কনক-চাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে ?

'আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম— পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুলি ছিল।

'কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এইজন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত, আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।'

আমি বলিলাম, 'তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায়

নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণযৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকারপটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।'

'আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দু'টি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ঐ তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম ; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

'দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন— পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়— এইজন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

'তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এইজন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।— শুনিতেছ ? কী মনে হইতেছে।'

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, 'মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।'

'আগে সবটা শোনো। একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

'আমি জানালার দিকে মুখ করিয়াছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্ণ মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ ; অসংযমিত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

'ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, একবার হাতটা দেখিতে হইবে।

'আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না ?'

আমি বলিলাম, 'অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না— মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।'

'কালক্রমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

'আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

'কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হু হু করিয়া উঠিত।

'সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না ; যখন চলিতাম নত নেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের

অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে ; মধ্যাহ্নে জানলার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক-একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত ; এবং আমাদের উদ্যানপ্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর ধরিয়া 'চাই খেলেনা চাই' 'চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত, আমি একখানি ধব্‌ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম ; একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে ।— মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয় ।'

আমি বলিলাম, 'মন্দ হয় না । একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায় ।'

'কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গম্ভীর হইয়া পড়ে । ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায় । ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই ।

'তার পরে শোনো । একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির এক তলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন । তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কী করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম । ডাক্তারি কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত । শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল । ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম ।

'আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে— আর বড়ো বাকি নাই ।'

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, 'রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল ।'

'কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তারবাবু বড়ো অন্যমনস্ক এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ । একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন ।

'আমি আর থাকিতে পারিলাম না । দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ দাদা, ডাক্তারবাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন ।

'সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, মরিতে ।

'আমি বলিলাম, না, সত্য করিয়া বলো-না ।

'তিনি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন, বিবাহ করিতে ।

'আমি বলিলাম সত্য নাকি ।— বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম ।

'অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন ।

'কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী । আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব । পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই । পৃথিবীতে আমি একটিমাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি ।

'ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কী ডাক্তার মহাশয় । আজ নাকি আপনার বিবাহ ?

'আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন ।

'জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজনা-বাদ্য কিছু নাই যে ?

'শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের ।

'শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম । এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই । আমি বলিলাম, সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই ।

'দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনই রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

'আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম বধূ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব । জিজ্ঞাসা করিলাম—

আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন। হি হি! হি হি! যদিও মানুষের, বিশেষত পুরুষের, মনটা দৃষ্টিগোচর নয়, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

'অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

'আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ডাক্তারমশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। যাত্রার যে সময় হইয়াছে।

'এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম।

'কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

'ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদ্‌গদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তবে চলিলাম।

'বাঁশি বাজিতে লাগিল, আমি একটি বারাণসী শাড়ি পরিলাম, যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম— সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

'বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিনে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

'বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর-দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারি দিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

'ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসরঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসরঘর। আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়। নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে। বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্ করিত এবং যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত সেইখানে বেত্র নির্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর সেই-যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি।—

'গল্পটা কেমন লাগিল।'

আমি বলিলাম, 'গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।'

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখনো আছ কি।'

কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্গুন ১২৯৮

মুক্তির উপায়

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর, তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উঁচু দরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ-দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয় সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্‌গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়। একে নভেল-পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা। যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে করিল, 'বুদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

২

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গুরুতর কর্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিকা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে ; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ববর্তী এক বটবৃক্ষ-তলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারাপুত্র ধনজন কেহ কারও নয়। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।' বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিল—

শোন্ রে শোন্, অবোধ মন,
শোন্ সাধুর উক্তি— কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল— 'ও কে ও। বাবা দেখছি ! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি ! তবেই তো সর্বনাশ। আবার তো সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন। পালাতে হল।'

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী এক গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে হে তুমি।'

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী ! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের 'পরে ঝুঁকিয়া বুড়ামানুষ বহুকষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল— 'এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।'

বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই-একবার হাত বুলাইয়া লইল এবং প্রকাশ্যে কহিল, 'বাবা মাখন।'

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন ! আমার নাম তো মাখন নয়। পূর্বে আমার নাম যাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো পরমানন্দও বলতে পারো।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল্ আর পরমান্নই বল্, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না।— বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দুই স্ত্রী— বড়োটিকে না ভালোবাসিস, ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি, বুড়ো বাপ, কদিনই বা বাঁচব— তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁতকিয়া উঠিয়া কহিল, 'কী সর্বনাশ। শুনলেও যে ভয় হয়।'

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, 'মন্দ কী, দিন-দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।'

ফকিরকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, 'ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।'

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে ; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াসুদ্ধ লোক আরাম পায়— তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু, ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে

নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতিভীষণ অটল গাম্ভীর্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, 'আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপিস্বী হয়েছেন, চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেছেন।'

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরে মাখন, তুই কুচ্‌কুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্সা করলি কী করে!'

ফকির উত্তর দিল, 'যোগ অভ্যাস ক'রে।'

সকলেই বলিল, 'যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।'

একজন উত্তর করিল, 'আশ্চর্য আর কী। শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন, কিছুতেই তুলতে পারলেন না। সে কী ক'রে হল। সে তো যোগ-বলে।'

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, 'বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে।'

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই— হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, 'বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।'

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, 'তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।'

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু, রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুকুরের মতো তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'মা, আমি তোমাদের সন্তান।'

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্‌গের মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, 'ওরে ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বললি কাকে!'

অমনি আর-একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, 'চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস! তোর মরণ হয় না!'

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির জোড়হস্তে কহিল, 'আপনারা ভুল বুঝছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন!'

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, 'ঢের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেকদিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব।'

এরূপ এক-তরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না— কারণ, ফকির একেবারে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল। বলিল, 'এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁ শব্দ ছিল না। আজ মনে হচ্ছে, বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।'

ফকির করজোড়ে কহিল, 'মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন।'

ষষ্ঠী। বাবা, অনেকদিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা, মা তোমরা এখন যাও। বাবা মাখন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠীচরণকে বলিল, 'মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।'

বৃদ্ধ এম্‌নি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে

মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভণ্ডতপস্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালোমানুষের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, 'ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।'

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুৎসিত কথা কখনো শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফকির দেখিল এমনি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফদাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল; তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গোঁফদাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল— প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফর্মায়েশ করিতে লাগিল, আধুনিক বড়ো বড়ো নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল; আহারকালে কেসুরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল; লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেকদিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল— দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজন্য

ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না— তাহাদিগকে তিনি কীট-পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশু-পঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জইস অক্ষরের ছোটো বড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না ; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে 'বাবা' 'বাবা' করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।'

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, 'জানেন আপনার দুই স্ত্রী ?'

ফকির। আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন দেখতে পাচ্ছি।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্বে হতে বলে রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্যাদা গাম্ভীর্যকে খাতির করে না— প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়। ফকির অশ্রুসিক্তলোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল ; উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবুদ্ধির, তাহার মিথ্যা-গল্প-রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিল এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারি দিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল— এমন-কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়িকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।'

ফকির তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু, ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না ; আপাতত যে-কোনো একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীমূর্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল। ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, 'এ যে হৈমবতী!'

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল; অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি; তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।'

দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, 'এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।'

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

চৈত্র ১২৯৮

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

১১

রসের ধর্ম

আমাদের ধর্মসাধনার দুটো দিক আছে, একটা শক্তির দিক, একটা রসের দিক। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত, এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন, এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি, এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা ; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতো দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে, সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায়, তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে— কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না ; এইজন্যে যে-সব জিনিস সংসারের জোয়ারে ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরই তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা-কিছু হারায়, যা-কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায়, তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে, কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলই তার মনে হয় সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলই তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই-সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্তি দেখতে পায় না। যে লোক ডুবজলে সাঁতার দেয়, যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি-কলসি কলার ভেলা তার পরমধন— তার ভয় ভাবনা উদ্‌বেগের সীমা নেই। আর, যে ব্যক্তির পায়ের নীচে সুদৃঢ় মাটি আছে, তারও হাঁড়ি-কলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়ি-কলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়— এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তা হলে তার যতই অভাব অসুবিধা হোক-না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্‌বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে, তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সে মনে মনে জানে, ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি— বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড়ো জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে মাটির উপরে আমাদের ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুনতে সহজ, এবং শোনবামাত্রই অনেকে হয়তো বলে উঠবেন যে, ঈশ্বর সত্য, এ কথা তো আমরা অস্বীকার করি নে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন, এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য, এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারি নে। আমাদের মন সেই পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক-না কেন, যিনি চরমসত্য পরমসত্য তিনি আছেন এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমনভাবে জীবনের কাজ করে, আমরা কি তেমনভাবে করে থাকি।— আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন— সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারই আছেন— জীবনে যত উলটপালটই হোক, এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না, এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্ছে বিশ্বাসী ; তিনি আছেন, এই সত্যের উপরে সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন, এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর-যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন, এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে— এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত তা হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে— সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থক রূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ— তার চলাফেরা আসা-যাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল— সে কঠিন নয় বলে, নম্র বলে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে ; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে— এইজন্যেই কেবলই সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন-কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে— তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে ; সে অন্যকে আঘাত করে ; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে ; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না বলে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্য দিকে আছে, তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে বলে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না ; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর করে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল বলে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন বলে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়— সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গিময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্যচলনশীল প্রাণের লীলা ! শুষ্কতায় অনম্রতায়

তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিসটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায়, এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে নম্রতা— যে নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিনের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের সুরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে : চারি দিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে ; যে নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে, এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা— শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত ; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে, রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে— আনন্দের ধর্মই হচ্ছে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না— অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়— এমন-কি, যে রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্যে যে লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত। যেখানে তিনি সুন্দর ; যেখানে রসো বৈ সঃ ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না ; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না ; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয় ; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা ! স্নেহের আনন্দভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়ো কথা— তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, এ-সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোটো ; তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে-ভঙ্গিতে হাসিতে-গানে রসে-গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা— তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়— একটি অটল নিয়মে, আর-একটি সুনম্র সৌন্দর্যে, এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাঁকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য মিলবে বলেই, ধরা দেবে বলেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্য কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে ; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে ; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে— এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই-সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এইজন্যে আপনার ধর্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে ; ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক করে রেখেছে। নিজের

মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল, বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলই দূর করছে, কেবলই ভাগ করছে, নিজেকে কেবলই সংকীর্ণ বদ্ধ করে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করছে। হিন্দুর ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলই বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারি নে। কারণ, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার উপরের জিনিস। ক্রীতদাস রাজাকে খুন করে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয়, স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল করে বসে, তা হলে সেইরকমের অন্যায় ঘটে। এইজন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে থাকলেও, ধর্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে— বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে সেইখানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্রপথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে, মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ, তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি— তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারই হাতে দিতে চেষ্টা করছি, যে-জিনিসটা ধর্মের চেয়ে নিচেকার। আমরা স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বলছি, তা না হলে আমরা বড়ো হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে! এমন দশা হয়েছে যে, ধর্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম আমাদের পৃথক থাকতে বলছে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করছে!

কিন্তু ধর্মবুদ্ধি যে মিলনের ঘটক নয়, সে মিলনের উপর আমি ভরসা রাখতে পারি নে। ধর্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলই গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোলবার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোটো বড়ো সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব— নতুবা কেবলমাত্র প্রয়োজনের বা স্বাজাত্য-অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি, তবে ধর্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদপার্থক্য, এত বিরোধবিচ্ছেদ গলতে পারবে না— মিলতে পারবে না।

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খ্রীস্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন, তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক

বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল, তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনই সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন-কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তার সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেননা দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়— সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখস্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট ; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে ; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয় ; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে, কর্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয়— সে তাঁর অলংকার ; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তার ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এইজন্যে মানবসমাজে কর্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না— তাঁরা অনায়াসেই কর্মকে শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে-যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে-যে ভক্তিকে অপমান করা হয় ; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়— দুঃখে নম্রতা ও কর্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন কর্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয়, তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন ; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্বর করে সে চলতে থাকে ; তখন নুড়িপাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সংগীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই-সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে— এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজেরই গতি— সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলই নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনই মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনই তার ওঠাবসা খাওয়াপরা সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনই সে সেই-সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলই একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয় ; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে। তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান, তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন ; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান, তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্ছে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্যে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়— তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে ; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

গুহাহিত

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন— গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং— অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে— তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তা হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না ; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে বলেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ করে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে চারি দিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্ছে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে বের করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল ? যা-কিছু পাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্ছি নে— যা পাচ্ছি নে, তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে, এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল ?

পশুদের মনে তো এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারই মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে— মুহূর্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারছে না বলে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না— এমন-কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে, 'দেখতে পাচ্ছি নে কিন্তু আরো আছে, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আরো আছে।'

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সেরকম নয়— এ আচ্ছন্ন বলে গুপ্ত নয়, এ গভীর বলেই গুপ্ত, সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নিচেকার মুথার প্রকৃতিগত কোনো প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমানরকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে, প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে— সাদৃশ্য নেই। তা খনির ভিতরকার খনিজের মতো তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিস নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চেয়ে বেশি মূল্যবান রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর-কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে— তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এইজন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকুমাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি— এইজন্যে কোন্ সুদূর অতীতকালে ক্যালডিয়ার মরুপ্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথরাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্করহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ নিদ্রাহীন নেত্রে যাপন করেছে— তাদের যে মেষরা চরছিল্ তার মধ্যে কেহই একবারও সেদিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে, তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এককে আর বলে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই, সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে যে সত্য বলে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জালফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলেছে, তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে— কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার— আফ্রিকার বন্যবর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয় পাই, তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য— এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না। এখানে সমুদ্র-পর্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না, বারংবার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না— এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে।

মানুষ যে দ্বিজ ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয় ; তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে

মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি— এমন-কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনই মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে, ভূমার দিকে অগ্রসর হয়— তখনই মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম, যা প্রত্যক্ষ, তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত ; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে— সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক ; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা-কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না— তাকে মাপ করে ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ই নেই— তাকে যদি কোনো স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, 'কী তুমি পেলে একবার দেখি'— তা হলে বিষম সংকটে পড়তে হয়। এমন-কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি, ভারী জিনিস হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে, 'আমি সমুদ্র দেখব, আমি হিমালয় পর্বত দেখব', তবে তাকে এ কথা বলতে হয় না যে, 'আগে তোমার চোখদুটোকে মস্ত-বড়ো করে তোলো তবে তোমাকে পর্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব'— কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বলতেই হয়, 'একটু রোসো ; গোড়া থেকে শুরু করতে হবে ; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করো তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেললেই চলবে না, কান খুললেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' মূঢ় যদি বলে, 'না, আমি সাধনা করতে রাজি নই, আমাকে তুমি এসমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মতো সহজ করে দাও', তবে তাকে হয় মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয় তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেকসময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি'— বলে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চোখের সম্মুখে যেমন-খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা হলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন ; এরকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর বলেই তাঁকে চায়— সেই গভীর আনন্দ আর-কিছুতে মেটাতে পারে না বলেই তাঁকে চায়— চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে, তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে-সমস্ত কিছু চায় না বলেই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো— এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার 'গুহাশয়' রূপেই তাঁকে পাবে ; অন্য রূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না ; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে, তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না— তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে কি ইতিহাসে, কি শিল্পে, কি ধর্মে কি কর্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য— ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই কথাটি যে মানুষ বলতে পেরেছে, এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এইজন্যেই সে

গভীরকে চায়— তবু যদি তুমি বল, 'আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝছি, তার মতো কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজ-দেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা-কিছু পাওয়ার মতো পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ করে তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মতো সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এইজন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে— বারংবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারছে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে; ভালোবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য হোক, একে সে কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না, তাকে বলতেই হবে, 'যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য, তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন-ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন— কেননা, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।'

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম করে গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা করে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে। মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ কথা বলে না, 'টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।'— টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মতো সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উলটা কথা বলতে যাব। কেন বলব, 'তাঁকে আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই।' কেন বলব, 'আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ করে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।'

না, কখনো তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে। হে গূঢ়, তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্ছে, তার বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে, তার জীবনমরণের তুচ্ছতা দূর করছে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম সুর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ঐ অনির্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ, এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গুহাহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলংকার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে, তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটোচ্ছে— তারা বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে— তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলই ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা

সুলভ করতে চেয়েছে, তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারই চিরন্তন বন্ধু ; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ— সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুর্পণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ঐ পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চলব— আমার সমস্ত যাত্রাসংগীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে— পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে, কোনো ছোটোকে, কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে— আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সংকল্প ত্যাগ করে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

২৩ চৈত্র ১৩১৬

দুর্লভ

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

'পারি নে' যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারি নে ; যেমন করে নিশ্বাস গ্রহণ করছি, কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্ছে না, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারি নে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয় ; ইন্দ্রিয়বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্মবুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বলবে 'আমি পারি নে' সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে ; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চলতে শিখতে হয় নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বার বার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে ; 'আমি পারি নে' বলে সে নিষ্কৃতি পায় নি। মাঝে মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই-সব মানুষ জন্তুদের মতো হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেইজন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়া হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনই সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনই পৃথিবীর উপরে সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবনযাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে ; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানছে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল, তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষের কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহু কষ্টে শিখতে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, চলা বলা, এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়মসংযম মানলে তবে চার দিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার

প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়— ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকারলাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখছি, কানে শুনছি, তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এইজন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড়ো একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়— তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুঁড়িপঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয় এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখতে পাই, মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করছে। আহারের জন্য রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল, সর্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে 'পারি নে', তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারই মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে— সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, অনাবশ্যক দুঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর-কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিসটা নেই। যেটা সহজ, যেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখলে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে, সে কেবল প্রয়োজনসাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্যসাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এইজন্যেই যে ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই, সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুনতে পাই বারংবার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে, তখন এই কার্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের একটা-কিছু কষ্টের হেতু আছে— এমন একটা-কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে 'পারি নে' এ কথাটা বলতে দেওয়া হয় নি, তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে, সত্য হবে, এ সম্বন্ধেও 'পারি নে' বলা তার চলবে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে, আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায়, তবেই এ কথা বলা তার সাজবে না যে, 'আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়'।

যতই সহজ ও যতই আরামের হোক, তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মতো চলে বেড়াব না, মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে— এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে বলে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয় নি, বরঞ্চ পশুর চেয়ে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনই আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর-একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলই সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মতো ধুলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না— অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি, তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে বলে হাতের ব্যবহার পায় না, তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে চার পায়ে চলে বলে কেবল চলে মাত্র, সে ভালো করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারে না। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখেছেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়— তাঁদের দুই

হাত মুক্ত হয়েছে— তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে— তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা।

যে সৃষ্টিকর্তা সে আপনাকে সর্জন করে ; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে। যে পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি ; আমাদের চিত্ত যে পরিমাণে স্বার্থবর্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম সৃষ্ট হয়ে ওঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন, তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে 'পারি নে' বললে চলবে না ; চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার মহতী বিনষ্টিঃ।

যে ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই নিজেকে উৎসর্জন করছে, যিনি 'আত্মদা', আমি জলে-স্থলে-আকাশে সুখে-দুঃখে সর্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি, এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্ছে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্ছে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা। অনেকবার টলতে হবে, বার বার পড়তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না 'তবে বুঝি পারব না'। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এই দিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে— এইজন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না, তাকে বরণ করে নেয়— এইজন্যেই মানুষ এতবড়ো একটা আশ্চর্য কথা বলে জগতের অন্য-সকল প্রাণীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

জন্মোৎসব

বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ— এতে আমার অনেকদিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগে নি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করে নি।

বস্তুত, নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল, সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন, উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড়ো করে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে— সংসারে তার আবির্ভাব-যে পরমরহস্যময় এবং সে-যে চিরদিন এখানে থাকবে না, সে কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে— মনে হয়, তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে

আছে তো আছেই— তার মধ্যে অন্তরের প্রকাশ আর আমরা দেখতে পাই নে। তখন যদি আমরা উৎসব করি, সে বাঁধা প্রথার উৎসব— সে একরকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে, ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি ; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না ; তখন সে যেন আমাদের কাছে একরকম ফুরিয়ে আসে। সেরকম অবস্থায় তাঁকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চলতে পারে কিন্তু উৎসব চলতে পারে না ; কারণ, উৎসব জিনিসটাই হচ্ছে নবীনতার উপলব্ধি— তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্ছে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেইখানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে 'আজ তোমার জন্মদিন'। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ, সেইরকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র, সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত— নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম, তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠত। বস্তুত, জীবন তখন আমার সামনেই— পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল, তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মতো অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকত।

পথ তখন নির্দিষ্ট হয় নি। নানা দিকে তার শাখাপ্রশাখা। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কী পাব, তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতিপরিবর্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দিষ্ট হয়, তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে

আমারও জীবনের ধারা যখন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সংকুচিত হয়ে চলতে থাকল। তখন নিজের জীবনকে বারংবার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এইজন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর-কোনো নূতন আশার সুরে বাজতে থাকল না। সেইজন্যে জন্মদিনের সংগীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল, তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর-কারও কাছে এর আর-কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে, তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম তো আমার অর্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে-যে কবেকার পুরানো কথা তার আর ঠিক নেই— মৃত্যুদিনের মূর্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে— এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার ?

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল, এবং সেই কথাটাই তোমাদের সামনে আমি বলতে ইচ্ছা করি।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে। জগতে আমরা অনেক জিনিসকে

চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই ; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ— তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক ; তারা আমাদের চারি দিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাই নি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্তেই আপনার লোককে পায়— পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না— না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে ; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মতো আপন করে পাওয়া যায়, তখনো এই সাজসজ্জা, এই গীতবাদ্য। 'তুমি আমার আপন' এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না— এতে সৌন্দর্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল 'তোমাকে আমরা পেয়েছি'— সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, 'তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।'

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করছ, তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয়, তা বলতে পারি নে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়— তেমনি মানুষকে বার বার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম— কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মতো আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর-একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে। সেইজন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে, তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাতলোক ছিল।

সেইজন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি, এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে ; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে

এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়— এখানে সে অনেকের অন্তর্বর্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্ছি কেন্দ্র, অন্য-সমস্ত তার পরিধি— মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্বর্তী ; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালোমন্দই তার ভালোমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে, তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারি নে ; মায়ের কোলেই, ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেইরকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন, তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারি নে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠি নে। তখন আমরা চলতে চাই, কারণ চারি দিকে চলার ক্ষেত্র অবাধ-বিস্তৃত— কিন্তু চলতে পারি নে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মতো চলতে গিয়ে বার বার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয় ; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে-ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে তখনো যেমন জানা যায়, সে এই চলা-ফেরা-জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না, তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্রপরিবর্তন হয়েছে, সে কথা একরকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন-কি, জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতরো বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে, তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক দুঃখস্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ এ লোকের জীবনই হচ্ছে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে ; তার অন্তরাত্মা যে ডালকে আশ্রয় করে, তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে ; যে শ্রেয়কে আশ্রয় করে সে অহংকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহংকার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় করে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি করে প্রথম অবস্থায় বিরোধ-অসামঞ্জস্যের বিষম ধন্দের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি, এখানে আমার পূর্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এইজন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু এ কথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মতো আশ্রয় করেছি মাত্র, বয়স্কের মতো একে আমি অধিকার করতে পারি নি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসংগতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি, সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ— একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি, সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ— এবং সেইজন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ, এ কথা যদি সত্য হয়, তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব ; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এইসঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যে লোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এ লোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝর্নাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদীজন্ম লাভ করে— তোমাদের ছোটো ছোটো জীবনের ধারাগুলি তেমনি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে— তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে— সেই জানার সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ— এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ, এই হচ্ছে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্তসম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোনো সংকীর্ণ ব্যবধান নেই ; এখানে তিনিই পিতা হয়ে, প্রভু হয়ে আছেন— য একঃ, যিনি এক— অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই— বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন— বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি— স দেবঃ, সেই দেবতা। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫ বৈশাখ ১৩১৭

শ্রাবণসন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর যত-কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়— এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে, তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে পেয়েছে। বার বার তাকে ধ্বনিত করে তুলছে— শিশু তার নূতনশেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেইরকম— তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে— সেও কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।— ঐরকম খুব বড়ো করেই বলতে চায়, ঐরকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়— কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়— সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে, তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ,

আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতার উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয়, তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়— সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিসগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিত্যব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর-কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক্। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি একরকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক মূর্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখো— গাছের ফুল। তাকে দেখতে যতই শৌখিন হোক, সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হোক, তাকে ফল ফলাতেই হবে নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এইজন্যেই তার রঙ, এইজন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতালাভের উপক্রম করে অমনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়; তার শৌখিনতার সময়মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহির-বাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্ করে ছুটে চলেছে— যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ত কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় 'নামঞ্জুর', তখনই বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ঐ ফুলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়, বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ্।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'তুমি ভুল বুঝছ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা; তার সঙ্গে সৌন্দর্যমাধুর্যের যে অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ, সে তোমার নিজের পাতানো।'

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, 'কিছুমাত্র ভুল বুঝি নি। ঐ ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে আঘাত করে— এক দিকে আসে বন্দীর মতো, আর-এক দিকে আসে মুক্তস্বরূপে— এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয়, এ কথা কেমন করে মানব। ঐ ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণসূত্রে ফুটে উঠেছে, এ কথাটাও সত্য

কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য— আর অন্তরের সত্য হচ্ছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'

ফুল মধুকরকে বলে, 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি'— আবার মানুষের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে কিছুমাত্র ঠকে নি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস করে তাকে ধরা দেয় তখন দেখতে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলে নি।

ফুল যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করছে তা নয়— মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজায় যে ফুলকে যথাঋতুতে যথাসময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে দূত তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল, এই আংটি দেখেই সীতা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে— তখনই তিনি বুঝলেন, রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলই বলছে, 'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।'

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা জানব কী করে।' সে বলে, 'এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা।'

তাই তো বটে। এ যে তাঁরই আংটি, মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভুলিয়ে তখনই সেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনই আমরা বুঝতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়— এর বাইরে আমার মুক্তি আছে— সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হোক-না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানাঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে— একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির— একই রূপ-রস শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের— বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি— একই সময়ে এক দিকে তার কর্ম, আর-এক দিকে তার ছুটি ; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা

করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকারসভায় আমাদের কাছে এ কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই করুণ গান জেগে উঠছে—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই-যে বিরহিণী— তুই বেঁচে আছিস কী করে! তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে!'

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরই বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি, এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেননা বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে। ঐ-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, যারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর-একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে— তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বান সংগীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না, সে-সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি বলে যায়— এবং মানুষ কবি সেইসব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে:

ভরাবাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার— তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত-শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়— এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য— যা যখনই প্রাণকে ব্যাথায় কাঁদিয়ে তুলছে, তখনই সেই বিদীর্ণ ব্যাথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না— কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া— সেইজন্যে 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে— তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে— বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে— সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।

দ্বিধা

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। এক দিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর-এক দিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারই সামঞ্জস্যসংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যত-কিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্যশিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিসের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে— ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার আর সীমা নেই; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই অথবা যেখানে তার মিলন-সাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর-একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক— এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান-পতনের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ। যে ধর্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, সেই ধর্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা— এ কথা তার বলবার জো নেই যে, 'এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চলব।' এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়— সেই দুর্গতি যে কী নিদারুণ, পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই— তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীরধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চলবে, এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসংকোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সংকোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ-আড়ালের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়— তার আহার-বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত— নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন-কি, নিজের নিত্যসহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ, মানুষ যে পশু এবং মানুষ দুইই। এক দিকে সে আপনার, আর-এক দিকে সে বিশ্বের। এক দিকে তার সুখ, আর-এক দিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে, তা হলেই বুঝতে পারি, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই-সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি— বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে, সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না— উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম নাহয়, তবে সেই-সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে-সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন-কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়— যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে— তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই— তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে— মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্ছে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ, স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাকলেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই, তখনই আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনই আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য-সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানে না বলেই তার মাকে জানে না— যখনই মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে, তখনই সে মাকে জানে।

সেইজন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে, ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলই টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই— মা মা হিংসীঃ— আমাকে আঘাত কোরো না, আমাকে আর আঘাত কোরো না। আমি এমন করে কেবলই দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচি নে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত— এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না— পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না, মানুষ পশুদের মতো অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না— বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব— হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও। এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজনসাধনের প্রার্থনা নয়— মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে, 'আমাকে পাপ হতে মুক্ত করো। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না— পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারছি নে— হে অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা, এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারছে না— তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারছি নে।'

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব— যা ভালো তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব— ভালো যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা, দুঃখের প্রার্থনা— নাড়ীছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর-কেউ করতে পারে না।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু— যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা : তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তা হলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়— আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায় ; সেখানে কোনো অহংকার টিকতেই পারে না— ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়। মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহংকারের একান্ত বিসর্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার ?—

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার ; যিনি সুখের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার ; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার, যিনি চরমমঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করছে, তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা গেছে, পিতরৌ বলতে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন— তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এইজন্যে তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো, তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সংকীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এইজন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি একমাত্র হত, নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত, তা হলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না ; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়— তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোটো হয়ে না থেকে বড়ো হয়ে ওঠবার যে দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড়ো হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে-যে সত্য হবে— তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে— এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই, আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়— যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়— যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল-যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ ; শরীরচালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখতে পাই, বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে যে, জগৎ চলবে, জীবন চলবে এবং সেইসঙ্গে আমি পদে পদে খুশি হতে থাকব। নক্ষত্রলোকের যে-সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্তী হোক-না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেইজন্য অতবড়ো অচিন্তনীয় বিরাট কাণ্ডও প্রয়োজনবিহীন গৃহসজ্জার মতো হয়ে উঠে আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুমকির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি, জগতের রাজা আমাকে খুশি করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচর-পরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন ; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুলতে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই, তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে, বলে যে, 'তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই-সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে, মুক্ত হয়ে তোমাকে থাকতে হবে, তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায়, তেমনি এই-সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে, তখনই সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনই আসক্তির পথে যাবে তখনই সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে— বস্তুকে যখনই চোখের উপরে টেনে আনবে, তখনই তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনই চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।'

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে— এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগসাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গলবোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্ছে না— এই মঙ্গলবোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্ছে : মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়াপরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে, 'আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত করো ; আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।'

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করছে : নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ— সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার— একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখতে হবে। তাই বলি : নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ— সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার— মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করছেন, পালন করছেন, তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করছেন, তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে। তখন : নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ— তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ নেই, বিরোধ নেই— তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর— তখন পিতা এবং মাতা একই— তখন একমাত্র পিতা— এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঊর্ধ্বগামী একাগ্র এই নমস্কার, অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মতো দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

১২

পূর্ণ

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন ; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'

তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত— এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে। তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে, সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে, তখন তাকে মনে মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা কলেজের ছাত্র এ কথা নিশ্চয় জানে যে, ঐ ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব যে, সেই শিশুশিক্ষা-ধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না— অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নার কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের জীবন বলে যে শিক্ষালয়টি আছে তার আশ্চর্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোটো ছেলেকেও এখানকার এম· এ· ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না ; এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারাবাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ, সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায়, তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয়, তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন তো শিশু ছিলুম, সেদিনের কথা তো ভুলি নি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা যেমন অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে অংশ অধিকার করেছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধুলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে-যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত, তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি নিজের বাল্যগণ্ডির মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়োবয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম, তবে তাকে বৃহত্তর বাল্যজীবন বলেই মনে হত— অর্থাৎ রূপকথা খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড়ো করে তোলা ছাড়া আর-কোনো বড়োকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির তাসে ক খ শেখার মতো। কয়ে কাক, খয়ে খঞ্জন, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মতো অসম্পূর্ণ শেখা আর-কিছু হতেই পারে না। অক্ষরগুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে, তখনই ক খ শেখার সার্থকতা হবে ; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে শিশুর পক্ষে আনন্দকর হয়ে উঠে— সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তার জগতের পুঁথিতে যে-সমস্ত রঙচঙ-করা কখয়ের ছবির পাতা খুলে রাখেন, তাই বার বার উলটে-পালটে তার আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না— সে ছবি দেখেই খুশি হয়ে থাকে ; মনে করে, এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তার পরে আঠারো বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম, সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে-ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম, সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্ করছে এবং ভিতর থেকে যে-একটি নহবতের আওয়াজ আসছে, তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্ছে। এতদিন ছিলুম বাইরে, কিন্তু সাহিত্যের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর-কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্যযৌবনে যখন পৌঁছনো গেল তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহির-বাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে সেখানে নয়— ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্যসাধনের জয়পতাকা হাতে অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করছে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে— সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গম শিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সুমহৎ ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী তুলে রয়েছে। এই-বা কী বিরাট ক্ষেত্র ! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু এইখানে এসেই যে সমস্ত ফুরোয়, তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায় তখন দেখি আরো আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্ধক্য সমস্তই অপূর্বভাবে সম্মিলিত। জীবন যখন ঝর্নার মতো ঝরছিল তখন সে ঝর্নারূপেই সুন্দর, যখন নদী হয়ে বেরোল তখন সে নদীরূপেই সার্থক, যখন তার সঙ্গে চার দিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব— তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে সংগত হল তখন সেই সাগরসংগমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করছি। আমি দেখছি, তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন— তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সামনেও সেই অভাবনীয়কেই দেখছি। নূতন আর কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের সীমায় এসে ঠেকেছি, এ কথা কোনোমতেই বলতে পারছি নে। আমি তো দেখছি, আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ, যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম, এখন দেখছি, তার শেষ হয় নি— তাকেই আবার আর-এক আলোকে আর-এক অর্থে আর-এক সুরে লাভ করতে হবে, মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি অথচ চলেওছি। শিশুকালের যে-পৃথিবী, যে-চন্দ্রসূর্যতারা, এখনো তাই— স্থানপরিবর্তন করতে হয় নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনোদিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয়, তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুলতে হয়। কিন্তু এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে— সেই পুঁথিকে শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা পড়ছে কাব্যের মতো এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বসতে হয় নি— কাউকে এমন কথা বলতে হয় নি যে, 'এ জগতে আমার চলবে না, আমি একে ছাড়িয়ে গেছি— আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।'

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্ছেন তিনি অনন্ত নূতন— তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন— মনে হচ্ছে না যে, কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এইজন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছি— মনে হচ্ছে, এই যথেষ্ট— মনে হচ্ছে, আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটেছে তখন সে এমনি করে ফুটছে যেন সেই চরম ; তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার কারণ হচ্ছে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধুলোবালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশুভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন, তা হলে তুচ্ছ ধুলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মতো হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন, এইজন্যে শিশুর জীবনের সেই পরিপূর্ণস্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয় ; কেউ তাকে ছোটো বলে মূঢ় বলে, অক্ষম বলে অবজ্ঞা করতে পারে না— অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত করে তুলেছেন যে, জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেইজন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবাবন্ধুর তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা করতে পারি নে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এনেছেন, তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চরমের

আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে যুবারা এই-সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে। ত্যাগের মধ্যে রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পরিপূর্ণতা, সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায় নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করেছেন, যিনি কিছুই চান না ; তিনিই বৃদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বারস্বরূপ যে-ত্যাগ, অমৃতের দ্বারস্বরূপ যে-মৃত্যু, তারই অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন, তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে 'না' হয়েই থাকতেন। কিন্তু পদে পদে তিনিই আমাদের 'হাঁ'। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য ; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য ; বার্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই বার্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এইজন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এইজন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাই নে। তিনি যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের উপর আমাদের এই-যে ভালোবাসা, এ তাঁরই উপর ভালোবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি, এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, 'হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।'— ভুলে যাই, যিনি প্রিয় করেছেন, মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে এটা অপূর্ণ ওটা অপূর্ণ, অতএব এ-সমস্তকে আমরা পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এরই মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখব। ক্ষেত্রকে বড়ো করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড়ো হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে অবস্থায় আছি, সকলের-মধ্যে যদি তাঁকে দেখবার অবকাশ না থাকত, তা হলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরই অগ্রসর হই-না, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারও তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু তিনি অনন্ত বলেই সর্বত্রই ধরা দিয়েই আছেন— এইজন্যে তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ সকল দেশে, সকল কালে। তাঁর সেই প্রকাশ যদি আমাদের মানবজীবনের মধ্যে দেখে থাকি তবে মৃত্যুর পরেও তাঁকে নূতন করে দেখতে পাব, এই আশা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবজীবনে সে সুযোগ যদি না ঘটে থাকে, অর্থাৎ যদি না জেনে থাকি যে, যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সে তাঁরই আনন্দ, তবে মৃত্যুর পরে যে আরো-কিছু বিশেষ সুযোগ আছে, এ কথা কল্পনা করবার কোনো হেতু দেখি নে।

অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই, এ কথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান ? নেতি নেতি করে জানান না, ইতি ইতি করেই জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই এ কথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি— সর্বত্রই সেই এষঃ। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ। কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন, সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনোদিন পুরাতন নন ; চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দলাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম, তা হলে অনন্তকে পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই— তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজি বইয়ে পড়েছি যে, ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে, সে একটা রূপকমাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণপালনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু এ কথা আমরা মানি নে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলি নে। আমরা বলি পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতা মাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত পিতামাতা, সেইজন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আসছে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতামাতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে আসছেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে-সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে-সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্তজীবনের প্রাকৃতিক কারণমাত্র যদি তাঁরা হতেন, তা হলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড়ো জিনিসকে অনুভব করেছে— পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে ; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা কিছু পেয়েছে যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্যগ্রহতারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করছেন, সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে : পিতা নোঽসি— তুমি আমাদের পিতা। এ কথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে এবং অনন্তকে বিশেষভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেইজন্যেই এমন দৃঢ়কণ্ঠে এতবড়ো অভিমানের সঙ্গে বলতে পেরেছে 'পিতা নোঽসি'।

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে-অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে সূর্যনক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্ছে, জীবজন্তু যেখান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চলে আজ পর্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদিপ্রস্রবণ হতেই ঐ অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে ; অনন্ত ঐখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে গেছেন, অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি 'পিতা নোঽসি'— বলেছি, 'যাকেই পিতা বলে ডাকি-না কেন, তুমিই আমাদের পিতা।

'তুমি যে আমাদেরই' অনন্তকে এমন কথা বলতে শিখলুম এইখান থেকেই। 'তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য কারবার নিয়ে তুমি আছ, সে কথা ভাবতে গেলেও ভয়ে মরি— কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই— দেখেছি তোমাকে পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে— তাই তুমি যত বড়োই হও-না কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি : তুমি আমাদের পিতা। পিতা নোঽসি। আমাদের তুমি আমাদের। আমার তুমি আমার।'

এমন করে যদি তাঁকে না পেতুম তবে তাঁকে খুঁজতে যেতুম কোন্ রাস্তায় ? সে রাস্তার অন্ত-পেতুম কবে এবং কোন্খানে ? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন। কেবল তাঁকে অনির্বচনীয় বলতুম, অগম্য অপার বলতুম।

কিন্তু সেই অনির্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার— মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য, এক মুহূর্তে এত আশ্চর্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানবজন্মের প্রথম মুহূর্তেই। মার কোলে মানুষের জন্ম, এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই ; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এতবড়ো স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে, বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার আপন হত না। মাতাই

তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে, সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপগ্রহণ করে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত, এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে— সে কে ? এমনটা পারে কে ? এ শক্তি আছে কার ? সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এইজন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তখন জানাশুনা চেনাপরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ শক্তিসামর্থ্যের আসবাব-আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন করে হিসেব করে চিনতে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে সেইজন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা-বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখলে, তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল, 'এসো, এসো।' সেই ধ্বনি মা-বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা। সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে 'পিতা নোঽসি।'

শিশু জন্মাল আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুশি, মা বাপকে নিয়ে তার খুশি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই-যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল কোথায় ? এ আনন্দ আসে কোথা থেকে ? যে-পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু একে পেয়েছে, সেই পিতামাতা একে পাবে কোথায় ? এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি ? এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্তেই যেখান থেকে এসে পৌঁছল, সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনই এতবড়ো কথা সে অতি সহজেই বলে, 'পিতা নোঽসি— তুমিই আমার পিতা, আমার মাতা।'

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমায় জানিয়েছেন, আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বলছি, আজ তাঁর মাতাকে খুব বড়ো করে দেখবার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁকে এতবড়ো করে দেখবার অবকাশ ছিল না। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে— যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য, সেইখানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে। যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়সাধন করিয়েছেন, আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি— শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে ; আমরা চোখে-দেখা কানে-শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি, সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারি নে।

আমার চোখে-দেখা কানে-শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করি নি যে, আমার দেখাশোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাঁকে চোখে দেখি নে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি নে, তখনও তাঁরই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখছি নে, তিনি তাকে দেখছেন— আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়ছে না।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখতে হবে। আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে আছেন, শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, তিনি কখনোই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে মা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি— নইলে একদিনও পেতুম না— এবং সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজও তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই, অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে, এ কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থত উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের, আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই, তারা আছে কি নেই তাতে

আমাদের কিছুই আসে যায় না— সুতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু এ মৃত্যুর অর্থ কী ভেবে দেখো। যে-মানুষকে আনন্দের মধ্যে দেখি নি, তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখি নি— আমার পক্ষে সে কেবলমাত্র চোখে-দেখা কানে-শোনার অনিত্য লোকেই এতদিন ছিল— যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখতে পেতুম, সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকে না। সেই প্রেমের মধ্যে যে মানুষকে দেখেছি, তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালোবাসি মৃত্যুতে সে যে থাকবে না, এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে ; প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে, তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে-মানুষকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি, তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখব কেমন করে!

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই ওঠে— প্রেম কি কেবল আমারই ? কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয় ? যে-শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালোবাসছি, আনন্দ পাচ্ছি, সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না ? আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে-অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য— সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই ? তাঁর সেই-অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠি নি ? যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই ?

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই তো আমাদের শ্রদ্ধার দিন— সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি ; আমরা বলি, মাকে দেখছি নে কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে, হাতে ছুঁয়ে যখন বলি 'মা আছেন', তখন সে তো শ্রদ্ধা নয়— আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেখানে যখন বলি 'মা আছেন', তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্ছি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি, তাকে কি শ্রদ্ধা করি ? গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল, তারই উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকারময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করছে, তাকেই তো যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি, 'মা তুমি আছ'— তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা যে, 'মা তুমি আছ।' তার মধ্যে আর-একটি গভীরতর শ্রদ্ধার কথা আছে ঃ পিতা নোঽসি। 'হে আমার অনন্ত পিতামাতা, তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই।

যেদিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন, সেইদিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্ছে—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুর্মান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যম্— তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য, এই শ্রদ্ধা যেদিন

পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, সেই দিনই আমরা বলতে পারি আনন্দম্— তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

১৮ ভাদ্র ১৩১৭

শেষ

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চলছে, এই লেখার অন্য-সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়িগুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে— একে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্ছে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা কোনো ভালো কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না— যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে— এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো-একটা বিশেষ উপলক্ষে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে-ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে— তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা, অন্য দিক থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এইরকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, মানুষ থামতে লজ্জা বোধ করে। সেইজন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুনতে পাই যে জিন্‌-লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো-একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে, এ কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিস বলে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে, কিন্তু আর-এক আকারে তারই সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

জীবনকে যারা এইরকম কৃপণের মতো দেখে, তারা কোথাও কোনোমতেই থামতে চায় না, তারা কেবলই বলে, 'চলো, চলো, চলো।' থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে; সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না— তা ছাড়া কত লজ্জা, কত ভাবনা, কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি দীনতা বলে মনে করে, তবে তার মতো কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনের মধ্যে রাখতে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে একে ত্যাগ করে যাব। 'এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্যন্ত টানাহেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে— তাতেই আমার সম্মান, আমার কৃতিত্ব' এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে, অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এইজন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এইজন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেননা সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি নে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র-পরিবর্তন হয়, সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে : পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন তো আলস্যের বন নয়, সে-যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শই খুব বড়ো জিনিস। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর, কিন্তু ফসল ফলে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয় তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধানখেতের সমস্ত রৌদ্রবৃষ্টির ইতিহাস নিবিড়ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে বলে কি তার কোনো অগৌরব আছে?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার খেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলছি, মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে জিনিসটা আদায় করি, তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিসটাই দাবি করি, তা হলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবি করতে পারি, সেটা করার আদর্শ নয়— সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চলছে, কেবলই ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাই নে— যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি, এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। খেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে— এইজন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে সমাজে যেরকম দাবি সেই দাবি অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবি করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর-সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ করে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র, সেখানে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বললেই হয়, সেখানে কেবলই অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে জায়গায় থামে সে জায়গায় কিছুই পায় না, কেবল লজ্জা পায়; সেখানে কাজ একটা মদের মতো, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

সামঞ্জস্য

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারি দিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারি দিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে প্রবলবেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য প্রতি মুহূর্তে প্রবলবেগে কোনো-এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই— আমরা সকালবেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে এ কথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই

যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমন ভাবে আজ ছিল, সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে ; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য তো সহজ সামঞ্জস্য নয়— এ তো মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে-সব শক্তির লীলা, তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা— কেউ-বা পিছনের দিকে টানে, কেউ-বা সামনের দিকে ঠেলে, কেউ-বা গুটিয়ে আনে, কেউ-বা ছড়িয়ে ফেলে, কেউ-বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, কেউ-বা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই-সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে— তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত ; কিন্তু এই-সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তংশিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্যসাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে— এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে, কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন ; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে : এষ সেতুর্বিধরণো লোকানামসম্ভেদায়।

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্‌গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল, তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করল। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল, তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই, কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো, সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো— সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন, তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না— বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত, তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল— কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল, সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না— কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে-হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখতে দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্লাবিত করে দিলে ; অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠল।

এখন আবার সকলে একেবারে উলটো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে-সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে, সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর-সমস্তকেই খর্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগচাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগল এবং সেইরকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাববিহ্বলতা জন্মায়, সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এইরকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীরমনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনোই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক-না কেন, তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ, যেন পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র ; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে, তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষটা যাই হোক, ভক্তির প্রবলতা দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়— কারণ, প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এইরকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি, তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, সেখানে শক্তিপুঞ্জ এক দিকে কাত হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে তো এক দিক থেকে চুরি করে অন্য দিককে স্ফীত করা। যে দিক থেকে চুরি হয় সে দিক থেকে নালিশ ওঠে ; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনোই মনুষ্যত্বলাভ করে না এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মতো ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কাকে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচারবিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল— জগদ্‌ব্যাপারের সর্বত্রই একটা জ্ঞানের ন্যায়ের নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ হতে চলল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল ; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে, এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল ; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই, দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল, তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল— কারণ, যার সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের

কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না ; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল ; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন-কি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তিসাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয় ; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, সেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে, এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কিরকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কিরকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে-ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে, তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে-লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায়, তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিস জগতে অনেক আছে— কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয়, যে সত্য চায়, সে তো ভুলতে চায় না, সে পেতে চায়। কাজেই, সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরোতেই হবে— তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে— কিন্তু উপায় নেই, তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই-যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয়, কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়, এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে— তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয়, আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই, কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন— এইজন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণবর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ এক মুহূর্ত তিনি থামতে পারেন নি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হন নি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেইজন্যেই এ দেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী।

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ কথা বুঝেছেন— ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি : রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন, তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা— মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ; সে গণ্ডির মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ কথা কাউকে বলে না যে 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই', কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়— আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না— পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক-না, এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন— আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক থেকে নয়— এইজন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি-নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনোমতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভালো করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন— জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এইজন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন— পরিমিত পদার্থের মতো করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মতো যাঁকে না-পাওয়া যায় না— যাঁকে পেতে গেলে এক দিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না, অন্য দিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না— যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন— যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন যে 'যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানি নে সেও তাঁকে জানে না'— এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন, ভগবৎপিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কিরকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল। অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ, তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে— সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্‌বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুত যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি

আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন, তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কিরকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন, সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এইরকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করে নি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশবাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হোক, নির্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়— তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম ; নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা ; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি— তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া— দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তির দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমনহৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা— অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। এ কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য-সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ করে এনেছিলুম ; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্মে যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কন্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার করে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেই দিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করি নি। দুর্বলতাবশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্বলতা এ পর্যন্ত কেবলই বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন— তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন : তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতিদুর্গের যে রুদ্ধ দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে— আপনার ধর্মকে সমাজকে, আপনার আচারব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডির মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে ; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে

পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আসতে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের সংকোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্ছে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্ছে— সেইখানেই অকৃতার্থতা বারংবার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে এবং সেইখানেই প্রবলবেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছি— এইরকম সময়েই যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে— যে বিশ্লিষ্টতা এ দেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলছে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজে কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন ; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্‌' এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না— ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্মে কি বিষয়কর্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্মানুষ্ঠানে, সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না ; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন— তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার ও সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটোবড়ো এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে নিয়মের মধ্যে বেঁধে কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসানপর্যন্ত দেখা গেছে, তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি— সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসি পর্বতে একবার গিয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম এক দিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্বত্য গৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করতেন— তেমনি আবার জ্ঞান-আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিনখানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কান্টের দর্শন ও গিবনের 'রোমের ইতিহাস' ছিল— তা ছাড়া এদেশের ও ইংলন্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা-কিছু পরিণতি ঘটছে, সমস্তই মনে মনে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসার যাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে— গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্বদা কিরকম জাগ্রত ছিল, তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক্‌ স্ট্রীটে বাস করতেন— একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্ক্‌ স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখো, আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্ছি, কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।'— আমি বেশ বুঝতে পারলুম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে

তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল— সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণচিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে, সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক। তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করছে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হোক। কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারি দিক ভরে যায়— সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে; আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনায় ও কর্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে— উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকলপ্রকার অদ্ভুত অমূলক অসংগত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছে; নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকলপ্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি— অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি— সেইজন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই— তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সংকোচমাত্র বোধ করি নে এবং আমাদের সর্বপ্রকার চিরপ্রচলিত আচারবিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য-অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নিজের অন্ধতার চারি দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্বেই দুটি-একটি করে ভক্তবিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চমস্বরে আনন্দবার্তা ঘোষণা করছে, আজ আমরা দেশের নব উদ্‌বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

সন্ধ্যা। ৭ পৌষ ১৩১৭

জাগরণ

প্রতিদিন আমাদের যে আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বল বেশ প'রে আমাদের সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন— জাগো, আজ আশ্রমবাসী সকলে জাগো।

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে বিশ্বের কত হাজাররকম আঘাতের

ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠতে থাকে, তখনই আমাদের জাগা— আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুই দিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারছে, বলছে 'জাগো'। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আসছে, বলছে 'জাগো'। যেখানে সেই বড়োর আহ্বানে আমাদের ছোটোটি তখনই সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়ছে, প্রত্যেক তারটিকেই বলছে 'জাগো।' যে তারটি জাগছে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সংগীত। যে তার শিথিল, যে তার জাগছে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সংগীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হয়।

এইরকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি! প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে? জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে, তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে— মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে? অনন্তের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানাদিকের জাগরণ— গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন— তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন— এই মনুষ্যত্বের মুক্ত দ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না, ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে-না-যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই-যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ? গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে— সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা? আমাদের চোখ-কান আমাদের হাত-পা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ করে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছে? তার পর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে— বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে— এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইখানেই তার চারি দিকে শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষের ইতিহাসে কোন্‌ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহাউদ্‌বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে; বলছে, 'ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড়ো করে জানো।' বলছে, 'নিজের কৃত্রিম আচারের, কাল্পনিক বিশ্বাসের, অন্ধ সংস্কারের তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না— উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও— আত্মানং বিদ্ধি।'

এই-যে জাগরণ, যে জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি— যে জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সংকোচ বিদীর্ণ করে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি, সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরবরাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন— আজ আমাদের উৎসব সার্থক হোক।

আমরা প্রত্যেকেই এক দিকে অত্যন্ত ছোটো আর-এক দিকে অত্যন্ত বড়ো। যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি— সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি— কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা— যে দিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সে দিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র, সে দিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে। আর যে দিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যে দিকে

সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে— আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, 'তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর-কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল 'তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে। এই বড়োর দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটোর দিকে কখনোই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহংকারের অতীত সেই আমার বড়ো আমিকে সকলের চেয়ে বড়ো-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়োদিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে এই-যে আমিত্ব বলে একটি জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই-যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্ছেন উনি। পৃথক না হলে মিলনও হয় না; তাই দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎ জুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলই পরস্পর বোঝাপড়া করছে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা; তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলছে, আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছে। এমনি করে আমি এবং আমি-না'র মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার-ভাঁটা চলেছে। এমনি করে আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে বলে আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার চিরকালের আনন্দ; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকে তার স্বার্থ, সেই দিকে তার পাপ, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকে তার ত্যাগ, সে দিকে তার পুণ্য; যে দিকে সে পৃথক সেই দিকেই তার কঠোর অহংকার, যে দিকে সে মিলিত সেই দিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির এক দিকে ভেদ এবং আর-এক দিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্বসমাধানের প্রার্থনা: অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন—

যব হম রহল রহা নহি কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ, এই আমি এক দিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্য দিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্ছে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না, একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোকলোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমাকে নইলে নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোটো হয়ে, সংসারী হয়ে, সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড়ো দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কী করে। তাই প্রতিদিনের মধ্যে মধ্যে এক-একটি বড়োদিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়োদিনগুলি হচ্ছে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড়ো দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়োদিনগুলি সূর্যকান্তমণির মতো গাঁথা হয়ে যাচ্ছে ; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়ো, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বলছিলুম, আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে ; আজ নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে-যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রোশনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজছে, কেবলই বাজছে, ভোর থেকে বাজছে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন ? কেননা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চলছে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের সেই বড়ো কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত সংকল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সংগীতটি আজ কে বাজাবেন। সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্ছে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুলছেন ; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদমিলনের ঝংকারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলই উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্ছে।

বীণার তারগুলো যখন বাজে না তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে দেয়— তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক— কেউ-বা লোহার কেউ-বা পিতলের, তবু এক— কেউ-বা সরু সুরের কেউ-বা মোটা সুরের, তবু এক— তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়— দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হোক, গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চলছে, সুর বাঁধা এগোচ্ছে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর। তখন চেষ্টার মূর্তি, কষ্টের মূর্তিটাই বার বার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে, এক-এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে।

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয়, তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই— কেবলই বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলই খেটে মরা, কেবলই ওঠা-পড়া, কেবলই অহংযন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া— কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই— কেবলই দিনযাপন মাত্র।

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে তিনি কেবলই কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই বাঁধছেন। তা তো নয়। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে ঝংকারও দিচ্ছেন। কেবলই নিয়ম ? তা তো নয়। তার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ। প্রতিদিন খেতে হচ্ছে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠছে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক

মুহূর্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মানতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। দায়ও যেমন কঠোর, খুশিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্ছে ঐ। তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে-কটি তার বাঁধা হচ্ছে, তাতে যে-কটি সুর বাজে, কেবলমাত্র সেই কটি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুলতে পারেন। পাপী হোক, মূঢ় হোক ; স্বার্থপর হোক, বিষয়ী হোক, যে হোক-না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়। তা হলেই হল ; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝন্‌ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চার দিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা-কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহংকারের সঙ্গে যার মিল নেই— যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে ; যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে ; সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতিক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে ; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই ; সেই সুরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গমপথে অনায়াসে আহ্বান করে ; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত ; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজে না তখন আমরা ধূলির ধূলি, আমরা প্রকৃতির অতিভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্যকে চন্দ্রকে পর্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড়ো বলে দেবতা বলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সংকল্প সংকীর্ণ, আমাদের আশা ছোটো, আকাঙ্ক্ষা ছোটো, বিশ্বাস ছোটো, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোটো। তখন কেবল 'খাও— পরো— সুখে থাকো— হেসে খেলে দিন কাটাও' এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনই বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে, তখনই কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়ো ; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী— তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সংগীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই। আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্তজীবনকে অনন্তজীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে ! কেবল আমার একলার বীণা নয়— লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে, কত কালে— সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখদুঃখের জন্মমৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে, বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। ধন্য আমার প্রাণ যে, সেই অনন্ত আনন্দসংগীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে ; এই আমিটুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মিড়ের পর মিড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠছে ; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর আমি ! কী মহৎ আমি ! কী সার্থক আমি !

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ

করে তুলে ধরে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সংকোচ নেই ; কোথাও সংকোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সংকোচ নেই— স্বার্থের সংকোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সংকোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সংকোচ— কিছুমাত্র না। সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্ করছে— তার উপর বিশ্বপতির আঙুল যখন যেমনি এসে পড়ছে, অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠছে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্ছে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্মরিত হয়ে উঠছে, পশুপক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিলছে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্ছে না ; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে, সকল ধর্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ সূর্যের সহস্র কিরণের মতো অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। সর্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুক্ত ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বান ধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানি নে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যতদিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানছি, ছোটো চিন্তায় ছোটো বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারি দিকে শ্রী নেই ; ততদিন তোমার জগদ্‌ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি, ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই ; ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ বলে গণ্য করি ; ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারি নে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই ; ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মতো আপনাকে কেবলই পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই ; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলি নে, ধর্ম বাঁচিয়ে চলি নে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলি নে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারি দিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না— চতুর্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না ; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি— কঠিন এবং প্রবল সংকল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারি নে, কি অব্যবস্থাকে কি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত হই নে, পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারি নে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে-মনে গৃহে-গ্রামে সমাজে-স্বদেশে সর্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে, অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারি দিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হোক— আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্‌বোধনের বিপুল বাণী উদ্‌গীত হতে থাক্, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি ; আনন্দসংগীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে ; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল— তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি ; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র ; অন্তরে আমাদের

আশার অন্ত নেই— আমরা মানব না পরাভব, আমরা জানব না অবসাদ, আমরা করব না আত্মার অবমাননা, চলব দৃঢ়পদে অসংকুচিত চিত্তে— চলব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত করে— তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারি দিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে 'এসো, এসো, এসো'— আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চিরজীবনের সিংহদ্বার— কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ— অন্তরে বাহিরে কল্যাণ— আনন্দম্‌, আনন্দম্‌, পরিপূর্ণমানন্দম্‌।

৭ পৌষ ১৩১৭

১৩

কর্মযোগ

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বলছে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে— দেখছি যা-কিছু সব নিয়মেই চলেছে, এর মধ্যে আনন্দ কোথায় ? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাসছে।

সূর্য চন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে, পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয়, যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে, ওর মধ্যেও পাগলামির কিছুই নেই— সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন-কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয় সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাই নে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে দেখে আমরা চমকে উঠি, তাকেও জোড়হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয়— একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন : ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে। তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে ; বাতাসও মুক্ত নয়। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্র সূর্য চলছে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাটাবার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে ব'লে মনেও হয় না, সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চলছে।

তবে তো দেখছি ভয়েই সমস্ত চলছে, কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন ? যেখানে কারখানাঘরে আগাগোড়া কল চলছে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু তো আজ আনন্দের সুর উঠেছে, এ কথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে তো মানুষ এমন করে ডাকে, বলে, চল্‌ ভাই, আনন্দ করবি চল্‌। এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন।

সে দেখতে পাচ্ছে, নিয়মের কঠিন দণ্ড একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখি নি ? দেখি নি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য ? দেখছি নে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা ?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরম রূপে প্রচার করছে না— একটি অনির্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারি দিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইজন্যেই যে উপনিষৎ একবার বলেছেন 'অমোঘ শাসনের ভয়ে যা-কিছু সমস্ত চলেছে' তিনিই আবার বলেছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু, যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্‌বোধন হয় নি সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখছি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায় ; কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না, সে বলে রস কিছুই নেই। সে মাথা নেড়ে বলছে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু, ঐ-যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে : রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্ছেন। জগতের নিয়ম তো তার কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্ছে না। তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। জগতে তিনি ভয়কে দেখছেন না, আনন্দকেই দেখছেন। সেইজন্যেই বলছেন : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন তিনিই বলেছেন : মহদ্‌ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। এই মহদ্‌ভয়কে, এই উদ্যত বজ্রকে যাঁরা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন, তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয়, কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন, সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজবন্ধনের মতো। তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুশি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না। কেননা, সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে— সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনই সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট শিশুর মতো কেঁদে উঠে বলে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আঘাত কোরো না। সে বলে, বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো— আমাকে আচ্ছন্ন করে, আবৃত করে বেঁধে রাখো ; কোথাও কিছু ফাঁক রেখো না, শক্ত করে ধরো ; তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি। আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা করো।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাতলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু, এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে ; তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে— মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকারগ্রহণের উপলক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার

জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেও কেবলই সে তৈরি করে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য— বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ— বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে, নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে; ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উপনিষৎ বলেছেন: কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না— জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আল্‌গা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করছে— তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ, সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর-বাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন: কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই-যে জীবনের আনন্দ, এই-যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না এ আমাদের মোহ, এ কথা বলতে পারব না যে একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্যদৃষ্টিতে দেখো। যদি তা দেখ তা হলে কর্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে। তা হলে আমরা দেখতে পাব কর্মের দুঃখকে মানুষ বহন করছে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য কর্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহু ভার লাঘব করছে। কর্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে— তার এক দিকে দায় আছে, আর-এক দিকে সুখও আছে; কর্ম এক দিকে অভাবের তাড়নায়, আর-এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এইজন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করছে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে, নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে মারছে। কিন্তু, আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠল না। পশুপক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চুপ করে থাকতে পারলে না; কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। মানুষের মতো কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে। এখানে কত কাল থেকে সে কত ভাঙছে গড়ছে, কত নিয়ম বাঁধছে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্ছে, কত পাথর কাটছে কত পাথর গাঁথছে, কত ভাবছে কত খুঁজছে কত কাঁদছে। এ ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড়ো বড়ো লড়াই লড়া হয়ে গেছে। এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে। এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়। এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায় নি, নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে।

এইখানেই মানুষ সেই মহৎ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারি দিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়ো— এইজন্যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনো সে যা হয়ে ওঠে নি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বার বার দুঃখ পেতে হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই কথা মনে রেখে, মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে নি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে। অনেক সময় এত দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে যে কর্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, কর্মের-স্রোতে-বাহিত আবর্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক-একটা কেন্দ্রের চার দিকে ভয়ংকর আবর্ত রচনা করছে— স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত। কিন্তু, তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই ; সংকীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে। কারণ, চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম করতে হবে, কর্ম করে বেঁচে থাকতে হবে, এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই, তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য— অন্তর এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয়, তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখো-না কেন, শরীরকে তো নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয় ; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই ; তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না— তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্তচলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানা প্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্বদাই তার চাই— কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে, দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ভাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচি নে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যে দিকে ত্যাগ করব সেই দিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন। তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব, বাইরের কর্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব— কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব, বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না— কিংবা একেবারে এর উলটো কথাটাই বলি, এবং এই ব'লে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল এক দিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তা হলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখছি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রেই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভালো ক'রে বিশ্বাসই করে না। এত দূর পর্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে, তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে— জগতে ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি, আর-এক দিকে সমাপ্তি ; এক দিকে পরিণতি, আর-এক দিকে পরিপূর্ণতা ; এক

দিকে ভাব, আর-এক দিকে প্রকাশ— দুই একসঙ্গে গান এবং গান-গাওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না ক'রে বলা যে 'গান কোনো জায়গাতেই নেই— কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে'। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখছি, কোনো সময়েই তো সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখছি নে— কিন্তু, তাই বলে কি এটা জানি নে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র ক'রে-যাওয়া চলে-যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ। জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না। সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উলটো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে, আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব, তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না, এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনো প্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না; স্থাণু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়; আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কত দূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি নি। আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর-বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্মকর্ম ইতিহাস-পুরাণ সমাজ-সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর-কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁতভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখি নে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর-বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের এক দিকে নিয়ম, এক দিকে আনন্দ। তার এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে: ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি। আর-এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। এক দিকে বন্ধনকে না মানলে অন্য দিকে মুক্তিকে পাবার জো নেই। ব্রহ্ম এক দিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ; আর-এক দিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনই মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতরো? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়, তখন সেই তারে গান বাজে এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। এক দিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্য দিকে সে সংগীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয় নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু, তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না। সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে পারলেই সে বদ্ধ থেকেও এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু, তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে, ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তালাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বলছিলুম কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্ছে : যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যে যে কর্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে। অর্থাৎ, সমস্ত কর্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে। অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। তখন কী আনন্দ যখন সকল কর্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে, কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে— সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ— তখন সংসারই তো আনন্দনিকেতন।

কর্মের মধ্যে মানুষের এই-যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই-যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে একে কে অবজ্ঞা করতে চায়! সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানবমাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো-একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনই শুনতে কি পাচ্ছ না ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে, বন-জঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মতো তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করছে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করছে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেলছে। তার চারি দিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তার কেউ সারথি নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে না? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথির যথার্থ মিলন ঘটছে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্যোগও সেই সারথির অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারছে না, মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না; আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথির— চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নামবার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথির। ওরে, কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়! তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চলতে চায় না! কে বলতে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব। কে বলতে চায় এই-সমস্তই মিথ্যা— এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তর-বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। যে লোক এ-সমস্তকেই মিথ্যা বলে কত বড়ো মিথ্যা তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড়ো বৃহৎ সংসারকে এত বড়ো ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়— ভীরু যে, পালাতে যে চায়, সে কোথাও তাঁকে পায় না। সাহস করে বলতে হবে এই-যে তাঁকে পাচ্ছি এই-যে এখনই, এই-যে এখানেই। বার বার বলতে হবে আমার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্ছি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্ছি। কর্মের মধ্যে আমার যা-কিছু বাধা, যা-কিছু বেসুর, যা-কিছু জড়তা, যা-কিছু অব্যবস্থা, সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসংকোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করছেন।

উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেছেন? আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্

এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই, এ কখনো হতেই পারে না— সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়— সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কী করে ? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এইজন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে— তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পরহিতসাধন, সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাঁকে কর্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম-আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন ; তিনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'। তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন তো তিনি নিজেই, তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করছেন। কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন— নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কী করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলই উৎসর্গ করছে, সেই তো তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ঐখানে, ঐখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলই দান করতে হবে। বেদে তাঁকে 'আত্মদা বলদা' বলেছে, তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্ছেন যাতে করে আমরাও তাঁর মতো আপনাকে দিতে পারি। সেইজন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন ঋষি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছেন : স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ-সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চলবে না যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন ; আমাদের শুভবুদ্ধি দিন, তা হলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব, তা হলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভবুদ্ধি হচ্ছে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের স্বার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভবুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম, নিয়মবদ্ধ কর্ম, কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম নয়— আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম, কিন্তু অভাবতাড়িতের কর্ম নয়— তখন আমাদের কর্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখছি 'বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ', বিশ্বের সমস্ত কর্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্ছে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্ছে, তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি— তাই আমার সকল কর্মই শান্তিময়, কল্যাণময়, আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমা শক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে ; আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়, আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেননা হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাই নে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়— আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাই নে। কর্মের মধ্যে দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিই নে ব'লে, দান করি নে ব'লে কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মতো তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মতো তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মতো তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার

সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-পূরণ, সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালোবাসতে পারি এমন বীর্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই ব'লে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মতো একে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব, এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্নসূর্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করছে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্তগাড়িকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করছে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলই কর্মের রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করছে সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলই অভিশাপ দিচ্ছে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্মে মানুষের অনাস্থা, সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ। সেইখানেই যত সংকোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্মন্, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ, বিশ্বসংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখতাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমা সৃষ্টি চলছে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ। সেইসঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবল বেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মতো ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক— নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্মরধ্বনিকে বহন করে, আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক— আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক। দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহু তুলে আপনাকে একবার দিগ্‌বিদিকে ঘোষণা করুক। মোহের আবরণকে উদ্‌ঘাটন করো, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও— এখনই এই মুহূর্তে অনন্ত দেশে কালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই; তার পরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করছে— যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মতো সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ফাল্গুন ১৩১৭

আত্মবোধ

কয়েকদিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী আমাকে বলতে পার?' একজন বললে, 'বলা বড়ো কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর-একজন বললে, 'বলা যায় বৈকি— কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন।' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ। কেউ কি আসছে।' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলে নি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে, আর যাবে কোথায়। আমরা প্রসন্নমনে হাসতে পারি— পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করছি সবাই কেবল নিজের উদর-পূরণের অন্ন খুঁজছে, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারি দিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে? না, তা নয়। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্নের জন্যে, বস্ত্রের জন্যে, নিজের ছোটো বড়ো কত শত দৈনিক আবশ্যকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে— কিন্তু, কেবল তার সেই আহ্নিক গতিতে নিজেকে প্রদক্ষিণ করা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে জেনে এবং না জেনে একটি প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর-একটি কেন্দ্রের চার দিকে যাত্রা করে চলেছে— যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে জ্যোতির্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সে আলোক পাচ্ছে, প্রাণ পাচ্ছে, যার সঙ্গে একটি অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তার চিরদিনের মহাযোগ রয়েছে।

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন। এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে; আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকেই বিশুদ্ধ ক'রে, প্রবল ক'রে, পরিপূর্ণ ক'রে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করছে। শিশুকাল থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করছে, এক-একটি বড়ো বড়ো লক্ষ্যের চার দিকে সে আপনার ছোটো ছোটো সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করছে, এমন-সকল আচার-অনুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করছে যাতে তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে তার সমাপ্তি নেই, সমাজব্যবহারের মধ্যেও তার অবসান নেই। সে এমন একটি বৃহৎ আপনাকে চাচ্ছে যে-আপনি তার বর্তমানকে, তার চার দিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেকদূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই আপনির খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্ত হাস্যে বলছে, সবাইকেই আসতে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেননা, এ তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়; সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক। কলরবের তো অন্ত নেই— কত কল-কারখানা, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করছে; কিন্তু মানুষের ভিতর থেকে সেই সত্যের ডাককে কিছুতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। মানুষের সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত অর্জন-বর্জনের মাঝখানে সে রয়েছে। কত ভাষায় সে কথা কইছে, কত কালে কত দেশে কত রূপে কত ভাবে সমস্ত আশুপ্রয়োজনের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করছে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করছে, কত বিকৃতি তাকে আক্রমণ করছে, কিন্তু সে বেঁচেই আছে। সে কেবলই বলছে, তোমার আপনিকে পাও: আত্মানং বিদ্ধি।

এই আপনিকে মানুষ সহজে আপন করে তুলতে পারছে না, সেইজন্যে মানুষ সূত্রচ্ছিন্ন মালার মতো কেবলই খসে যাচ্ছে, ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু, যে বিশ্বজগতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করছে সেই জগৎ তো মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়ছে না, ছড়িয়ে পড়ছে না।

অথচ এই জগৎটি তো সহজ জিনিস নয়। এর মধ্যে যে-সকল বিরাট শক্তি কাজ করছে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্য একটা টেবিলের উপর দু-চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখতে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কী অদ্ভুত এবং কী প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত এমন কত শত বাষ্পপদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কী কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্ছে তা আমরা কল্পনা করতেও পারি নে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ। আকর্ষণের উলটো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগের উলটো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই-সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই-যে জগৎ এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে চোখ মেলেছি, এখানকার বাতাসে অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্ছি, এর জলে স্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করছি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কী কাজ চলছে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানছি— দেহটাকে হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়াতাড়া ব্যাপার বলে জানছি নে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ংকর হোক-না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে অথচ জগৎটা আসলে যে কী তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই— সেই-সকল ক্ষুদ্রতম মূল-বস্তুর যোগবিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই মূল-বস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক-এক পা এগোচ্ছে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা এক দিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর-এক দিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্ছে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জানতে হচ্ছে না ; আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তিবিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়— জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী, সে আমার চোখের জিনিস, স্পর্শের জিনিস ; সে আমার স্নানের জিনিস, পানের জিনিস ; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই। স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কী তা আমরা ধারণা করতে পারি নে, কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে যে দুর্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্তমনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মতো ব্যবহার করছে, কোথাও কিছু বাধছে না।

জড়জগতে যেমন মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কী তা কেমন করে বলব। পর্দার উপর পর্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব। সেই প্রাণ এক দিকে যত বড়ো প্রকাণ্ড রহস্যই হোক-না কেন, আর-এক দিকে তাকে আমরা কী সহজেই বহন করছি— সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্তে অগণ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন শাখাপ্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জনতাকে সজন করে তুলছে— এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্যালোকে উঠছে এবং সূর্যালোক থেকে অন্ধকারে নেবে পড়ছে। এ কী তেজ, কী বেগ, কী নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে ! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই ; আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জিত উন্মথিত হয়ে উঠছে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে একসঙ্গে আমরা

দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু, এখানেই সে আছে, এখনই সে আছে, আমার হয়ে আছে। তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে সে আছে। সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট মানবপ্রাণ— তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, নিশ্বাসপ্রশ্বাস, শীতগ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করছে। এই অনির্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে আপন হয়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

তাই বলছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্বচনীয় ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে ; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালোবাসছি, তাদের কোনোমতেই ছাড়তে চাই নে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে তো এইরকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে সমগ্র ক'রে আপন ক'রে লাভ করছে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কী কঠিন হয়েছে!

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না, চারি দিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু, আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার ; তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না-পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাই নি, ওটা পাই নি ; ততক্ষণ যা-কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেননা, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিসকেই পাই নে ; এমন কোনো আধার থাকে না যার মধ্যে কোনো-কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি সবই মায়া— সবই ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আত্মাকে যখনই পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিত করে ধরতে পারি, তখনই সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারি দিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাই নি তখন যা-কিছু অসত্য ছিল আপনাকে পাবামাত্রই সেই-সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মতো ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না, কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে। এইজন্যে যে লোক আত্মাকে পেয়েছে জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্যরূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ তার কাছে জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এইজন্য তার কাছে কোনো সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায় নি, প্রাণ পায় নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না— তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনই জগতের গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মানিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারি দিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাই নে, কিছুই দিই নে ; যখনই সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই

একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে, সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে— অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠবে।

এইজন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মতো সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে ব'লেই নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে ; বেদনার পীড়ায় সেইগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে ; নিজের ভিতরকার এই-সমস্ত বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়— কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তার এই-সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দপরিণাম আছে, এটা সে সহজে দেখতে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি যাতে আমার সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জানছি চার দিক থেকে তার বাধা পাচ্ছি। আমার শরীর যা দাবি করে আমার মনের দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে, আমার বর্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই-সমস্ত দুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে। অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করছে। যাতে তার এই-সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে, সহজ করে দেবে, তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষ্যকে কেবলই স্থির রাখবার চেষ্টা করছে। মানুষ আপনার অন্তর-বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করছে। সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্রনীতি। সেই চেষ্টাই তার ধর্মকর্ম পূজা-অর্চনা। সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্ছে। সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্ছে খানিকটা নিষ্ফল হচ্ছে, বার বার ভাঙছে বার বার গড়ছে— কিন্তু বারংবার এই-সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখছে এবং সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করছে।

তাই বলছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা-কিছু করছে— কখনো বা ভুল করে কখনো বা ভুল ভেঙে— সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক-না সত্য করে চাচ্ছে এই আপনাকে, জেনে চাচ্ছে, না জেনে চাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্ছে। সে এক রকম করে বুঝতে পারছে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসংগীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা— সেই সংগীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধছে, সুরের যতই স্খলন হোক তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলই বলছে : তমেবৈকং জানথ আত্মানম্। সেই এককে জানো, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। ইহাই অমৃতের সেতু।

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, যখন তার প্রবৃত্তি শান্ত হয়, সংযত হয়, তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজছে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে— কেননা, নানা বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু, যেটি হচ্ছে মানুষের এক, মানুষের আপনি, সে স্বভাবতই একটি অসীম একককে, একটি অসীম আপনিকে খুঁজছে— আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষৎ বলেন—

'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি' যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করেছেন, 'তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ' তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, 'তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্', তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর-কারও না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্ছে 'দিবীব চক্ষুরাততং'। চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখতে পায় এ সেইরকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্ছে সে কোনো জিনিসকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো করে দেখে না, সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। সেইরকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম-আপনি। সেই পরম-আপনিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না, ঠিক উলটো— জ্ঞান সহজেই তফাত করে জানে, আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।

উপনিষৎ বলছেন— 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা', এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করছেন, কিন্তু তিনিই 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', মহান্-আপন-রূপে পরম-এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক৯প্তো য এতৎ'— সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান, যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তাঁরাই অমৃত হন।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে— মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্ত কালেও আমরা এককে পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর কিছুতে পাবার জো নেই—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর-কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্ছে প্রকাশ— এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়, আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না— যা-কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে— দরজা খুলে দিতে হবে, তা হলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

সেইজন্যেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা : আবিরাবীর্ম এধি। হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ— যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনো তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছেন না ; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে ; এখনো তার মধ্যে বাধা-বিরোধের সীমা নেই ; এখনো সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছে না ; এখনো তার এক ভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্ছে না, এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না ; ভয় দুঃখ শোক অবসান অকৃতার্থতা এসে পড়ছে— যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা, যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করছে— আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠছে না। এইজন্যেই মানুষের

প্রার্থনা : রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা করো। যেখানে সেই আবিঃর আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই ; যে দেশে সেই আবিঃর আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে ; যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধনধান্য থাকলেও শ্রী নেই ; যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্তিহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এইজন্যে যে-কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক-না কেন, তার আসল প্রার্থনাটি হচ্ছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক। এইজন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো কান্না পাপের কান্না। সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম-একের সুরে মেলাতে পারছে না, সেই অমিলের বেসুর সেই পাপ তাকে আঘাত করছে। মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করছে, তখন সে নিজেকে সেই পরম-একের শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্ছে না ; তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলছে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না। বিশ্বানি দেব সবিতর্‌দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও— তা হলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে. আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়। তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের। কিন্তু, যে জাতি যেরকম পরিণতিই পাক-না কেন, সকলেই কোনো-না-কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে চাচ্ছে। এমন একটি বড়ো যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্ছে, যা তার কেনা-বেচার সামগ্রী, তা নিয়ে তো তাকে থাকতেই হয়। সেইসঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখাশোনা খাওয়াপরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে। তাকেই আপনার সমস্ত সুখদুঃখের চেয়ে বড়ো বলে স্বীকার করছে। কেননা, মানুষ জানছে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই ; তার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা আরাম-বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বলছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারছে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাঁর প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করতে হবে ; তাকে যুক্ত করতে হবে। সেই দিকে চেয়েই মানুষ এক দিকে আপনার দীনতা আর-এক দিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং সেই দিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায় ; ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায় ; তার পরম-আপনকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার-বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি। এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন। এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্বাঙ্গীণ রূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন, সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলই বিশুদ্ধ করে তুলছেন— সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্ছেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্বতে জ্যোতিষ্কলোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে, অসীমকে দেখি ; কিন্তু সেখানে আমরা

অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাই নে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্ছে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখতে পাই ; কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখতে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখব ? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখতে পাব ? অগ্নি জল বায়ু সূর্য তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক এই প্রকাশকে সে তো দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায়, কিন্তু শক্তিকে দেখানোর মধ্যে একটা বন্ধন একটা পরাভব আছে। তারা নিয়মকে রেখামাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না। তারা যা তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেননা তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতরো জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন— এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণ স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন ; সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেননা, সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন। সেইখানেই সকলের চেয়ে বড়ো প্রকাশ— ইচ্ছার প্রকাশ, প্রেমের প্রকাশ, সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও পারি, না মানতেও পারি ; সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব— সেই একটি মস্ত অপেক্ষা একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেননা, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপ মলিনতার অবকাশ ঘটেছে ; কেননা, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে, আমরা সংশয় পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন তবে এমনটি ঘটতে পারত না ; বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন, সে জায়গা তিনি মানুষকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয় ; কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন, এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন, অথচ নেই। এইজন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করছি, আঘাত পাচ্ছি, ধূলায় আমাদের সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠছে, সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায় এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারি গান : মাঝি, তোর বইঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না ! তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

এত বাধা বিরোধ, এত অসত্য, এত জড়তা, এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয় ; কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পারে না। জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুলছে ; এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্ছে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়— যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায়, তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সংকোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ, তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে। এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয় ; এখানে জোর খাটে না। রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এইজন্যে ভক্ত যে দিন আপনার অহংকারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছা করে আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, সেই দিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন। সেইজন্যেই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়ছে— এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন, সেইজন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্ছে। বলছে : আবিরাবীর্ম এধি।

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজকাল অন্য দেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্ছে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখলুম। তিনি ভগবানকে ডেকে বলছেন—

Thou hast need of thy meanest creature ;
thou hast need of what once was thine :
The thirst that consumes my spirit
is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বলছেন : তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে ; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও ; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করছে সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি, তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি— তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
বহ প্রভু অসীম ভাষায়,
তাই, দীননাথ, আমি ক্ষুধিত্ আমি তৃষিত্
তাই তো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা তাই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো উষার আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার তো আর কোনোই কাজ নেই, সে তো কেবলই হৃদয়ের প্রতি হৃদয়মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরামদাসের ভাষায় বলছে : তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির ! তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে, কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে ; সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এসো, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এসো, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক।— এই একটি বিরহবেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেইজন্যেই আমার মধ্যেও আছে।

I have come from thee, why I know not ;
but thou art, O God ! what thou art ;
And the round of eternal being is the pulse
of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি কেন যে তা জানি নে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ ; এই-যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগ-যুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা, এই হচ্ছে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই-যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুলছে, কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বলছেন, এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব ; এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার। তাই কবি বলছেন : আমি যে দুঃখ পাচ্ছি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না প্রভু !—

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কী স্বামী !
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
করো নিশিদিন।
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব !
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ,
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ তো আমি চাই নে— যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো। আমি যে তোমার পত্নী ; আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব। সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেইজন্যেই, আমি বলছি নে আমাকে সুখ দাও, আমি বলছি : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও।—

আমি তোমার ধর্মপত্নী,
ভোগের দাসী নহি।
আমার কাছে লাজ কী স্বামী,
নিষ্কপটে কহি—
আমায়, প্রভু, দেখাইয়ো না
সুখের প্রলোভন।
তোমার সাথে দুঃখ বহি
সেই তো পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি—
তাই তো ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে
দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি,
তাই তো তোমার ঘরে
হে ভিখারি, সব দারিদ্র্য
আমার সেবা করে।
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই
পাই না সুখের দান—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী
এই তো আমার মান।

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না। তখন সে বলে : যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায় তখন আর আরামকে চাইলে চলবে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না। তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

তখন কর্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই। তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কী দেখি ? দেখি, সে তর্কবিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকাভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়, সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়— সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না, সেও তেমনি। ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখতে পাই নে। তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে, মহৎ হয়ে, শক্তিশালী হয়ে মেলে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম মেলে। বাহির মেলে, অন্তর মেলে। কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে। কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে। কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে। সমস্তই আনন্দে মিলে যায়, রাগিণীতে মিলে ওঠে। তখন জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ বিপদ্‌সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে, নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্বচনীয় রূপ হচ্ছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুই'ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই'ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই'ই সার্থক ; এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মতো, মধুর সুরে বাজতে থাকে। এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার, বীরত্বও তেমনি সুকঠিন। এই প্রেম দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে এবং পরকে, জীবনসমুদ্রের এ পারকে এবং ও পারকে প্রবল মাধুর্যে এক করে দিয়ে, দিগ্‌দিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাহত করে দিয়ে, উষার মতো উদিত হয়। অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে। তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ সেই প্রভেদ কেবলই অমৃতে ভরে ভরে উঠতে থাকে, সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপড়ি একটির পর একটি করে বিকশিত করতে থাকে। তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে। তখন হে রুদ্র, হে চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, তোমার এ কী মূর্তি ! এ কী দক্ষিণং মুখম্ ! তখন তুমি নিত্য পরিত্রাণ করছ, সসীমতার নিত্য দুঃখ হতে নিত্য বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাণ করে চলেছ— এই গূঢ় কথা আর গোপন থাকে না। তখন ভক্তের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানবলোকে তোমার সিংহদ্বার খুলে যায়। ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ ; যারা মূঢ় তারাও বাধা পায় না, যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়। লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রবিধি টল্‌মল্ করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের নিষ্ঠুর পাষাণপ্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্ছে যে 'আমি তোমার'। এই কথা বলে সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চলছে। মানুষ তার চেয়ে ঢের বড়ো কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে বলতে চায় 'তুমি আমার'। কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান। তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক। আমার ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেব, আমার আনন্দে আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব— এইজন্যেই আমার এত দুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন। এ দুঃখ তোমার জগতে আর-কারও নেই। নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর-কেউ বলছে না 'আবিরাবীর্ম এধি'। তোমার বিচ্ছেদবেদনা বহন করে জগতে আর-কেউ এমন করে কাঁদছে না যে 'মা মা হিংসীঃ'। তোমার পশুপক্ষীরা বলছে : আমার ক্ষুধা দূর করো, আমার শীত দূর করো, আমার তাপ দূর করো। আমরাই বলছি : বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো। কেন বলছি। নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়, সে দুঃখ অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এইজন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক, যাই করুক, তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে : আবিরাবীর্ম এধি। এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়। আরাম-ঐশ্বর্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুলতে পারে না। দুঃখযন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুলতে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও,

আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখদুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও। সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধ বিরাজমান যে পরম-এক তুমি, সেই মহা-এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও। সেই এক তুমি 'পিতা নোহসি'— আমার পিতা। সেই এক তুমি 'পিতা নো বোধি'— আমার বোধের মধ্যে আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রভু হও, আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও। এই প্রার্থনা জানাবার যে গৌরব মানুষ আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে বহন করেছে, এই প্রার্থনা সফল করবার যে গৌরব আপন ভক্তপরম্পরার মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে, মানুষের সেই শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, এই লোকালয়ের প্রান্তে, অদ্যকার পৃথিবীর নানা জন্মমৃত্যু হাসিকান্না কাজকর্ম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটিতে। মানুষের সেই গৌরবের আনন্দধ্বনিকে আলোকে সংগীতে পুষ্পমালায় স্তবগানে উদ্‌ঘোষিত করবার এই উৎসব। বিশ্বের মধ্যে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্— এই কথা জানতে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি। তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়। আনন্দের দ্বারা, শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেইরকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা! হে উৎসবের অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে সফল করো; এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক। প্রতিদিন আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জেনে যে দুঃখ পেয়েছি সেই বোধ হতে, সেই দুঃখ হতে, এখনই আমাদের পরিত্রাণ করো। সমস্ত লোভ-ক্ষোভের ঊর্ধ্বে ভূমার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করে বিশ্বমানবের বিরাট সাধনমন্দিরে আজ এখনই তোমাকে নত হয়ে নমস্কার করি। নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কার সত্য হোক, নমস্কার সত্য হোক।

সন্ধ্যা। ১১ মাঘ ১৩১৭

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

একটি গান যখনই ধরা যায় তখনই তার রূপ প্রকাশ হয় না; তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কী এবং তার অন্তরাটা কোন্ দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা সমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে-সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই-যে আঘাত দেবার কাজ এ একটা সমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে; হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও সত্যমিথ্যার ভিতর দিয়ে ঘুরে নানা শাখা-প্রশাখার পথ খুঁজতে খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে সত্যের মূর্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না; কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে, হিন্দু সমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।

এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর তো অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে পারে না; তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চলতেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে, কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বলছিলুম, ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা সম্ম এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু, এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে ? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে। কিংবা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবে না।

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই খনন-করা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি। কিন্তু, যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝর্নাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিস ; তার উপরে আমারই সীলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সংকীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে— তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এই দুই রকম দুই অধ্যায় আছে। যতদিন বাধা দূর করবার পালা ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব ; ততদিন আমাদের কাজ চারি দিক থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন-কি, চারি দিকের বিরুদ্ধ ; ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছনো যায়, যেখানে বিশ্বের মর্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিস সকলেরই জিনিস ; সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে, আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে, নিজেকে তারই অনুবর্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষ্যপরিবর্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে— পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্তক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি ?

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে, সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সংকটের সময় অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয় নি।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্তন-সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্ছি এবং সামাজিক কর্তব্যসাধন করে উপকার পাচ্ছি, এইটুকুমাত্র স্বীকার করেই থামতে পারি নে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড়ো করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয়সাধনের বর্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বারংবার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু, চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্যসাধনাকেই ব্রহ্মসাধনাকেই নূতন করে উন্মুক্ত

করে দিয়েছে। তা যদি না করত, তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নয়। এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল, তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাই নে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু, সেই মুসলমানঅভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক রবিদাস কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করছেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কিরকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমানধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়; দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে না শত্রুর আঘাত হবে? প্রথম যেদিন সে শৃঙ্খলধ্বনি করে এসেছিল সেদিন তো মনে করেছিলুম সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল ভারতবর্ষের সত্যসম্বল নেই, অতএব এইবার তাকে তার জীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি।

কিন্তু, তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহু দিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধনভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে— ভয় নেই, কোনো অভাব নেই— এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব পশ্চিম এক পঙ্‌ক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার উদ্‌ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মর্চে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাক্কা দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মতো বোধ হয়েছিল।

কিন্তু, বিরোধ নয়। বর্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনো এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার সকল জটিলতার যথার্থ সমাধান করে দেবে— এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠছে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কী বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়; এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে; আমাদের চৈতন্য সেখানে পরমচৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করছে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই-যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়— সর্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকে ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা, জীবনের এমন পরিপূর্ণতা জগদ্‌বাসের এমন সার্থকতা আর কী হতে পারে!

কালের বহুতর আবর্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনিস তো একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা, এইব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মনুষ্যত্বের কোনো একটা চরম তাৎপর্য থাকে না, সে একটা পুনঃপুনঃ আবর্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মতো প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ পুনর্বার তাকে বৃহত্তর করে পূর্ণতর করে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল; সেইটিকে শোধন করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার তার কাছে থেকে দূরে না গেলে তাকে বিশুদ্ধ ক'রে সত্য ক'রে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন। আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক ও বিষয়ের দিক, সমান ওজন রেখে চলতে পারে নি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম; তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্যাপ্ত করে তুলতে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিস জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে টিকতে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজতে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্বি ও শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে, কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি হৃদয়বৃত্তিও কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না— আপনাকে পোষণ করবার জন্যে, রক্ষা করবার জন্যে, আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু, ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উলটো দিকে চলছিল। সে বিষয়রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলছিল— তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্য-রাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায় নি বটে, তবু তার সর্বব্যাপী একটি

বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা। কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা— এইসমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্যবসিত য়ুরোপ তা দেখে নি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতিদূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচারবিচার বাহ্য-অনুষ্ঠান এবং ভক্তিরসমাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনকে পুঁথির অন্ধকার-সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল: এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়। বলে উঠল এ খৃস্টানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছবিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায়, তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন-কি, সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু, সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে— আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবী-জোড়া, এবং সেই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু, তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি'। তার মন্ত্র ছিল 'জোর যার মুলুক তার'। সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু, এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে। এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে। কেউ বা বলে স্বাজাত্য, কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু, কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না। প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে। কিন্তু, এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না। প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দেও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোল এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই— শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী

সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয় নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে, আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি— কিন্তু, তাই ব'লে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি। যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্কতুষারস্রুত এই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্ত্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী। ১২ মাঘ ১৩১৭

বৈশাখ ১৩১৮

১৪

সুন্দর

পশ্চিম আকাশের 'পরে তখনো সূর্যাস্তের ধূসর আভা ছিল ; আমাদের আশ্রমে শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুলছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্তমান মুহূর্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল ; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল, যেদিন প্রত্যহ সূর্যের উদয় এ দেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখির কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুলত, এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেনুগুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আনত, ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্যাবর্তের দিগন্তপ্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্যপিতামহেরা তাকে একদিনও একবেলাও উপেক্ষা করেন নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায় দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, কেবল ভোগীর মতো নয়, ভাবুকের মতো নয়। সৌন্দর্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন ; সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে মনকে স্থির শান্ত করে উষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল, নদীসংগমে সমুদ্রতীরে পর্বতশিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানেই তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি ; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো-একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি, এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোটো না ক'রে, ভক্তিবৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জানতে পারি। অর্থাৎ, কেবলই তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ করে আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল, সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয় ; আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডির মধ্যে সৌন্দর্যকে অত্যন্ত শৌখিন-রকম করে দেখতে চাই। তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি ; সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই ; এইজন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোটো করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে-সমস্ত বিরোধ ও বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়োর মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখতে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু, মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠি নে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে তার সমস্ত ছোটোকে আমরা বড়ো করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয় ; কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এইজন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই নে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখছি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনই অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইছে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তা হলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্ছিত হয়ে যেতুম। টুকরো টুকরো করে যদি দেখ তা হলে এর মধ্যে কত ঘাতসংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে। এই-যে আমাদের চোখের সামনেই ঐ গাছটি এই তারাখচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে যদি আংশিকভাবে দেখতে যাই তা হলে দেখতে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি, কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে। আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই ; কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা-কিছু তুচ্ছ— যা-কিছু ব্যর্থ— যা-কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য যে কাটা-ছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডি-কাটা জিনিস নয়, বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, এত বড়ো বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করছে। সেই-যে শক্তিকে দেখতে পাই সে অতি ভীষণ। সে কাটছে ভাঙছে টানছে জুড়ছে ; সে তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্যনিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে ; তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে ক্রন্দসী রোদন করে উঠছে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ংকর তারই অখণ্ড সত্যরূপ কী পরমশান্তিময় সুন্দর। সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য থাকত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলই বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্য থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলছে। সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ংকর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে, সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য। জগতে এই মুহূর্তেই যেমন আকাশ-জোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘর ধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে ; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। তাঁর ভয়ংকর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলছে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্ছে, এখনই এ আমরা কত সহজে, কী

অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছি— আমাদের মনে ভয় নেই, ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানবসংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করছে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ংকর ঘাতসংঘাত সর্বদাই বড়ো করে প্রত্যক্ষ করছি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য হানাহানি-কাটাকাটির মন্থন কেবলই চারি দিকে চলছে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাকত তা হলে সমস্ত শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তন-হীন কদর্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চলছে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ততেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্যবেগে উদ্গাত হয়ে উঠছে ; তারই ভয়ংকর পেষণ-ঘর্ষণে রাজ্যসাম্রাজ্য শিল্পসাহিত্য ধর্মকর্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠছে। এই সংসারের মাঝখানে আছেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ; কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহাসৌন্দর্যকেই দেখেন। তাঁরা অমৃতকেই দেখেন। য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অনেকে এমনভাবে বলেন, যেন প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ ; যেন যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি ; প্রকৃতির মধ্যে উপরে ওঠবার কোনো বেগ নেই ; সেইজন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু, আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি ; সে তো জড়যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো তার পথের কোনো-একটা জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌঁচেছে, এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড় কত প্লাবন কত ভূমিকম্প কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘনমেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল, আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভালো করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ কত অদ্ভুত পাখি কত আশ্চর্য জন্তু কোন্ নেপথ্যগৃহ থেকে এই সৃষ্টিরঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায় নি। থেমে যদি যেত তা হলে এখনই যা-কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদিঅন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে ব'লেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন ক'রে ক'রেই এগোতে হচ্ছে, কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। এইজন্যেই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু, সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোটো ছোটো সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলই ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ, দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়। এইজন্যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অবিরত অতিভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্ছি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা— এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সব সময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারি নে তার কারণ পূর্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে ; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই-সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখছি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখছি নে ; সেইজন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্ছেন না, সেইজন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও ? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ঐ দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে ; তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা। কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ। কত দুঃখের দারুণ দাহে ঐ সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে। সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা। সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর। শুধু তাই নয় ; তাঁর চারি দিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ— পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেইরকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব ; ভীষণকে সুন্দর বলে জানব ; মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয়-অপ্রিয় সুখদুঃখ সম্পদ্‌বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড করে এক করে সুন্দর করে দেখব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দলীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব। নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারি দিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে— তখন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভবুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে। সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলুম, সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা।

সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না। ১৫ চৈত্র ১৩১৭

আষাঢ় ১৩১৮

বর্ষশেষ

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই-যে উপাসনা, এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে ? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক, তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ। শেষ বলতে যে কী বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না ; বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করছে, আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করছে। তোমরা এই-যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করছ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি— তোমরা কেবল নিচ্ছ এবং খাচ্ছ। আর, আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আসছি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করছি ; ঘরে যা সঞ্চয় করে বসে ছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না, সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে। আজ কিছু যাচ্ছে, কাল কিছু যাচ্ছে ; অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্বাচলের যাত্রী, সূর্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ ; সেই দিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করছেন তাঁকে তোমরা পূর্বমুখ করেই প্রণাম করো। আমরা পশ্চিম-অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা করি ; সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আসছে, সেই আহ্বানও সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ ; একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ— কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই— এক দিকে যিনি শিশুর আর-এক দিকে তিনিই বৃদ্ধের। এক দিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে তাঁর একস্বরূপের দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত হয়েছে। কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না, ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, বিরাম যে কেবল কর্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায়, এই কথাটি আজ এই চৈত্রপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকাশে যেন মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জগতে যা-কিছু চলে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়, তারা দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি, তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতিদিন কেবল নূতন-নূতনকে পাচ্ছ আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্ছেই। এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তা হলে কী জন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ংকর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি ? তা হলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুত না, আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলই একটি পাওয়াতে এসে ঠেকছে ; সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড়ো একটি আশ্চর্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই 'পাই নি পাই নি' কান্নাটা থেকে যায়— অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুনতে পাই নে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো-একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুনতে দেয় না।

কিন্তু, একটু একটু করে রিক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে, সেটি কী গভীর পাওয়া, কী বিশুদ্ধ পাওয়া ! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবা-মাত্র মৃত্যুভয় চলে যায়। তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে, যা-কিছু যাচ্ছে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্ছে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে

পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে ; সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন-নূতনকে পায় না, তখন তার দেবার পালা। তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু, আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই তো পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলই আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। যখন আপনার নানা জিনিস থাকে তখন আমরা মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত কিছু আছে, সে-সব ঘুচলেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেইজন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এইজন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখতে পেতুম। তা হলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম ; সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলই মেঘের মতো সরে যাচ্ছে, কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে ব'লেই যিনি সরে যাচ্ছেন না, মিলিয়ে যাচ্ছেন না, তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাই আমি বলছি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বদ্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। কিছুই থাকছে না, সবই চলেছে, এইটিই লক্ষ্য করো। মন শান্ত ক'রে হৃদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে— এই-সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্ছে এমন একটি 'থাকা' স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগোচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি সেখানেও সেই এক যিনি, তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে। তা অনেক, তা অসংখ্য। কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। 'গেছে গেছে' এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন— এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা-কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও, দেখো : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ করো ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণুপরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু এক জায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলশব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্ম-মরণ এই নিঃশব্দ সংগীতে বিলীন হয়ে রয়েছে ; বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানের আসনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি। এই জায়গাটিতে তিনি যে আজ আমাকে বসতে দিয়েছেন এজন্যে আমি আমার মানবজীবনকে ধন্য মনে করছি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝখানটিতে তাঁর যে বক্ষ, যে কোল, সেই বক্ষে, সেই কোলে আমি আমার জীবনকে অনুভব করছি। এক দিকে অনেককে হারিয়েও আর-এক দিকে এককে পাওয়া যায় এই কথাটি জানবার সুযোগ তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাই নি, যা পেয়েছি এবং চাই নি, যা দিয়ে আবার নিয়েছেন, সমস্তকেই আজ জীবনের দিবাবসানের পরম মাধুর্যের মধ্যে যখন দেখতে পাচ্ছি তখন তাদের দুঃখবেদনার রূপ কোথায় চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠছে— কেননা, আমি যে দেখতে পাচ্ছি তিনি রয়েছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি— আমার যা-কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে দিতে পারে নি, সমস্তই আপনাকে সরিয়ে তাঁকেই দেখাচ্ছে। সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি—

একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনো তিনিই আছেন, এমন আনন্দ আর কিছু নেই, এমন অভয় আর কী হতে পারে!

আজ আমার মন তাঁকে বলছে : বারে বারে খেলা শেষ হয়, কিন্তু, হে আমার জীবন-খেলার সাথি, তোমার তো শেষ হয় না। ধুলার ঘর ধুলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায় ; কিন্তু যে তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ, সেই তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল, তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে এল তখন তোমাকে ধরেছি, তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বলতে পেরেছি, খেলা আমার হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে। দেখতে পাচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নূতন আয়োজন করছ, সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করছি।

এবারকার এ খেলার ঘরটাকে তা হলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আবর্জনার আঘাতে পদে পদে ধুলোর উপরে পড়তে হয়— এবার সে-সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই-সমস্ত ভাঙা খেলনার জোড়াতাড়া খেলা এ আর আমি পেরে উঠি নে। সব তুমি লও লও, সব কুড়িয়ে লও। যত বিঘ্ন দূর করো, যত ভগ্ন সরিয়ে দাও, যা-কিছু ক্ষয় হবার দিকে যাচ্ছে সব লয় করে দাও— হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। [৩০ চৈত্র ১৩১৭]

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

নববর্ষ

আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য এখনো দিক্‌প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে নি— এই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক।

এই-যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই-যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যুষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো, কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না, আকাশ-ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল, কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল— তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে; সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি; আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিনে বাতাসে নবীনতার আশিসমন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখতে দেখতে তখনই অনায়াসে শুকনো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়— এই-যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়। কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু, মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়— বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্গের মতো দিকে দিগন্তে চমকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশিদিনের সন্তান নয়, তবু জগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে যেন প্রাচীন। কেননা সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত ; যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাকতে পারছে না। সে আপনার শতসহস্র সংস্কারের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে ; সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস-মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখতে দেখতে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শতসহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মতো। চারি দিকের জগৎ নূতন থাকে, আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারি দিকের বিরাট প্রকৃতির থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন— সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না— অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারি দিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার। সেইজন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্মস্থানে গিয়ে পড়ে ; তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, 'প্রভু, তুমি আমাকেই মারছ।' বলি, 'আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা করো।' কিংবা বিদ্রোহের রক্তপাতাকা উড়িয়ে বলি, 'তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, এ আমি গ্রহণ করব না।'

মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষকোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই-সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসংগত সুসংহত করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা, ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুলছে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং সুষমার পরিবর্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারি দিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

সেইজন্যে বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমান নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে, এক দিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই, সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না ; তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয় ; বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেইজন্যে আমি বলছি, এই প্রত্যুষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে-একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই-যে অরুণালোকের সহজ নির্মলতা, এই-যে পাখির কাকলির স্বাভাবিক মাধুর্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয় ; যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ ; যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি এই আলোকের নির্মলতা আমারই নির্মলতা, এই আকাশের শান্তি

আমারই শাস্তি ; মনে যেন না করি স্তব পাঠ ক'রে, নামগান ক'রে, কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ ক'রে আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকে আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন, এই কথাটিকে সত্যরূপে মনের মধ্যে চিন্তা করো। একবার ধ্যান করে দেখো, আমাদের সেই নববর্ষের কী ভীষণ রূপ। তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বলছে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মতো বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয় ; সে এমন শান্তির নববর্ষ নয় ; পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম ক'রে আপন অধিকার লাভ করে ; আবরণের আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন ; তিনি তাকে সহজ জীবন দেন নি। সেইজন্যেই সাধন করে তবে মানুষকে মানুষ করতে হয় ; তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলছি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষ পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে তো সহজ দান নয়, আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি তবে মাথা তুলতে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি 'তোমার এ ভার বহন করতে পারি নে প্রভু, মনুষ্যত্বের অতি বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর'।

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন, তাই তো মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, কর্মের সাধনা, মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্যেই তার উপরে এত দাবি। এইজন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব করে চলতে হয় ; এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসংবরণ।

মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, 'তুমি বীর।' তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মতো আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না ; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, 'হে বীর, জাগ্রত হও। একটি দরজার পর আর-একটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আর-একটি পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ করো। তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না। ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক।'

এই-যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ; সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্বলকণ্ঠে বলি 'আমার বল নেই', সেইটেই আমাদের মোহ। দুর্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনিককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শানিত অস্ত্র সব ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। সে-সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করছে। এ-সমস্ত তো সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণহস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে ; পথ কেটে বাধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এসো, এসো, দলে দলে বাহির হয়ে পড়ো— নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠছে। সমস্ত অবসাদ কেটে যাক, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক— জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার প্রভুর।

না, না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা

স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মতো গ্রহণ করো।

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্তা জানাতে পারলুম না। কিন্তু, যুদ্ধ চলছে, এ যুদ্ধে ভঙ্গ দেব না। তুমি যখন সত্য, তোমার আদেশ যখন সত্য, তখন কোনো পরাভবকেই আমার চরম পরাভব বলে গণ্য করতে পারব না। আমি জয় করতেই এসেছি ; তা যদি না আসতুম তবে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে এক মুহূর্ত আমি দাঁড়াতে পারতুম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমার সূর্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ আমার মধ্যে প্রাণের সংগীত বাজিয়ে তুলেছে, তোমার মহামনুষ্যলোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি ; তোমার এত দানকে এত আয়োজনকে আমার জীবনের ব্যর্থতার দ্বারা কখনোই উপহসিত করব না। আজ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম চাইতে, শান্তি চাইতে দাঁড়াই নি। আজ আমি আমার গৌরব বিস্মৃত হব না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে ফেলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ বিশ্রামের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি ফিরে ফিরে পাঠিয়ে দাও, আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, তোমার আদেশ আরো তীব্র আরো কঠোর হয়ে ওঠে। কেননা, মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকবে তার এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও— পাঠাও তোমার মৃত্যুদূতকে, ক্ষতিদূতকে। জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে— সে তো সহজে মোচন করা যাবে না, তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, কত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু, কত মিথ্যা আর বলব। বারে বারে কত মিথ্যা সংকল্প আর উচ্চারণ করব। বাক্যের ব্যর্থ অলংকারকে আর কত রাশীকৃত করে জমিয়ে তুলব। জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক— সেই বেদনার বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র করো। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি— তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিনবলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দসংগীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাব, তা হলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। ১ বৈশাখ ১৩১৮

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা

কর্ম করতে করতে কর্মসূত্রে এক-এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে ; তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে, খুলতে, সেরে নিতে, চার দিকে কত রকমের টানাটানি করতে হয়— তাতে মন উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেইরকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল ; তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বসেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে ; এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কী করলে জট ছাড়ানো হবে, জঞ্জাল দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা অবহিতভাবে শুনতে পারবে, সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠল, তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল, পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল— ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে-সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। স্নান ও পানের জলের কিরকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম ; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল ; দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারি দিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়, চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়— পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্যাপ্ত বর্ষণ, এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা, আমারও মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারই ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা এক মুহূর্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ ক'রে, একটুর সঙ্গে আর-একটুকে জুড়ে গেঁথে, কোনো কালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু ভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষকোটি ফুলের নিগূঢ় মর্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করছে— যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে অকস্মাৎ সে কী আশ্চর্যরূপে দেখা দেয়। বহুদিনের মৃতপত্র তখন এক মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহুকালের শুষ্ক ধূলিকে এক মুহূর্তে শ্যামল করে তোলে— তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখতেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন— সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গম্ভীর— সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করছে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই, কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বলছে না ; কেবল ইচ্ছা করছে বিশ্বজগতের মধ্যে যে-একটি পরমগম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে, কোনো দুঃখ-বিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারছে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, 'আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই— তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাকবে, যে দীনতা কোনোদিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে ; নামবে তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাকবে তোমার প্রসাদধারা ; গহ্বর যত গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।'

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। বারিধারা ঝরছে ঝরছে— সমস্ত ধুয়ে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ; সমস্ত নবীন হয়ে উঠছে, শ্যামল হয়ে উঠছে। বাইরে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার, তারই মধ্যে নেমে আসছে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূতগুলি, ভরে ভরে নিয়ে আসছে তাঁরই সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই, এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে-ঘেরা আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কী গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব! সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে ; প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে— তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড়

মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারি দিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুশির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুশি হও! এই সহসা অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুশি, এই এক মুহূর্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুশি, সেই খুশির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মন প্রাণ শরীর আজ খুশি হয়ে উঠুক। আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কর্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে যাক— পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এসো এসো, তুমি এসো— আমার দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এসো! হে গোপন, তুমি এসো! প্রান্তরের এই নির্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এসো! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এসো, আজ বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও— তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শলাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি। ৬ বৈশাখ ১৩১৮

শ্রাবণ ১৩১৮

সত্যবোধ

আজকের এই প্রান্তরের উপর জ্যোৎস্নার আলোক দেখে আমার অনেক দিনের আরো কয়েকটি জ্যোৎস্নারাত্রির কথা মনে পড়ছে।

তখন আমি পদ্মানদীতে বাস করতুম। পদ্মার চরে নৌকা বাঁধা থাকত। শুক্লপক্ষের রাত্রিতে কতদিন আমি একলা সেই চরে বেড়িয়েছি। কোথাও ঘাস নেই, গাছ নেই, চাঁদের আলোর সঙ্গে বালুচরের প্রান্ত মিশিয়ে গেছে— সেই পরিব্যাপ্ত শুভ্রতার মধ্যে একটিমাত্র যে ছায়া সে কেবল আমার।

সেই আমার নির্জন সন্ধ্যায় আমার একজন সঙ্গী জুটল। তিনি আমাদের একজন কর্মচারী। তিনি আমার পাশে চলতে চলতে অনেক সময়েই দিনের কাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। সে সমস্তই দেনাপাওনার কথা, জমিদারির কথা, আমাদের প্রয়োজনের কথা।

সেই আমার কানের কাছে সেই একটিমাত্র মানুষের একটুখানি কণ্ঠের ধ্বনি এতবড়ো নক্ষত্রলোকের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিত এবং এতবড়ো একটি নিভৃত শুভ্রতার উপরেও যেন ঘোমটা পড়ে যেত, তাকে আর যেন আমি স্পষ্ট করে দেখতেই পেতুম না।

তার পরে তিনি চলে গেলে হঠাৎ দেখতে পেতুম আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম, সেইজন্যে চার দিকের বড়োকে আমি আর সত্য বলে জানতে পারছিলুম না; এতবড়ো শান্তিময় সৌন্দর্যময় আকাশ-ভরা প্রত্যক্ষ বর্তমানও আমার কাছে একেবারে কিছুই-না হয়ে গিয়েছিল।

এই নিয়ে কতদিন মনের মধ্যে আমি বিস্ময় অনুভব করেছি। এই কথা মনে ভেবেছি, যতক্ষণ কেবল আমারই সংক্রান্ত কথা হচ্ছিল, আমারই বিষয়কর্ম, আমারই আয়োজন প্রয়োজন— আমার মনের মধ্যে আমিই যখন একমাত্র প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলুম— বস্তুত তখনই আমার বিশ্বের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম। ততক্ষণ চাঁদ আমার কাছ থেকে তার জ্যোৎস্না ফিরিয়ে নিয়েছিল, নদীর কলধ্বনি আমাকে একেবারে নগণ্য করে দিয়ে পাশে থেকেও আমাকে অস্পৃশ্যের মতো পরিহাস করে চলে গিয়েছিল, এই দিগন্তব্যাপী শুভ্র আকাশের মধ্যে তখন আমি আর ছিলুম না— আমি নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলুম।

শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের মধ্যে যে ভাব, যে ভাবনা, চারি দিকের বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যেন কোনো সত্য যোগ নেই। নিখিলের মাঝখানে তাকে ধরে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় সে একটা অদ্ভুত মিথ্যা। জমিজমা হিসাব-কিতাব মামলা-মকদ্দমা এ-সমস্ত শূন্যগর্ভ বুদ্‌বুদ বিশ্বসাগরের মধ্যে কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে কত শতসহস্র বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক, তবু সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদেরও স্থান আছে। সমুদ্রের সমগ্র সত্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ঐ বুদ্‌বুদেরও যেটুকু সত্য সেটুকুকে একেবারে অস্বীকার করবার দরকারই হয় না। কিন্তু, আমরা যখন এই বুদ্‌বুদের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারে হারাই তখনই আমাদের বিপদ ঘটে।

আমরা বড়োর মধ্যে আছি এই কথাটি যখন আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকে তখন ছোটোকে স্বীকার করে নিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বড়ো জগতে আমাদের বাস, বড়ো সত্যে আমাদের চির আশ্রয়, এই কথাটি যাতে ভুলিয়ে দেয় তাতেই আমাদের সর্বনাশ করে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে বড়োতে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। ছোটোখাটোর মধ্যে সহজেই আমাদের চলে যায়। কিন্তু যাতে তার কেবলমাত্র চলে যায় মানুষকে তার মধ্যে তো মানুষ থাকতে দেয় নি। মানুষকে সকল দিকেই মানুষ তার থেকে বাইরে টেনে আনছে।

এই-যে তোমরা মানবশিশু, পৃথিবীতে তোমরা সকলের চেয়ে ছোটো, আজ তোমাদের আমরা এই মন্দিরে এনেছি, জগতে সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তাঁকে প্রণাম করতে। বাহির থেকে দেখলে কারও হাসি পেতে পারে, মনে হতে পারে এর কী দরকার।

কিন্তু, মনকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো, এতবড়ো আকাশে, এতবড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বা আমাদের জন্মাবার কী দরকার ছিল। আমাদের চার দিকে যথোপযুক্ত স্থানটুকু রেখে তার চার দিকে বেড়া তুলে দিলে কোনো অসুবিধা হত না ; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে হয়তো সুবিধা হত, অনেক কাজ হয়তো সহজ হতে পারত।

কিন্তু, ছোটোর পক্ষেও বড়োর একটি গভীরতম অন্তরতম দরকার আছে। সে এক দিকে অত্যন্ত ছোটো হয়েও আর-এক দিকে অত্যন্ত বড়োকে এক মুহূর্তের জন্যেও হারায় নি এই সত্যের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। তার চার দিকে সমস্তই তাকে কেবল বড়োর কথাই বলছে। আকাশ কেবলই বলছে 'বড়ো', আলোক কেবলই বলছে 'বড়ো', বাতাস কেবলই বলছে 'বড়ো'। দিবসের পৃথিবী তাকে বলছে 'বড়ো', রাত্রের নক্ষত্রমণ্ডলী তাকে বলছে 'বড়ো'। গ্রহনক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে নদী সমুদ্র প্রান্তর সকলেই তার কানের কাছে অহোরাত্র এই এক মন্ত্রই জপ করছে— 'বড়ো'। ছোটো মানুষটি বড়োর মধ্যেই দৃষ্টি মেলেছে, সে বড়োর মধ্যেই নিশ্বাস নিচ্ছে, সে বড়োর মধ্যেই সঞ্চরণ করছে।

এইজন্যে মানুষ ছোটো হয়েও কিছুতেই ছোটোতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এমন-কি, ছোটোর মধ্যে যে সুখ আছে তাকে ফেলে দিয়ে বড়োর মধ্যে যে দুঃখ আছে তাকেও মানুষ ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থনা করে। মানুষের জ্ঞান সূর্য চন্দ্র তারার মধ্যেও তত্ত্ব সন্ধান করে বেড়ায় ; তার শক্তি কেবলমাত্র ঘরের মধ্যে আপনাকে আরামে আটকে রাখতে পারে না। এই বড়োর দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেই দিকেই তার সত্য— এই সহজ কথাটি কখন্ সে ভুলতে থাকে ? যখন সে আপন হাতের-গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চার দিক ঘিরে তুলতে থাকে। তখন এই জগৎ থেকে যে বড়োর মন্ত্রটি দিনরাত্রি উঠছে সেটি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না। আমরা ছোটো হয়েও বড়ো এই মস্ত কথাটি তখন দিনে দিনে ভুলে যেতে থাকি। এবং আমাদের সেই এক বড়ো দেবতার আসনটি ছোটো ছোটো শতসহস্র অপদেবতা এসে অধিকার করে বসে।

বড়োর মধ্যেই আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে : ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। এই কথাটা একেবারে ভুলে গিয়ে যখন আমরা নিশ্চয় করে মনে করে বসি ঘরের মধ্যেই আমাদের বাস, ধনের মধ্যেই আমাদের বাস, তখনই হৃদয়ের মধ্যে যত রাজ্যের উৎপাত জেগে ওঠে— যত কাম ক্রোধ লোভ মোহ। বদ্ধ জলে বদ্ধ বাতাসে যেমন কেবলই বিষ জমে, তেমনি যখনই মনে করি আমাদের সংসারক্ষেত্র আমাদের কর্মক্ষেত্রই আমাদের সত্য আশ্রয় তখনই বিরোধ বিদ্বেষ সংশয় অবিশ্বাস পদে পদে জেগে উঠতে থাকে ; তখনই আপনাকে ভুলতে পারি নে এবং অন্যকে কেবলই আঘাত করি।

যেমন আপনার সংসারের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে না দেখে জগতের মধ্যেই আপনার সংসারকে দেখলে তবে সত্য দেখা হয়, সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকলে নিজের প্রবৃত্তির বিকৃতি সহজে ঘটতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক মানুষকেও, আমাদের সত্য করে দেখা চাই।

আমরা মানুষকে সত্য করে কখন্ দেখি নে ? কখন্ তাকে ছোটো করে দেখি ? যখন আমার দিক থেকে

তাকে দেখি, তার দিক থেকে তাকে দেখি নে। আমার পক্ষে সে কতখানি এইটে দিয়েই আমরা মানুষকে ওজন করি। আমার পক্ষে তার কী প্রয়োজন, আমি তার কাছ থেকে কতটা আশা করতে পারি, আমার সঙ্গে তার ব্যাবহারিক সম্বন্ধ কতখানি, এই বিচারের দ্বারাই মানুষকে সীমাবদ্ধ করে জানি। যেমন আমরা পৃথিবীতে অধিকাংশ সময়ে এই ভাবেই বাস করি যে, কেবল আমার বিষয়সম্পত্তিকে আমার ঘরবাড়িকে ধারণ করবার জন্যই বিশ্বজগৎটা রয়েছে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই। তেমনি আমরা মনে করি আমার প্রয়োজন এবং আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সম্বন্ধকে বহন করবার জন্যেই মানুষ আছে— আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সে যে কতখানি তা আমরা দেখি নে।

জগৎকে অহরহ ছোটো করে দেখলে যেমন নিজেকেই ছোটো করে ফেলা হয়, তেমনি মানুষকে কেবলই নিজের ব্যাবহারিক সম্বন্ধে ছোটো করে দেখলে নিজেকেই আমরা ছোটো করি। তাতে আমাদের শক্তি ছোটো হয়ে যায়, আমাদের প্রীতি ছোটো হয়ে যায়। জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুকরো করে দেখেন নি। এতে করে তাঁদের নিজেদের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে তাঁরা মানুষের জন্যে দান করতে পেরেছেন।

নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। এমন গল্প শোনা গেছে, ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সা মাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখে মানুষের প্রাণকে সে এক পয়সার চেয়েও ছোটো করে ফেলেছে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করি নে— আমার লুব্ধ বাসনা দ্বারা অনায়াসেই আমরা মানুষকে খর্ব করতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার ঈর্ষা ক্রোধ বিদ্বেষ এ-সমস্তেরই মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে আমরা আমার দিক থেকে দেখার দরুন তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এর ফল হয় এই যে, এতে করে আমাদের নিজেদেরই মূল্য কমে যায়। অন্যকে নামিয়ে দিলেই আমরা নেমে যাই। কেননা, মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ, আমরা বড়ো হয়ে পরস্পরকে বড়ো করি। যেখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ নামিয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণকেও নীচে নামতে হয়েছে, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শূদ্র যদি বড়ো হত সে স্বতই ব্রাহ্মণকে বড়ো করে রাখত। রাজা যদি নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা বুঝে প্রজাকে খর্ব করে রাখে তবে নিজেকে সে খর্ব করেই। কারণ, কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন নয় ; প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষকে মূল্য দান করে। যেখানে মানুষ ভৃত্যকে ভৃত্যমাত্র মনে না ক'রে মানুষ বলে জ্ঞান করে সেখানে সে মনুষ্যত্বকে সম্মান দেয় ব'লেই যথার্থরূপে নিজেকেই সম্মানিত করে।

কিন্তু, আমাদের তামসিকতাবশত জগতেও যেমন আমরা সত্য করে বাস করি নে, মানুষকেও তেমনি আমরা সত্য করে দেখতে পারি নে। সেইজন্যে জগৎকে কেবলই আমার সম্পত্তি করে তুলব এই কথাই আমার অহোরাত্রের ধ্যান হয় এবং সেইজন্যই অধিকাংশ জগৎই আমার কাছে থেকেও না-থাকার মতো হয়ে যায়, মানুষকেও তাই আমরা আমাদের নিজের সংস্কার স্বভাব ও প্রয়োজনের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই দেখি ; সেইজন্যে মানুষের যে দিকটা নিত্য সত্য, যে দিকটা মহৎ, সে দিকটা আমাদের চোখেই পড়ে না। সেইজন্যে ব্যবসায়ীর মতো আমরা কেবলমাত্র তার মজুরির দাম দিই, আত্মীয়ের মতো তার মনুষ্যত্বের কোনো দাম দিই নে। এইজন্যে যদিচ আমরা বড়োর মধ্যেই আছি তবু আমরা বড়োকে গ্রহণ করি নে, যদিচ সত্যই আমাদের আশ্রয় তবু সে আশ্রয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি।

এইরকম অবস্থায় মানুষকে আমরা অতি অনায়াসেই আঘাত করি, অপমান করি। মানুষকে এরকম উপেক্ষা করে অবজ্ঞা করে আমাদের যে কোনো প্রয়োজনসিদ্ধি হয় তা নয়, এমন-কি, অনেক সময় হয়তো প্রয়োজনের ব্যাঘাত ঘটে— কিন্তু, এ একটা বিকৃতি। বৃহত্ত্ব সত্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে স্বভাবতই যে বিকৃতি দেখা দেয় এ সেই বিকৃতি। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে আমরা আমাদের পরিবেষ্টনকে সংকীর্ণ করে নিয়েছি বলেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলো দূষিত হয়ে উঠতে থাকে ; সেই দূষিত প্রবৃত্তিই মারীরূপে

আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে মারতে থাকে।

এই আশ্রমে আমাদের যে সাধনা সে হচ্ছে এই বিশ্বে এবং মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভের সাধনা। সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বোধ করতে চাই। এ সাধনা সহজ নয়; কিন্তু কঠিন হলেও তবু সত্যের সাধনাই করতে হবে। এ আশ্রম আমাদের সাধনার ক্ষেত্র; সে কথা ভুলে গিয়ে যখনই একে আমরা কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে মনে করি তখনই আমাদের আত্মার বোধশক্তি বিকৃত হতে থাকে, তখনই আমাদের আমিটাই বলবান হয়ে ওঠে। তখনই আমরা পরস্পরকে আঘাত করি, অবিচার করি। তখন আমাদের উক্তি অত্যুক্তি হয়, আমাদের আচার অত্যাচার হয়ে পড়ে।

কর্ম করতে করতে কর্মের সংকীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে; কিন্তু দিনের মধ্যে অন্তত একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে উদার সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন এমনভাবে যাপন করতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা সত্যকে মানি। আমাদের সত্য করে বাঁচতে হবে; সমস্ত মিথ্যার জাল, সমস্ত কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতেই হবে— জগতে যিনি সকলের বড়ো তিনিই আমার জীবনের ঈশ্বর এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে তাঁর মধ্যে বেঁচে আছি এ কথা কি জীবনে একদিনও অনুভব করে যেতে পারব না? এই নানা সংস্কারে আঁকা, নানা প্রয়োজনে আঁটা, আমির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চার দিকে দেখতে পাব জগৎ কী আশ্চর্য অপরূপ! মানুষ কী বিপুল রহস্যময়! তখন মনে হবে এই-সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এই যেন আমি প্রথম সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি; আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয় নি। সেইদিনই এই জ্যোৎস্নারাত্রি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দেবে, এই আকাশে এই বাতাসে একটি চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সেইদিন আমাদের মানবসংসারের মধ্যে জগৎ-সৃষ্টির চরম অভিপ্রায়টিকে সুগভীরভাবে দেখতে পাব; এবং অতি সহজেই দূর হয়ে যাবে সমস্ত দাহ, সমস্ত বিক্ষোভ, এই অহমিকাবেষ্টিত ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত দুঃসহ বিকৃতি।

ভাদ্র ১৩১৯

সত্য হওয়া

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য করে বিরাজ করছেন তাঁকেই একেবারে সহজে জানব এই আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে, এই কথাটি নিয়ে সেদিন আলোচনা করা গিয়েছিল।

কিন্তু, এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়— যিনি সকলের চেয়ে সত্য, যাঁর মধ্যে আমরা আছি, তাঁকে নিতান্ত সহজেই কেন না বুঝি— তাঁকে জানবার জন্যে নিয়ত এত সাধনা এত ডাকাডাকি কেন?

যার মধ্যে আছি তার মধ্যেই সহজ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে; এখানে তারই উল্লেখ করব। মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন হয়ে থাকে। মাতার দেহ থেকে সে রস গ্রহণ করে, তাতে তাকে কোনো কষ্ট করতে হয় না। মায়ের স্বাস্থ্যেই তার স্বাস্থ্য, মায়ের পোষণেই তার পোষণ, মায়ের প্রাণেই তার প্রাণ।

যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিশ্চেষ্টতা থেকে একেবারে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। এখানে আলোক অজস্র, আকাশ উন্মুক্ত, এখানে সে কোনো আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু, তবু এই মুক্ত আকাশ প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করেও এই মুক্তির মধ্যে সঞ্চরণের সহজ অধিকার সে একেবারেই পায় না। অনেক দিন পর্যন্ত সে চলতে পারে না, বলতে পারে না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তার হৃদয়ে মনে যে শক্তি আছে, যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা সে এই পৃথিবীর মধ্যে সহজ হয়ে উঠবে, তাকে অক্লান্ত চালনা করে অনেক দিনে তবে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, তবু অনেক দিন পর্যন্ত গর্ভের সংস্কার তার ঘোচে না। সে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটে।

কিন্তু জড়ত্বের এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও তবু আমরা জানি সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করছে, জানি তার এই নিশ্চেষ্ট নিশ্চলতা চিরকালের সত্য নয়। এখনো যদিচ সে চোখ বুজে কাটায়, তবু সে যে আলোকের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা সত্য, এবং এই সত্যটি ক্রমশই তার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতররূপে অধিকার করতে থাকবে।

তৎপূর্বে তার চেষ্টা অল্প নয়। বার বার সে পড়ে পড়ে যাচ্ছে, বার বার সে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু তার এই কষ্ট দেখে, এই অক্ষমতা দেখে আমরা কখনোই বলি নে যে, তবে ওর আর কাজ নেই— ও থাক্ মায়ের কোলেই দিনরাত পড়ে থাক্। আমরা তাকে ধরে ধরে বারংবার চলার চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত করি। কেননা, আমরা নিশ্চয় জানি, এই মানবশিশু যেখানে জন্মেছে সেইখানে সঞ্চরণের শক্তিটা যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি নে তবু সেইটেই ওর পক্ষে সত্য, অক্ষমতাই যদিচ চোখে দেখতে পাচ্ছি তবু সেইটেই সত্য নয়। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভর করে শিশুকে আমরা অভ্যাসে প্রবৃত্ত রাখি ব'লেই অবশেষে একদিন তার পক্ষে চলা বলা এমনি সহজ হয়ে যায় যে, তার জন্যে এক মুহূর্ত চেষ্টা করতে হয় না।

মানুষের মধ্যে আত্মা মুক্তির ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে। পশুর চিত্ত বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত। সে প্রাকৃতিক সংস্কারের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতির চেষ্টা তার মধ্যে চেষ্টারূপে কাজ করছে। ভ্রূণের মতো সে কেবল নিচ্ছে, কেবল বাড়ছে, আপনার প্রাণকে সে কেবল পোষণ করছে। এমনি করে বিশ্বের মধ্যে মিলিত হয়ে সে চলছে বলে ভ্রূণের মতো আপনাকে সে আপনি জানে না।

মানুষের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ থেকে অধ্যাত্মলোকে জন্মেছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকৃতির ভিতর থেকে কেবল অন্ধভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চয় করতে থাকবে— এ আর হতেই পারে না। এখন সে কর্তা— এখন সে সৃষ্টি করবে, আপনাকে দান করবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিক্ষেত্রে জন্মেছে যদিচ এই কথাটাই সত্য, তবু একেবারেই এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি নে। প্রকৃতির গর্ভবাসের মধ্যে বদ্ধ অবস্থার যে সংস্কার তা সে এই মুক্তলোকের মধ্যে এসেও একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে এ কথা এখনো তাকে দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। এখনো সে যেন প্রবৃত্তির নাড়ির দ্বারা প্রকৃতি থেকে রস শোষণ করে কেবল জড়ভাবে আপনাকে পুষ্ট করতে থাকবে এমনি তার ভাব ; আপনার মধ্যে তার আপনার যে একটি সত্য আশ্রয় আছে এখনো তার উপরে নির্ভর দৃঢ় হয় নি, এইজন্যে প্রকৃতিকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে ; এইজন্যেই শিশুর মতোই সে সব জিনিসকে মুঠোয় নিতে এবং মুখে পুরতে চায়— জানে না জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিসকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করবার দিন তার এসেছে। এখনো সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে পাবে, আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারা, দান করার দ্বারাই, সে আপনাকে পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করবে ; সত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের গর্ভের মধ্যে নয়, সেই সত্যের মধ্যে তার ক্ষয় নেই, তার ভয় নেই— আপনাকে নিঃসংকোচে শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়ে এই অমর সত্যকে প্রকাশ করবার পরম সুযোগ হচ্ছে মানবজন্ম এ কথাটাকে এখনো সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারছে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্বল দ্বিধা দেখেই একদল দীনচিত্ত লোক মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে— মানুষের আত্মাকে তারা দেখতে পায় না ; তারা ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাতুর অহংটাকেই চরম বলে জানে, অন্যটাকে কল্পনা বলে স্থির করে।

কিন্তু, শিশু যদিচ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং অচেতনপ্রায় ভাবে তার স্তনপান করছে, অর্থাৎ যদিচ তার ভাব দেখে মনে হয় সে একান্তভাবে পরাশ্রিত, তবু যেমন সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, বস্তুত সে স্বাধীন কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেই জন্মলাভ করেছে— তেমনি মানুষের আত্মা সম্বন্ধেও আমরা আপাতত যত বিরুদ্ধ প্রমাণই পাই-নে কেন তবু এই কথাই নিশ্চিত সত্য যে, বিষয়রাজ্যের সে দীন প্রজা নয়, পরমাত্মার মধ্যেই তার সত্য প্রতিষ্ঠা। সে অন্য যে-কোনো জিনিসকেই মুখে প্রার্থনা করুক, অন্য যে-কোনো জিনিসের জন্যই শোক করুক, তার সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরেই পরমাত্মার মধ্যে একান্ত সহজ হবার প্রার্থনাই সত্য এবং তাঁর

মধ্যে প্রবুদ্ধ না হবার শোকই তার একমাত্র গভীরতম ও সত্যতম শোক।

শিশুকে সংসারে যে আমরা এত বেশি অক্ষম বলে দেখি তার কারণই হচ্ছে সে একান্ত অক্ষম নয়। তার মধ্যে যে সত্য ক্ষমতা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করে আছে তারই সঙ্গে তুলনা করেই তার বর্তমান অক্ষমতাকে এমন বড়ো দেখতে হয়। এই অক্ষমতাই যদি নিত্য সত্য হত তা হলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তারই উদয় হত না।

সূর্যগ্রহণের ছায়া যেমন সূর্যের চেয়ে সত্য নয়, তেমনি স্বার্থবদ্ধ মানবাত্মার দুর্বলতা মানবাত্মার চেয়ে বড়ো সত্য নয়। মানুষ অহংকে নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, তাই নিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন যত উত্থান পতনই হোক-না কেন, তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়। মানুষের আত্মাই তার সত্য বস্তু বলেই তার অহমের চাঞ্চল্য এত বেশি প্রবল ক'রে আমাদের আঘাত করে। এই তার অন্তরতম সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠার সাধনাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা। এই সত্যের মধ্যে সত্য হতে গেলে বদ্ধভাবে জড়ভাবে হওয়া যায় না ; বাধা কাটিয়ে তাকে লাভ না করলে লাভ করাই যায় না। সেইজন্য মানুষের আত্মা যে মুক্তিক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে সেই ক্ষেত্রের সত্য অধিকার সে নিশ্চেষ্টভাবে পেতেই পারে না। এইজন্যেই তার এত বাধা, এবং তার এই-সকল বাধার দ্বারাই প্রমাণ হয় অসত্যপাশ হতে মুক্ত হওয়াই তার সত্য পরিণাম।

শিশু যখন চলতে গিয়ে পড়ছে তখন যেমন তাকে বারংবার পতনসত্ত্বেও চলার অভ্যাস করতে দেওয়া হয়, কারণ সকলেই জানে পড়াটাই তার চরম নয়, সেইরকম প্রত্যহ সত্যলোকে ব্রহ্মলোকে চলার অভ্যাস মানুষকে করতেই হবে। কোনো আলস্য কোনো ক্লেশে নিরস্ত হলে চলবে না।

প্রত্যহ তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে চিন্তা করা, স্মরণ করা, এইটেই হচ্ছে পন্থা। সংসারে যতই বাঁধা থাকি-না কেন, তবু সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত অনিত্যের মধ্যে সেই অনন্ত সত্যকে স্বীকার করার দ্বারা মানুষ আপনার আত্মাকে সম্মান করে। বিষয়ের দাসত্ব যতই করি তবু সেইটেই পরম সত্য নয়, প্রতিদিন এই কথা মানুষকে কোনো-এক সময় স্বীকার করতেই হবে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য, এবং এই সত্যেই আমি সত্য ; ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রতিদিনের ব্যবহারে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন এখনো করতে পারছি নে ; তবু মানুষকে এক দিকে আকাশে মাথা তুলে এবং এক দিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতে হবে যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য। এই সত্য, এই সত্য, এই সত্য— প্রতিদিন বলতে হবে ; বিমুখ মনকেও বলাতে হবে ; ক্ষীণ কণ্ঠকেও উচ্চারণ করাতে হবে। নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করছি এই বোধটি ক্রমশই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় দিন কাটবে না, তখন বার বার ধুলোর উপর পড়ে পড়ে যাব না, তখন আলোর দিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখব ; তখন বাইরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মার চেয়ে বড়ো করে জানব না, এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্মপরিচয় বলে মনে করব না।

ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি ; সেই শক্তি আমাদের আছে ; জানতে পারছি নে বলে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করব না। বার বার তাঁকে ডাকতে হবে, বার বার তাঁকে বলতে হবে— এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতি মুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে। বলতে বলতে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে, আমার মন বাজতে থাকবে, আমার বাহির বাজতে থাকবে, আমার সংসার বাজতে থাকবে। আমার চিত্ত বলবে সত্যং, আমার বিশ্বচরাচর বলবে সত্যং। ক্রমে আমার প্রতি দিনের প্রত্যেক কর্ম বলতে থাকবে সত্যং। বেহালা যন্ত্র যতই পুরাতন হয় ততই তার মূল্য বেশি হয় তার কারণ, অনেক দিন থেকে সুর বাজতে বাজতে বেহালার কাষ্ঠফলকের পরমাণুগুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন সুরকে আর সে বাধা দেয় না। সেইরকম আমরা প্রতিদিন তাঁকে যতই ডাকতে থাকি ততই আমাদের শরীর মনের সমস্ত অণু পরমাণু তাঁর সত্য নামে এমন সত্য হয়ে উঠতে থাকে যে বাজতে আর দেরি হয় না, কোথাও কিছুমাত্র আর বাধা দেয় না।

এই সত্যনাম মানুষের সমস্ত শরীরে মনে, মানুষের সমস্ত সংসারে, সমস্ত কর্মে, একতান আশ্চর্য স্বরসম্মিলনে বিচিত্র হয়ে বেজে উঠবে বলে বিশ্বমহাসভার সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে। সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, সমস্ত উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী মানুষের লোকালয়ের দিকে কান পেতে রয়েছে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের চিত্ত দিয়ে তাঁর অমৃতরস আস্বাদন করে মানুষের কণ্ঠে তাঁকে সমস্ত আকাশে ঘোষণা করে দেব এরই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যুগ যুগান্তর ধরে তার সভা রচনা করছে। বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণু এই সুরের স্পন্দনে পুলকিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই তোমরা জেগে ওঠো, এখনই তোমরা তাঁকে ডাকো— এই বনের গাছপালার মধ্যে তার মাধুর্য শিউরে উঠতে থাকবে, এই তোমাদের সামনেকার পৃথিবীর মাটির মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকাগৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ। নিজের উদরপূরণ এবং স্বার্থসাধনের জন্য নয়। এই কথা প্রত্যহ মনে রেখে নিখিল জগতের সাধনাকে আমরা আপনার সাধনা করে নেব। আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখব, জানব, সত্যে সঞ্চরণ করব এবং অসংকোচে ঘোষণা করব তুমিই সত্য।

পৌষ ১৩১৯

সত্যকে দেখা

এই জগতে কেবল আমরা যা চোখে দেখছি কানে শুনছি তাতেই আমাদের চরম তৃপ্তি হচ্ছে না। আমরা কাকে দেখতে চাচ্ছি একেবারে সমস্ত মন সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে? আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়ে, আমাদের যা-কিছু আছে তার সমস্তকে দিয়ে, যেন আমরা কাকে দেখতে পাব। আমাদের সেই সমস্তটিকে এখনো মেলা হয় নি— আমাদের চক্ষু মন হৃদয় সমস্তকে একটি উন্মীলিত শতদলের মতো একেবারে এক করে খুলে দেওয়া হয় নি। সেইজন্যে হাজার হাজার বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে একটার পর আর-একটাকে দেখে চলেছি, কিন্তু যাকে নিয়ে এই সমস্ত বস্তুই বাস্তব সেই অখণ্ড সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, জগতে কেবল আমরা বস্তুকে দেখব না, সত্যকে দেখব, এই একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীর করে জাগছে। এই যেমন মাটি জল আলো আমরা চোখ মেলে সহজে দেখছি তেমনি এই সমস্ত দেখার মধ্যে এমনি সহজেই সত্যকে দেখব, এই ইচ্ছা আমাদের সকল ইচ্ছার মূলে নিত্য নিয়ত রয়েছে।

শাবক পাখির যখন চোখ ফোটে নি, যখন আলো যে কী সে জানেও না, তখন তার প্রাণের মূলে সেই আলো দেখবার বাসনা নিহিত হয়ে কাজ করছে। যতক্ষণ সে আলো দেখে নি ততক্ষণ সে জগৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু একটু করে জানছে; সমস্তকে এক মুহূর্তে এক আলোতে একযোগে জানা যে কাকে বলে তা সে বোঝেও না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই বিশ্বের জ্যোতিতেই যে তার চোখের জ্যোতির সার্থকতা এই তত্ত্বটি তার অন্ধতার অন্ধকারে তার মুদ্রিত চোখের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তেমনি আমার মধ্যে যে এক সত্য আছে যাকে অবলম্বন করে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা পরস্পর গ্রথিত হয়ে একটি অর্থ লাভ করে, সেই আমার মধ্যেকার সত্য বিশ্বের সত্যকে আপনার চরম সত্য বলে সর্বত্র অতি সহজে উপলব্ধি করবে, এই আকাঙ্ক্ষাটি তার মধ্যে অহরহ গূঢ়ভাবে রয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাটির গভীর ক্রিয়া-ফলে আমাদের আত্মার মুদ্রিত চোখ একদিন ফুটবে; সেদিন আমরা যে দিকে চাব কেবল খণ্ড বস্তুকে দেখব না, অখণ্ড সত্যকে দেখব।

যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা এই হচ্ছে আমাদের সকল দেখার চরম সাধনা। সেই দেখাটি খুলবে, সেই চোখটি ফুটবে, এইজন্যেই তো রোজ আমরা দু বেলা তাঁর নাম করছি, তাঁকে প্রণাম করছি। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, তাঁর দিকে মুখ তুলতে তুলতে, ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, বাধা কেটে যেতে থাকবে, আত্মার চোখ খুলে যাবে। যেমনি খুলে যাবে অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, কিছু নয়— অমনি সহজে দেখা, অমনি আমার মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা, অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি। অমনি তখনই অতি সহজে উপলব্ধি যে, তাঁরই আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে নাচছে, তাঁরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। অমনি জানতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমাকে ধরে আছেন ; এই সংসার আমার আশ্রয় এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমার আশ্রয়। তখন এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে, আলোক আছে বলে দেখছি তা নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্ছে, তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখছি ; তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করছি ; তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করছে ; তাঁরই আনন্দে আমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্ছি।

তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা জান বা না জান তোমাদের গভীর আত্মার পরম চাওয়ার ধন হচ্ছেন তিনি। আমাদের এই আমি সেই পরম আমির মুখোমুখি হয়ে না বসতে পারলে কখনোই তার প্রেম চরিতার্থ হবে না। আর-সমস্তকে সে ধরছে ছাড়ছে হারাচ্ছে ; তাই সে এমন একটি আমিকে আপনার প্রত্যক্ষ বোধে চাচ্ছে যার মধ্যে সে চিরন্তনরূপে সম্পূর্ণরূপে আছে ; অন্য জিনিসের মতো যাকে ধরতে হয় না, ছুঁতে হয় না, রাখতে হয় না। আমাদের এই ভিতরকার একলা আমি সেই-যে তার পরম সাথিকে সাক্ষাৎ করে জানতে চায় তার কান্না কি শুনতে পাচ্ছ না। তাকে আর তুমি পদে পদে ব্যর্থ কোরো না, তার কান্না থামাও। তোমার আপনকে তুমি আপনি সার্থক করবার জন্যে এসো এসো, প্রতিদিন সাধনায় বোসো। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা যেন মনে পড়ে তিনি আছেন, আমি তাঁর মধ্যে আছি। যদি অর্ধরাত্রে জেগে ওঠ তবে একবার চোখ চেয়ে দেখে মনকে এই কথাটি বলিয়ে নিয়ো যে, তিনি তাঁর সমস্ত লোকলোকান্তরকে নিয়ে অন্ধকারকে পরিপূর্ণ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আছি। মধ্যাহ্নে কাজ যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে তোমাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে তখন মুহূর্তকালের জন্যে আপনাকে থামিয়ে এই কথাটি বোলো— তুমি আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি। এমনি করেই সকল সময়ে সকল দেখার মধ্যে সত্যকে দেখা সহজ হয়ে যাবে। প্রতিদিন উপাসনায় যখন তাঁর কাছে বসবে মনকে বিমুখ হতে দিয়ো না। তিনি আছেন, তাঁরই সামনে এসে বসেছি, এই সহজ কথাটি যেন এক মুহূর্তেই মন সহজ করে বলতে পারে ; যেন এক নিমেষেই একেবারেই তোমার মাথা তাঁর পায়ের কাছে এসে ঠেকে। প্রথম কিছুদিন মন চঞ্চল হতে পারে ; কিন্তু প্রতিদিন বসতে বসতে ক্রমেই বসা সত্য হয়ে উঠবে, ক্রমেই তাঁর কাছে পৌঁছতে আর দেরি হবে না।

মাঘ ১৩১৯

শুচি

প্রসঙ্গক্রমে আজ দ্বিপ্রহরে আমার একটি পবিত্র বাল্যস্মৃতি মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বালক বয়সে যখন একটি খৃস্টান বিদ্যালয়ে আমি অধ্যয়ন করেছিলুম তখন একটি অধ্যাপককে দেখেছিলুম যাঁর সঙ্গে আমার সেই অল্পকালের সংসর্গ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে।

শুনেছিলুম তিনি স্পেনদেশের একটি সম্ভ্রান্ত ধনীবংশীয় লোক, ভোগৈশ্বর্য সমস্ত পরিত্যাগ করে ধর্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ, কিন্তু তিনি তাঁর মণ্ডলীর আদেশক্রমে এই দূর প্রবাসে এক বিদ্যালয়ে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজ করছেন।

আমাদের ক্লাসে অল্প সময়েরই জন্য তাঁকে দেখতুম। ইংরাজি উচ্চারণ তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল, সেজন্যে ক্লাসের ছেলেরা তাঁর পড়ানোতে শ্রদ্ধাপূর্বক মন দিত না ; বোধ করি সে তিনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু তবু সেই পরম পণ্ডিত অবজ্ঞাপরায়ণ ছাত্রদের নিয়ে অবিচলিত শান্তির সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করে যেতেন।

কিন্তু, নিশ্চয়ই তাঁর সেই শান্তি কর্তব্যপরায়ণতার কঠোর শান্তি নয়। তাঁর সেই শান্ত মুখশ্রীর মধ্যে আমি গভীর একটি মাধুর্য দেখতে পেতুম। যদিচ আমি তখন নিতান্তই বালক ছিলুম, এবং এই অধ্যাপকের সঙ্গে নিকট-পরিচয়ের কোনো সুযোগই আমার ছিল না, তবু এই সৌম্যমূর্তি মৃদুভাষী তাপসের প্রতি আমার ভক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল।

আমাদের এই অধ্যাপকটি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁকে স্মরণ করলে আমার মন আকৃষ্ট হত। আমি তাঁর মধ্যে কী দেখতে পেতুম সেই কথাটি আজ আমি আলোচনা করে দেখছিলুম।

তাঁর যে সৌন্দর্য সে একটি নম্রতা এবং শুচিতার সৌন্দর্য। আমি যেন তাঁর মুখের মধ্যে, তাঁর ধীর গতির মধ্যে, তাঁর শুচিশুভ্র চিত্তকে দেখতে পেতুম।

এ দেশে আমরা শুচিতার একটি মূর্তি প্রায়ই দেখতে পাই, সে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যেন নিজের চতুর্দিককে কেবলই নিজের সংস্রব থেকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলতে থাকে। তার শুচিতা কৃপণের ধনের মতো কঠিন সতর্কতার সঙ্গে অন্যকে পরিহার করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এইরকম কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা বিশ্বকে কাছে টানে না, তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে।

কিন্তু, যথার্থ শুচিতার ছবি আমি আমার সেই অধ্যাপকের মধ্যে দেখেছিলুম। সেই শুচিতার প্রকৃতি কী, তার আশ্রয় কী ?

আমরা শুচিতার বাহ্য লক্ষণ এই একটি দেখেছি— আহারে বিহারে পরিমিত ভাব রক্ষা করা। ভোগের প্রাচুর্য শুচিতার আদর্শকে যেন আঘাত করে। কেন করে। যা আমার ভালো লাগে তাকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা এবং ভোগ করার মধ্যে অপবিত্রতা কেন থাকবে। বিলাসের মধ্যে স্বভাবত দূষণীয় কী আছে। যে-সকল জিনিস আমাদের দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শবোধকে পরিতৃপ্ত করে তারা তো সুন্দর, তাদের তো নিন্দা করবার কিছু নেই। তবে নিন্দাটা কোন্‌খানে ?

বস্তুত নিন্দাটা আমারই মধ্যে। যখন আমি সর্বপ্রযত্নে আমাকেই ভরণ করতে থাকি তখনই সেটা অশুচিকর হয়ে ওঠে। এই আমার দিকটার মধ্যে একটা অসত্য আছে যেজন্য এই দিকটা অপবিত্র। অন্নকে যদি গায়ে মাখি তবে সেটা অপবিত্র— কিন্তু, যদি খাই তাতে অশুচিতা নেই— কারণ, গায়ে মাখাটা অন্নের সত্য ব্যবহার নয়।

আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখন সে অসত্য হয় এইজন্যেই সে অপবিত্র হয়ে ওঠে, কেননা কেবলমাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য নই। সেইজন্য যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই তখন আত্মা অসতী হয়ে ওঠে, সে আপনার শুচিতা হারায়। আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো ; তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়েই সত্য হয়। তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা। তার সেই স্বামীসম্বন্ধেই উপনিষদ বলেছেন : এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমো লোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। ইনিই তার পরমা গতি, ইনিই তার পরম সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আনন্দ।

কিন্তু যখন আমি সমস্ত ভোগকে আমার দিকেই টানতে থাকি, যখন অহোরাত্রি সমস্ত জীবন আমি এমন করে চলতে থাকি যেন আমার স্বামী নেই, আমার স্বামীর সংসারকে কেবলই বঞ্চনা করে নিজের অংশকেই সকলের চেয়ে বড়ো করতে চাই, তখনই আমার জীবন আগাগোড়া কলঙ্কে লিপ্ত হতে থাকে, তখন আমি অসতী। তখন আমি সত্যের ধন হরণ করে অসত্যের পূরণ করবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা চিরকালের মতো সফল হতেই পারে না ; যা-কিছু কেবল আমার দিকেই টানব তা নষ্ট হবেই, তার বৃহৎ সফলতা স্থায়ী সফলতা হতেই পারে না, তার জন্যে ভয় ভাবনা এবং শোকের অন্ত নেই। অসত্যের দ্বারা সত্যকে আঁকড়ে রাখা কোনোমতেই চলে না। ভোগের ফুলের মাঝখানে একটি কীট আছে, সেই কীট আমি, এই অসত্য

আমি— সে ফুলে ফল ধরে না। ভোগের তরণীর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে, সে ছিদ্র আমি, এই অসত্য আমি— এ তরণী অতৃপ্তিদুঃখের সমুদ্র কখনোই পার হতে পারে না, পথের মধ্যেই সে ডুবিয়ে দেয়।

সেইজন্যে শুচিতার সাধনা যাঁরা করেন ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। কেননা, এই স্বামিবিমুখ আমির উপকরণ যতই জোগাতে থাকি ততই সে উন্মত্ত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার অতৃপ্তিই তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করে তাকে প্রলয়ের পথে দৌড় করাতে থাকে। এইজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই উচ্চসাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ভোগকে খর্ব করা, সুখের ইচ্ছাকে পরিমিত করা। অর্থাৎ, এমন করে চলা যাতে নিজের দিকেই সমস্ত বোঝা বাড়তে বাড়তে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে সেই দিকটাতেই কাত হয়ে না পড়ি।

কিন্তু, আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ধনমান ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন বলেই যে আমার কাছে এমন মনোহর হয়ে উঠেছিলেন তা নয়। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত যেখানে তিনি সত্য সেইখানেই তাঁর মনটি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলনের দ্বারা সর্বদা তিনি সম্পূর্ণ হয়ে আছেন। একটি অলক্ষ্য উপাসনার দ্বারা ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাঁকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে, পরমপবিত্রস্বরূপ স্বামীকে তিনি তাঁর আত্মার মধ্যে বরণ করে নিয়েছেন, এইজন্য সুনির্মল শান্তিময় শুচিতায় তাঁর সমস্ত জীবন দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সত্য তাঁকে পবিত্র করে তুলেছে, বাইরের কোনো নিয়ম নয়।

আমরা যখন কেবল নিজেরটি নিয়ে থাকি তখন আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই ; তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে। তাই স্বার্থের জীবন ভোগের জীবন কেবলই মলিনতা দিয়ে আমাদের লিপ্ত করতে থাকে ; এই গ্লানি থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, তিনি আমাদের বাঁচান। আমার নিজের সেবা আমার পক্ষে বড়ো লজ্জা, আমার স্বামীর সেবাতেই আমার গৌরব। আমার নিজের সুখের দিকেই যখন আমি নেমে পড়ি তখন আমার বড়ো আমিকে একেবারেই অস্বীকার করি বলেই ভয়ানক ছোটো হয়ে যেতে থাকি ; সেই ছোটো আপনাকে ভরতে গিয়েই আপনাকে যথার্থ ভাবে হারাতে থাকি। মানুষ যে ছোটো নয়, মানুষ যে সেই বড়োর যোগে বড়ো। সেই তার বড়োর আনন্দেই সে আনন্দিত হোক ; সেই তার বড়োর সম্বন্ধেই সে জগতের সকলকে আপনার করে নিক। সেই তার বড়ো আপনাকে হারিয়ে সে বাঁচবে কেমন করে ? আর-কিছুতেই বাঁচতে পারবে না, ধন মান খ্যাতি কিছুতেই না। সত্য না হলে বাঁচব কী করে। আমি কি আপনাকে দিয়ে আপনাকে পূর্ণ করে তুলতে পারি। হে আমার পরম সত্য, আমি আমার অন্তরে বাহিরে কেবল নিজেকেই আশ্রয় করতে চাচ্ছি বলে কেবল অসত্যের মধ্যে অশুচি হয়ে ডুবছি— আমার মধ্যে হে মহান্, হে পবিত্র, তোমার প্রকাশ হোক, তা হলেই আমি চিরদিনের মতো রক্ষা পাব। হে প্রভু, পাহি মাং নিত্যং, পাহি মাং নিত্যম্।

আশ্বিন ১৩১৯

বিশেষত্ব ও বিশ্ব

আমার একটি পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র আমাকে বলছিলেন : কাল সন্ধ্যাবেলা যখন আমরা ঝড়বৃষ্টিতে মাঠে বেড়াচ্ছিলুম তখন আমার মনে কেবল এই একটা চিন্তা উঠছিল যে, প্রকৃতির মধ্যে এই-যে এতবড়ো একটা আন্দোলন চলছে আমাকে এ যেন দৃক্‌পাতও করছে না ; আমি যে একটা ব্যক্তি, ও তার কোনো একটা খবরও রাখছে না।

আমি তাঁকে বললুম : সেইজন্যেই তো বিশ্বপ্রকৃতির উপরে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এমন দৃঢ় করে নির্ভর করতে পারে। যে বিচারক কোনো বিশেষ লোকের উপর বিশেষ করে তাকায় না, তারই বিচারের উপর সর্বসাধারণে আস্থা রাখে।

এ উত্তরে আমার ছাত্রটি সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মনের ভাব এই যে, বিচারকের সঙ্গে তো আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ নয়, কাজের সম্বন্ধ। আমার মধ্যে যখন একটি বিশেষত্ব আছে, আমি যখন ব্যক্তিবিশেষ, তখন

স্বভাবতই সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ সম্বন্ধকে প্রার্থনা করে। যখন সেই বিশেষ সম্বন্ধকে পায় না তখন সে দুঃখ বোধ করে ; প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সেই দুঃখ আছে। সে আমাকে বিশেষ ব্যক্তি বলে বিশেষ ভাবে মানে না। তার কাছে আমরা সকলেই সমান।

আমি তাঁকে এই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম যে, মানুষের বিশেষত্ব তো একটি ঐকান্তিক পদার্থ নয়। মানুষের সত্তার সে একটা প্রান্তমাত্র। মানুষের একপ্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। যদি আপনার সৃষ্টিছাড়া নিজত্বের মধ্যে মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত তা হলে নিজেরই একটি স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত, সেখানে তার নিজের সুবিধা অনুসারে সূর্য উঠত কিংবা উঠত না। সেখানে তার যখন যেমন ইচ্ছা হত তখন তেমনি ঘটত ; কোনো বাধা হত না, সুতরাং কোনো দুঃখ থাকত না। সেখানে তার কাউকে জানবার দরকার হত না, কেননা সেখানে তার ইচ্ছামতই সমস্ত ঘটছে। এই মুহূর্তেই তার প্রয়োজন-অনুসারে যেটা পাখি, পরমুহূর্তেই সেটা তার প্রয়োজনমত তার মাথার পাগড়ি হতে পারে। কারণ, পাখি যদি চিরদিনই পাখি হয়, যদি তার পক্ষিত্বের কোনো নড়চড় হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কোনো-না-কোনো অবস্থায় আমাদের বিশেষ ইচ্ছাকে সে বাধা দেবেই ; সব সময়েই আমার বিশেষ ইচ্ছার পক্ষে পাখির দরকার হতেই পারে না। আমার মনে আছে একদিন বর্ষার সময় আমার মাস্তুল তোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নীচে দিয়ে যাচ্ছিলুম ; মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল। এ দিকে বর্ষানদীর প্রবল স্রোতের নৌকাকে বেগে ঠেলছে ; মাস্তুল মড়্‌মড়্‌ করে ভাঙবার উপক্রম করছে। লোহার সেতু যদি সেই সময় লোহার অটল ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট মাত্র উপরে ওঠে, কিংবা মাস্তুল যদি কেবল এক সেকেন্ড মাত্র তার কাঠের ধর্মের ব্যত্যয় ক'রে একটুমাত্র মাথা নিচু করে, কিংবা নদী যদি বলে 'ক্ষণকালের জন্যে আমার নদীত্বকে একটু খাটো করে দিই— এই বেচারার নৌকোখানা নিরাপদে বেরিয়ে চলে যাক', তা হলেই আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। কিন্তু, তা হবার জো নেই— লোহা সে লোহাই, কাঠ সে কাঠই, জলও সে জল ! এইজন্যে লোহা-কাঠ-জলকে আমার জানা চাই এবং তারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে আপনার ধর্মের কোনো ব্যতিক্রম করে না ব'লেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে জানতে পারে। নিজের যথেচ্ছাঘটিত জগতের মধ্যে সমস্ত বাধা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাস করি নে বলেই বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা ধর্মকর্ম যা কিছু মানুষের সাধনের ধন সমস্ত সম্ভবপর হয়েছে।

একটা কথা ভেবে দেখো, আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল যে ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কাকে চাচ্ছে ? যদি আমাদের নিজের মনের মধ্যেই তার তৃপ্তি থাকত তা হলে মনের মধ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে বানিয়ে তাকে স্থির করে রাখতে পারতুম। কিন্তু, ইচ্ছা তা চায় না। সে আপনার বাইরের সমস্ত-কিছুকে চায়। তা হলে আপনার বাইরে একটা সত্য পদার্থ কিছু থাকা চাই। যদি কিছু থাকে তবে তার একটা সত্য নিয়ম থাকা দরকার, নইলে তাকে থাকাই বলে না। যদি সেই নিয়ম থাকে তবে নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকে সে সব সময়ে খাতির করে চলতেই পারে না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত সেই বিশ্বের কাছে তাকে বাধা পেতেই হবে, আঘাত পেতেই হবে। নইলে সে বিশ্ব সত্য বিশ্ব হত না, সত্য বিশ্ব না হলে তাকে আনন্দও দিত না। ইচ্ছা যদি আপনার নিয়মেই আপনি বাঁচত, সত্যের সঙ্গে সর্বদা যদি তার যোগ ঘটবার দরকার না হত, তা হলে ইচ্ছা বলে পদার্থের কোনো অর্থই থাকত না ; তা হলে ইচ্ছাই হত না। সত্যকে চায় বলেই আমাদের ইচ্ছা। এমন-কি, আমাদের ইচ্ছা যখন অসম্ভবকে চায় তখনও তাকে সত্যরূপে পেতে চায়, অসম্ভব কল্পনার মধ্যে পেয়ে তার সুখ নেই।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিশেষত্বের পক্ষে এমন একটি বিশ্বনিয়মের প্রয়োজন যে নিয়ম সত্য, অর্থাৎ যে নিয়ম আমার বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে না।

বস্তুত আমি আমাকেই সার্থক করবার জন্যেই বিশ্বকে চাই। এই বিশ্ব যদি আমারই ইচ্ছাধীন একটা মায়া-পদার্থ হয় তা হলে আমাকেই ব্যর্থ করে। আমারই জ্ঞান সার্থক বিশ্বজ্ঞানে, আমারই শক্তি সার্থক বিশ্বশক্তিতে, আমারই প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে। তাই যখন দেখছি তখন এ কথা কেমন করে বলব 'বিশ্ব যদি

বিশ্বরূপে সত্য না হত— সে যদি আমারই বিশেষ ইচ্ছানুগত হয়ে স্বপ্নের মতো হত তা হলে ভালো হত' ? তা হলে সে যে আমারই পক্ষে অনর্থকর হত।

এইজন্যে আমরা দেখতে পাই— আমির মধ্যে যার আনন্দ প্রচুর সেই তার আমিকে বিশেষত্বের দিক থেকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। আপনার শক্তিতে যার আনন্দ সে কাজকে সংকীর্ণ করতে পারে না, সে বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে চায়। তা করতে গেলেই বিশ্বের নিয়মকে তার মানতে হয়। বস্তুত এমন অবস্থায় বিশ্বের নিয়মকে মানার যে দুঃখ সেই দুঃখ সম্পূর্ণ স্বীকার করাতেই তার আনন্দ। সে কখনোই দুর্বলভাবে কান্নার সুরে বলতে পারে না, 'বিশ্ব কেন আপনার নিয়মে আপনি এমন স্থির হয়ে আছে, সে কেন আমার অনুগত হচ্ছে না।' বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি স্থির হয়ে আছে বলেই মানুষ বিশ্বক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে। কবি যখন নিজের ভাবের আনন্দে ভোর হয়ে ওঠেন তখন তিনি সেই আনন্দকে বিশ্বের আনন্দ করতে চান। তা করতে গেলেই আর নিজের খেয়ালমত চলতে পারেন না। তখন তাঁকে এমন ভাষা আশ্রয় করতে হয় যা সকলের ভাষা, যা তাঁর খেয়ালমত একেবারে উলটোপালটা হয়ে চলে না। তাঁকে এমন ছন্দ মানতেই হয় যে ছন্দে সকলের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়, তিনি বলতে পারেন না 'আমার খুশি আমি ছন্দকে যেমন-তেমন করে চালাব'। ভাগ্যে এমন ভাষা আছে যা সকলের ভাষা, ভাগ্যে ছন্দের এমন নিয়ম আছে যাতে সকলের কানে মিষ্ট লাগে, সেইজন্যেই কবির বিশেষ আনন্দ আপনাকে বিশ্বের আনন্দ করে তুলতে পারে। এই বিশ্বের ভাষা বিশ্বের নিয়মকে মানতে গেলে দুঃখ আছে, কেননা সে তোমাকে খাতির করে চলে না ; কিন্তু এই দুঃখকে কবি আনন্দে স্বীকার করে। সৌন্দর্যের যে নিয়ম বিশ্বনিয়ম তাকে সে নিজের রচনার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে চায় না ; একটুও শৈথিল্য তার পক্ষে অসহ্য। কবি যতই বড়ো হবে, অর্থাৎ তার বিশেষত্ব যতই মহৎ হবে, ততই বিশ্বনিয়মের সমস্ত শাসন সে স্বীকার করবে ; কারণ, এই বিশ্বকে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিশেষত্ব সার্থক হয়ে ওঠে।

মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে এইখানে ; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড়ো রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। বিশ্বের সঙ্গে পশুর যোগ নিজের খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধে ; এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই পশুকে আপনার বাইরে যেতে হয়, এই দুঃখের ভিতর দিয়েই সে সুখ লাভ করে। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই— মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানা রকম করে নেয় তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানা রকম করে দেয়। তার সৌন্দর্যবোধ তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায় ; তা না করতে পেলেই সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব। এ কথা যখন সত্য তখন তুমি যদি বল 'বিশ্বপ্রকৃতি আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে মেনে চলে না বলে আমার দুঃখবোধ হচ্ছে' তখন তোমাকে বুঝে দেখতে হবে— মেনে চলে না বলেই তোমার আনন্দ। বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে প্রতিষ্ঠা। দুঃখের একান্ত অভাব যদি ঘটত, অর্থাৎ যদি কোথাও কোনো নিয়ম না থাকত, বাধা না থাকত, কেবল আমার ইচ্ছাই থাকত, তা হলে আমার ইচ্ছাও থাকত না ; সে অবস্থায় কিছু থাকা না-থাকা একেবারে সমান। অতএব, তুমি যখন মাঠে বেড়াচ্ছিলে তখন ঝড়বৃষ্টি যে তোমাকে কিছুমাত্র মানে নি এ কথাকে যদি বড়ো করে দেখি তা হলে এর মধ্যে কোনো ক্ষোভের কারণ দেখি নে। তা হলে এইটেই দেখতে পাই : ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁরই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য তাপ দিচ্ছে, এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হচ্ছে। তারা সহস্রের ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত নয়, একের শাসনে চালিত। এইজন্যেই তারা সত্য, তারা সুন্দর ; এইজন্যেই তাদের মধ্যেই আমার মঙ্গল ; এইজন্যেই তাদের সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব ; এইজন্যেই তাদের কাছ থেকে আমি পাই এবং তাদের মধ্যে আমি আপনাকে দিতে পারি।

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

১৫

পিতার বোধ

যা প্রাণের জিনিস তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার যে কত বড়ো লোকসান সে কথা তো প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু, আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে তো ফাঁকি দিয়ে সারি নে। অন্নজলকে তো সত্যকারই অন্নজলের মতো ব্যবহার করে থাকি। কেবল আমার ভিতরকার এই-যে মানুষটি ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না, সেই আমার অন্তরতম চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি ; তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়ো ; এইজন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাত হচ্ছে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই-না কেন সে সেটা পায়, আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেইজন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌', শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেননা, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে, একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে, আর-একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই তা হলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন-কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনোই সম্পূর্ণ দান নয় ; সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে, কিন্তু সে দান ধর্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা তো নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করছি ; সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করছি ; সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি-দান যখনই বন্ধ হয়ে যাবে তখনই প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এইরকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারছি ততই দান করছি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণে দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান তো আমাদের চলছেই ; কিন্তু কী দান করছি এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে তো আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিস কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা কিছু পাচ্ছি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করছি ? সে তো সমস্তই দেখছি বাইরেই এসে জমছে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে তো এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু নিজেকে এই-যে আমরা দান করছি, এই-যে আমার চেষ্টা, এই-যে আমার সমস্তই, এ কি পূর্ণ দান হচ্ছে। শ্রদ্ধার দান হচ্ছে ? ধর্মের দান হচ্ছে ? এতে করে আমরা বাড়াচ্ছি, কিন্তু বড়ো হতে পারছি কি। এতে করে আমরা সুখ পাচ্ছি, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি নে ; এতে করে তো আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারছে না। মানুষ বললে যতখানি বোঝায় ততখানি তো ব্যক্ত হয়ে উঠছে না।

কেন এমন হচ্ছে। কেননা, এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনছি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার

করছি যে, আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলছি।

নিজেকে যে লোক কেবলই ধনমান জোগাচ্ছে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করছে ; সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলই অপমান করছে ; তাকে সে কিছুই দিচ্ছে না। কিছু দেবার যোগ্যই মনে করছে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্ছে না— এবং 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করছে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে তো আমরা বিনাশ করতে পারি নে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে দিচ্ছি ; তার দুর্গতি তো কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে তো আমাদের বাঁচায় না, আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে তো আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন তো বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তখন তো বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারি নে ; আর অকস্মাৎ বজ্রের মতো মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক তো কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারি নে। যখন এক দিকে ভার চাপতে চাপতে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির ঠেকাঠেকি হতে থাকে, অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্যসামন্ত কাকে ডাকব যে তার উপরে এক ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে। মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে, কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে, কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মতো বেঁচে গেলে ?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে ? আমরা এতদিন ধরে তাকে কোন্ ভরসা দিয়ে এলুম ? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড়লণ্ঠন খাটিয়ে দিলুম, কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল, সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে ধুলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কী বলে তাকে আশ্বাস দিলুম।

তার সেই মর্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বড়োই ব্যাঘাত করতে লাগল, আমাদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে, তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাকে বলে এসেছি— ভয় নেই তোমার, আমি আছি। মনে করেছি এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড়ো অভয়মন্ত্র যে 'আমি আছি'। নিজের সমস্ত ধনসম্পদ মানমর্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মতো গেঁথে ফেলে তার হাতে দিয়ে বলেছি— এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বার বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলই একমনে জপ করতে থাকো, 'আমি আমি আমি। আমি সত্য, আমি বড়ো, আমি প্রিয়।'

তাই নিয়ে সে জপছে বটে : আমি আমি আমি। কিন্তু, তার চোখ দিয়ে জল পড়া আর কিছুতেই থামছে না। তার ভিতরকার এ কোন্ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্ছে : না না না, নয় নয় নয়। কোন্ তাপসিনীর করুণবীণায় এমন উদাস-করা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুলছে : ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হল রে, সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রিবেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল ; মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।

ওরে মত্ত, কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে ? সে হচ্ছে চিরদিনের সেই সত্য বাণী : পিতা নোঽসি, পিতা তুমিই আছ।

তুমি আছ, পিতা, তুমি আছ, আমাদের পিতা তুমি আছ— এই বাণীতেই সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর, ওটা কী ভয়ানক মিথ্যা, ঐ-যে 'আমি আছি' ! কই আছ, তুমি আছ কোথায় ! তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনাগুলাকে আশ্রয় করে বলছ 'আমি আছি' । যে বুদ্‌বুদটি যখনই ফেটে যাচ্ছে তাতে তখনই তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে । সংসারে দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগছে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্ছে । তুমি আছ কিসের উপরে । তুমি কে । অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বলছে 'চাই' তখন তুমি অহংকার করে তাকে গিয়ে বলছ : আমি আছি, তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুশি থাকো । এ তোমার কেমন দান । তোমার প্রকাণ্ড বোঝা বইবে কে । এ যে বিষম ভার । এ যে কেবলই বস্তুর পরে বস্তু, কেবলই ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ । এ তো তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা । তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলই অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও । তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে যেতে থাক্ ! যে মানুষটি যাত্রী, যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন । এই-সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকবে, সে সময় তার কোথায় । এইজন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না । তুমি কি সেই নির্ভর নাকি । তবে কী ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপছ 'আমি আছি' !

পিতা নোঽসি : পিতা, তুমি আছ, তুমি আছ— এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র । তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ । 'সত্যং' এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে : পিতা নোঽসি, পিতা তুমি আছ । যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা ।

কিন্তু, তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে । তুমি আছ, এ তো শুধু একটা মন্ত্র নয় । তুমি আছ, এটা তো শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয় । তুমি আছ, এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম, কেনই বা কিছুদিনের জন্য নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম— শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল !

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি । জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতিদিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্যন্ত জমা করে দিয়েছি । আমি-বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড়ো দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারি নে ।

সেইজন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি : তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ, এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও । পিতা নো বোধি : পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক্ ; আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্বশরীরে প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শচেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক, পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত করে দিক । পিতা নো বোধি : আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক, আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক । আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই । এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক্ ; নিকট হতে দূরে, দূর হতে দূরান্তরে, আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে প্রসারিত হতে থাক্— প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায় ।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি 'পিতা নো বোধি', কিন্তু একবারও মনেও আনি নি কত বড়ো চাওয়া চাচ্ছি ; মনেও আনি নি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড়ো সাধনা করতে হবে । কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের ক্ষালন, কত সংস্কারের আবরণ-মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থি-ছেদন !

জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে। নিজের নিষ্ঠুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে না পারলে সেই অনন্ত করুণার বোধকে গ্রহণ করব কেমন করে। সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্যে আনন্দে নির্মলতায় ভরে রয়েছে, সমস্ত ঘন হয়ে ভরে রয়েছে— সেই তো আমার পিতা, সর্বত্র আমার পিতা। পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি— এই মন্ত্রের অক্ষরই সমস্ত আকাশে, এই মন্ত্রের ধ্বনিই জ্যোতির্ময় সুরসপ্তকের বিশ্বসংগীত। পিতা তুমি আছ, এই মন্ত্রই কত অসংখ্য রূপ ধরে লোকলোকান্তরে সমস্ত জীবকে কোলে করে নিয়ে সুখদুঃখের অবিরাম বৈচিত্র্যে সৃষ্টিকে প্রাণপরিপূর্ণ করে রয়েছে। অসীম চেতনজগতের মধ্যে নিয়ত উদ্‌বেলিত তোমার যে পিতার আনন্দ, যে আনন্দে তুমি আপনাকেই আপন সন্তানের মধ্যে নিরীক্ষণ করে লীলা করছ, যে আনন্দে তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে ছোটো হয়ে নত হয়ে আসছ এবং তোমার সন্তানকে তোমার মধ্যে বড়ো করে তুলে নিচ্ছ, সেই তোমার অপরিসীম পিতার আনন্দকেই সকলের চেয়ে সত্য ক'রে, আপনার সকলের চেয়ে পরম সম্পদ করে বোধ করতে চাচ্ছে আমার অন্তরাত্মা— তবু সেই জায়গায় আমি কেবলই তার কাছে এনে দিচ্ছি আমার অহংকে। সেই অহংকে কিছুতেই আমি তাড়াতে পারছি নে, তার কাছে আমার নিজের জোর আর কিছুতেই খাটে না, অনেক দিন হল তার হাতেই আমার সমস্ত কেল্লা আমি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আমার সমস্ত অস্ত্র সেই নিয়েছে, আমার সমস্ত ধনের সেই অধিকারী। সেইজন্যেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা— পিতা নো বোধি। পিতা, এই বোধ তুমিই আমার মনে জাগাও। এই বোধটিকে একেবারে বাধাহীন করে লাভ করি যে, আমার অস্তিত্ব এ কেবলমাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব, আমি তো আর কারও নই, আর কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটিমাত্র সত্য ; এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে ঘিরে অন্তরে বাহিরে যা-কিছু আছে এ-সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়— এই জল স্থল আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখদুঃখের সংসারলীলা, এ-সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরছে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা পিতা বলে সাড়া দিয়ে উঠুক। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে যাক, আমার দিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে। তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল ; তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না— পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তোমার এই এতবড়ো আকাশ-ভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্ছি নে, গ্রহণ করতেই পারছি নে কিসের জন্যে। ঐ এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে 'আমি'! একবার একটুখানি থাম্‌! একবার আমার জীবনের সব চেয়ে সত্য বলাটা বলতে দে, একবার সন্তানজন্মের চরম ডাকটা ডাকতে দে : পিতা নোঽসি! পিতা পিতা পিতা, তুমি তুমি তুমি, কেবল এই কথাটা— অন্ধকারে আলোতে নির্ভয়ে গলা খুলে কেবল : আছ, আছ, আছ। 'আমি' তাঁর সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত করে জানছ ; তেমনি করে সন্তানকেও জানতে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক ; তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেছ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ করো।

নমস্তেঽস্তু, তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুনতে পাই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে : নমোনমঃ। লোকে লোকান্তরে : নমোনমঃ। সুমধুর সুগম্ভীর নমোনমঃ। তখন দেখতে পাই নমস্কারে নমস্কারে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র একটিমাত্র জায়গায় তাদের জ্যোতির্ময় ললাটকে মিলিত করেছে। সমস্ত বিশ্বের এই আশ্চর্য সুন্দর সামঞ্জস্য— যে সামঞ্জস্য কোথাও কিছুমাত্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা সৃষ্টির বিচিত্র ছন্দকে একটুও আঘাত করছে না, আপনার অণুতে পরমাণুতে অনন্তের আনন্দকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে। এই তো সেই নমস্কারের সংগীত, উর্ধ্বে অধোতে দিকে দিগন্তরে : নমোনমঃ। এই সমস্ত বিশ্বের নমস্কারের সঙ্গে আমার চিত্ত যখন তার নমস্কারটিকেও এক করে দেয়, সে যখন আর পৃথক থাকতে পারে না, তখন সে চিরকালের মতো ধন্য হয় ; তখনই সে বুঝতে পারে, আমি বেঁচে গেলুম, আমি রক্ষা পেলুম। তখনই জগতের সমস্তের মধ্যেই সে আপনার পিতাকে পেলে ; কোনো জায়গায় তার আর কোনো ভয় রইল না

পিতা, নমস্তেঽস্তু। তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই পারাই চরম পারা— এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। যেন নমস্কার করতে পারি। সমস্ত যাত্রার অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, সেই নমস্কারটিতেই তার সমস্ত পথযাত্রা একেবারে নিঃশেষে সার্থক, হে পিতা, তেমনি করে একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার মধ্যে আপনাকে যেন শেষ করে দিতে পারি। এই-যে আমার বাহিরের মানুষটা, এই আমার সংসারের মানুষটা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানকার অতিক্ষুদ্র এই মানুষটা এ কেবল মাথাটাকে সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। সকলের চেয়ে আমি তফাত থাকব, সকলের চেয়ে আমি বড়ো হব, এতেই তার সকলের চেয়ে সুখ। তার একমাত্র কারণ এই, আপনার মধ্যে তার আপনার স্থিতি নেই। বাইরের বিষয়ের উপরেই তার স্থিতি। যত জিনিস বাড়ে ততই সে বাড়ে ; নিজের মধ্যে সে শূন্য ; সেখানে তার কোনো সম্পদ নেই এইজন্য বাইরের ধন যত জমে ততই সে ধনী হয়। জিনিসপত্র নিয়েই যাকে বড়ো হতে হয় সে তো সকলের সঙ্গে মিলতে পারে না। জিনিসপত্র তো জ্ঞান নয়, প্রেম নয় ; সকলকে দান করার দ্বারাই তো সে আরো বাড়ে না, ভাগ করার দ্বারাই তো সে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠে না। তার থেকে যা যায় তা যায়, সে তো আরো দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে না। তার যা আমার তা আমার, যা অন্যের তা অন্যেরই— এইজন্যে যে মানুষটা উপকরণ নিয়েই বড়ো হয় সকলের থেকে তফাত হয়েই সে বড়ো হয়। আপনার সম্পদকে সকলের সঙ্গে মেলাতে গেলেই তার ক্ষতি হতে থাকে। এইজন্যে যতই সে বড়ো হয় ততই তার আমিটাই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে, ততই চারি দিকের সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং তার সমস্ত সুখই অহংকারের রূপ ধারণ করে অন্য সকলকে অবনত করতে চায়। এমনি করে বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের দ্বারাই সে যে দুঃসহ তাপের সৃষ্টি করে সেইটেকেই সে আপনার প্রতাপ বলে গণ্য করে।

কিন্তু, আমার অন্তরের নিত্য মানুষটি তো দিনরাত্রি মাথা উঁচু করে বেড়াতে চায় নি, সে নমস্কার করতেই চেয়েছিল। তার সমস্ত আনন্দ নমস্কারের দ্বারা বিশ্বজগতে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েছে, নমস্কারের দ্বারা তার আত্মসমর্পণ পরিপূর্ণ হতে চায়। নমস্কারের দ্বারা সে আপনাকে সেই জায়গাতেই প্রসারিত করে যেখানে তুমি তোমার পা রেখেছ, যেখানে তোমার চরণাশ্রয় করে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এক জায়গায় এসে মিলেছে, যেখানে দরিদ্রকে ধনী দ্বারের বাইরে দাঁড় করাতে পারে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়ে রেখে দিতে পারে না। সেই তো সকলের চেয়ে নীচের জায়গা, সেই তো সকলের চেয়ে প্রশস্ত জায়গা, সেই তোমার অনন্তপ্রসারিত পাদপীঠ। আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নমস্কারের দ্বারা সেই সর্বজনভোগ্য মহাপুণ্যস্থানের অধিকারটি পেতে ব্যাকুল হয়ে আছে। যে স্থানটি নিয়ে রাজা তার কাছ থেকে খাজনা দাবি করবে না, পাশের মানুষ তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসবে না, সত্য নমস্কারটি যে স্থানের একমাত্র সত্য দলিল— সেই সম্পত্তিই আমার অন্তরাত্মার পৈতৃক সম্পত্তি।

জল যখন তাপের দ্বারা হালকা হয়ে যায় তখনই সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে। তখনই সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক করে ফেলে। তখনই সে ব্যর্থ হয়ে স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়, তখনই সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্মই হচ্ছে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা, সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়— তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্পরাশি পৃথক হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নীচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অমনি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না ; নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্বজনের নিম্নক্ষেত্রে সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনই জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনই মিলনের স্রোত চার দিকে ছুটে বইতে থাকে, বর্ষণের সংগীতে দশ দিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনই আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে, আপনার ধর্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে সমর্পণ করতে

চাচ্ছে। এই তার যথার্থ ধর্ম। সে অহংকারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্ছে ; পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্মটিকে যে পর্যন্ত সে না পাচ্ছে সেই পর্যন্তই তার যত-কিছু দুঃখ যত-কিছু অপমান। এইজন্যেই সে প্রতিদিন জোড়হাত করে বলছে নমস্তেঽস্তু— তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

তোমাকে নমস্কার করা, এ কথাটি সহজ কথা নয়। এ তো কেবল অভ্যস্তভাবে মাথা নিচু করা নয়। পিতা নোঽসি, তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, এই কথাটিকে তো সহজে বলতে পারলুম না। যখন ভেবে দেখি এই কথাটি বলবার পথ প্রতিদিনই সকল ব্যবহারেই কেমন করে অবরুদ্ধ করে ফেলছি তখন মনে ভয় হয়, মনে করি সন্তানের নমস্কার বুঝি এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর সম্পূর্ণ হতে পারল না, মানুষের জীবনে যে রস সকল রসের সার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধুরতম রসটি হৃদয়ের মধ্যে বুঝি কণামাত্রও জায়গা পেল না। কেমন করেই বা পাবে। শুষ্ক যে, সে আপনার শুষ্কতা নিয়েই গর্ব করে ; ক্ষুদ্র যে, সে যে আপনার ক্ষুদ্রতা নিয়েই উদ্ধত হয়ে ওঠে। স্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করতে গেলে সে যে কেবলই মনে করে আমি আমার আত্মাকে খর্ব করলুম। সে যে নমস্কার করতে চাচ্ছেই না। তার এমনই দুর্দশা যে উপাসনার সময় যখন সে তোমার কাছে আসে তখনও সে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। সংসারক্ষেত্রে যেখানে সমস্তই আত্মপর ও উচ্চ-নীচের দ্বারাই আমরা সীমাচিহ্নিত করে রেখেছি সেখানে সর্বলোকপিতা যে তুমি তোমাকে নমস্কার করবার তো জায়গাই পাই নে, তোমাকে সত্যকার নমস্কার করতে গেলে সকল দিকেই নানা দেয়ালেই মাথা ঠেকে যায়, কিন্তু তোমার এই পূজার ক্ষেত্রে যেখানে কেবল ক্ষণকালের জন্যেই আমরা পরিচিত-অপরিচিত পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-দরিদ্র তোমারই নামে একত্র সমবেত হই সেখানেও যে মুহূর্তেই আমরা মুখে উচ্চারণ করছি 'পিতা নোঽসি'— তুমি আমাদের সকলের পিতা, তুমিই আছ, তুমিই সত্য— সেই মুহূর্তেই আমরা মনে মনে লোকের জাতি বিচার করছি, বিদ্যা বিচার করছি, সম্প্রদায় বিচার করছি। যখনই বলছি নমস্তেঽস্তু তখনই নমস্কারকে অন্তরে কলুষিত করছি, সকলের পিতা বলে যে অসংকুচিত নমস্কার তোমাকেই দিতে এসেছি তার অধিকাংশই তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে আমার সমাজটারই পায়ের কাছে স্থাপন করছি। সংসারে আমার অহং নিজের জোরে স্পষ্ট করেই প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। সেখানে তার নিজের পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে নিজের কোনো সংশয় বা লজ্জা নেই। এখানে তোমার পূজার ক্ষেত্রে তার অনধিকারের বাধাকে এড়াবার জন্যে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে আসে ; কিন্তু এখানে তার সকলের চেয়ে ভয়ংকর স্পর্ধা এই যে, ছদ্মবেশে তোমারই সে অংশী হতে চায়, তোমার নামের সঙ্গে সে নিজের নামকে জড়িত করে এবং তোমার পূজার মধ্যেও সে নিজের অপবিত্র হস্তকে প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমনি করে কি চিরদিনই আমরা তোমার নমস্কারকেও সাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যেই ঠেলে রেখে দেব। কিন্তু, কেন। তার প্রয়োজন কী আছে। তোমাকে নমস্কার তো আমার টাকা নয়, কড়ি নয়, ঘর নয়, বাড়ি নয়। তোমাকে নমস্কার করে আমার বাইরের মানুষটি তো তার থলির মধ্যে কিছুই ভরতে পারে না। রাজাকে নমস্কার করলে তার লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে তার সুবিধা আছে, প্রবলকে নমস্কার করলে তার সাংসারিক অনেক আপদ এড়ায় ; কিন্তু সে যদি দলের দিকে, সমাজের দিকে, অনিমেষ নেত্র মেলেই থাকে তবে তোমাকে নমস্কার করার কথা উচ্চারণ করবারই বা তার লেশমাত্র প্রয়োজন কী আছে।

প্রয়োজন যে একমাত্র তারই, যে আমার ভিতরের মানুষ— সে যে নিত্য মানুষ, সে তো সংসারের মানুষ নয়, সে তো সমাজের কাছ থেকে ছোটো বড়ো কোনো উপাধি গ্রহণ ক'রে সেই চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে না। তার চরম প্রয়োজন সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করে জানা ; তা হলেই সে আপনাকে সত্য জানতে পারে ; সেই সত্য জানা থেকে বঞ্চিত হলেই সে মুহ্যমান হয়ে অপবিত্র হয়ে জগতে বাস করে। আপনাকে সত্যরূপে জানবার জন্যেই, সমাজসংস্কারের সংকীর্ণ জালের মধ্যে নিজেকে নিত্যকাল জড়িত করে রাখবার দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যেই সে ডাকছে তার পিতাকে, সে ডাকছে নিখিল মানুষের

পিতাকে ; সেই তার পিতার বোধের মধ্যেই তার আপনার বোধ সত্য হবে, তার বিশ্বের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ হবে। এ ডাক সমাজের ডাক নয়, সম্প্রদায়ের ডাক নয়, এ ডাক অন্তরাত্মার ডাক। এ ডাক কুলশীলের ডাক নয়, মানসম্ভ্রমের ডাক নয়, এ ডাক সন্তানের ডাক। এই একটিমাত্র ডাকেই সকল সন্তানের কণ্ঠ এক সুরে মেলে, এই 'পিতা নোহসি'। তাই এ ডাকের সঙ্গে কোনো অহংকার কোনো সংস্কারকে মেলাতে গেলেই এই পরম সংগীতকে এক মুহূর্তেই বেসুরো করা হবে ; তাতে আত্মা পীড়িত হবে এবং, হে পরমাত্মন্, তাতে তোমাকেই বেদনা দেওয়া হবে, যে তুমি সকল সন্তানের ব্যথার ব্যথী।

তাই তোমার কাছে অন্তরের এই অন্তরতম প্রার্থনা, যেন নত হই, নত হই। সেই নতি দীনতার নতি নয়, সে যে পরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। তোমার কাছে সেই একান্ত নমস্কার আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক, সত্য হোক ; অহং শান্ত হোক, অহংকার ক্ষয় হোক, ভেদবুদ্ধি দূর হোক, পিতার বোধ পূর্ণ হোক এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক। নমস্তেঽস্তু।—

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
　　একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
ঘন শ্রাবণমেঘের মতো　রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন থাক্ পড়ে থাক্ তব ভবনদ্বারে
　　একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
নানা সুরের আকুল ধারা　মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
　　একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী　তেমনি সারা দিবসরাত্রি
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মরণপরপারে
　　একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।

প্রাতঃকাল। ১১ মাঘ ১৩১৮

ফাল্গুন ১৩২০

সৃষ্টির অধিকার

দিন তো যাবেই ; এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়েছে। কিন্তু, সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে, যেটা হবার সেটা হয় নি। দিন তো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলই বলেছে : হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনো তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কিসের মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়! পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে-সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোনো বেদনা নেই। এখনো যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি, এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটি রয়েছে— হয় নি, যা হবার তা হয় নি। কী হয় নি। আমি যা হব বলে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব, এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না ব'লেই এই বেদনা জেগে উঠছে যে হয় নি, হয় নি, দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না, মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে আমি হব। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী-তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু ভগবান তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন

না ; তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেইজন্যে তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাকে উলঙ্গ ক'রে দুর্বল করে পাঠিয়েছেন। আর-সকলেরই জীবনরক্ষার জন্যে যে-সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন ; বাঘকে তীক্ষ্ণ নখদন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু, এ কী তাঁর আশ্চর্য লীলা যে, মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্বল অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন ! কারণ, এরই ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমা শক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেইখানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে-যে একটি পবমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর-সব তৈরি, চন্দ্রসূর্য তরুলতা সমস্তই তৈরি ; কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন সেই-যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু, আমরা কি তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব। তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন তারই মধ্যে আমরা আবৃত থাকব, এ হলে আর কী হল। এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই। এই পৃথিবীর ভূমি কী নিশ্চল অটল, সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত ! এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই ; সমস্তই তাঁর অটল শাসনে তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন ; মানুষকে দেন নি, তার ভিতরে রঙের একটি বাটি দিয়ে বলেছেন, 'তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে।' তিনি বলেছেন, 'তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই-সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে সুন্দর করে আশ্চর্য করে তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না।' আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না।

কী নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্ছে। প্রতিদিনের আবর্তনে কী জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। আজ যা হচ্ছে কালও তাই হচ্ছে, এক দিনের পর কেবল আর-এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলছে : ঘানিতে জোতা হয়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোনো নতুন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। এই সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্মে আমরা কী পাচ্ছি। আমরা কী জড়ো করছি। এই-সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এমনি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে। অভ্যাস, অভ্যাস— তারই জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি ; তারই উপরে যে আমাদের একদিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলই মলিনতা জমা হচ্ছে ; অভ্যাসকে কেবলই বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে, এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সংকীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, বিশ্বভুবনের আশ্চর্য লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখবার বেলা দেখি উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবনযন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আসতে পথ পায় না ; ঐ-সব জিনিসগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আসবেন বলে বলে দিয়েছেন, 'তুমি তোমার আসনখানি তৈরি করে দাও, আমি সেই আসনে বসব, তোমার ঘরে গিয়ে বসব।' অথচ আমরা যা-কিছু আয়োজন করছি সে-সব নিজের জন্যে, তাঁকে বাদ দিয়ে বসেছি। জগৎ জুড়ে শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো-কলঙ্কে-মলিন ধূলিতে-আচ্ছন্ন সেই একটুমাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমার টাকা রাখব, আসবাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ির ভিত কাটব। সেখানে তাঁকে বলি, 'তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পারব না, তোমাকে ওখান থেকে নির্বাসিত করে দিলুম।' তাই এই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষেরই কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হল। আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আর-সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না।' তিনি বলেছেন, 'তোমরা কি আমাকে ডাকবে না। তোমরা যা ভোগ করছ আমাকে

তার একটু অংশ দেবে না ?' যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়, তারা অনাদর সইতে পারে না। আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই বলেছি, 'তোমাকে দিতে পারব না।' দিনের পর দিন কি এই কথা বলে আমরা সব ব্যর্থ করি নি। একদিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে, বলতে হবে, 'আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তি জীবনযৌবন তোমারই জন্যে।' প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি আজ একদিন অন্তত বলি, 'তোমারই জন্য আমার এই জীবন হে স্বামী। তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ করলেম না তোমাকেই ব্যর্থ করলেম ? তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে, তুমি বড়ো, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকবে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদের পালন করতেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।'

সেইজন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে বলে এক-একটা দিনকে মানুষ পৃথক করে রাখে। সে বলে, রোজ তো ঘানি টেনেছি, আর পারি নে ; একটা দিন অন্তত বুঝি যে আনন্দলোকে অমৃতলোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন, সেই দিন মানুষের আপনার সত্যকে জানবার দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে কত অসত্য করে দেখেছি, কত অসত্য করে জেনেছি ; একদিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা, পিতা নোঽসি, এতবড়ো কথা একদিন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধনমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির কাছে প্রণাম নয়, প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধুলিজঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে ডাকব : পিতা নোঽসি। তুমি আমার পিতা। যেদিন তাঁকে ডাকব, তাঁকে ঘরে নিয়ে আসব, সেদিন সব ধনমান সার্থক হবে, সেদিন কোনো অভাবই আর অভাব থাকবে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধুলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে ; কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে। সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচারবিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে। তার ঘর-ভরা শিশু তার মা-বাপ ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-প্রতিবেশী— এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে-যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে। না, তিনি বলেছেন, 'তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব, আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এতবড়ো একটা চরমসৃষ্টি হতে পারে নি।' সর্বশক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এইজন্যে যে তিনি যুগ যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি। আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্যশ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে। তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনো বাকি। বাষ্প-আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটে নি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প-আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। তাঁর সেই রচনাকার্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন ; কিন্তু আমরা কেবল খাব, পরব, সঞ্চয় করব, এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল তো ভাঙবে ; মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, 'এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলেম।' অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেছি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য

ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম, অভাবকে তো কিছু পূরণ করেছি, কিছু অজ্ঞান দূর করেছি। এই কথাটি তো বলে যেতে হবে। এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাকব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না 'কিছু দিতে পেরেছি'।

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুশি হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, 'আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব।' শিল্পী কী করে। সে কেন শিল্প রচনা করে। বিধাতা বলেছেন, 'আমি এই-যে উৎসবের লণ্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কি আল্‌পনা আঁকবে না। আমার রোশনচৌকি তো বাজছেই, তোমার তম্বুরা, কি একতারাই নাহয়, তুমি বাজাবে না?' সে বললে, 'হাঁ, বাজাব বৈকি।' গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমন মিলল অমনি ঠিক গানটি হল। আমি গান সৃষ্টি করব বলে সেই গান তিনি শোনবার জন্যে আপনি এসেছেন। তিনি খুশি হয়েছেন; মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েছেন, প্রেম দিয়েছেন, তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে— এই দেখে তিনি খুশি। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেছে। সে যে তাঁরই সভায় তার শিল্প দেখাচ্ছে, তার গান শোনাচ্ছে। তিনি বললেন, 'বাঃ, এ যে দেখছি আমার সুর শিখেছে, তাতে আবার আধো আধো বাণী জুড়ে দিয়েছে— সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধখানা ফোটে না।' তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েছি শুনে তিনি বললেন, 'খুশি হয়েছি।' এই-যে তাঁর মুখের খুশি— না দেখতে পেলে সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে সে কিছুই নয়। কিন্তু, শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য নিল, কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরই জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কানায় কানায় পূর্ণ করে যেদিন নিবেদন করতে পারব সেদিন জীবন ধন্য হবে। তার চেয়ে বড়ো নিবেদন আর কী আছে। আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবেদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি; কৃপণতা করে বলি, 'নিজের জন্য সবই নেব কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উদ্‌বৃত্তমাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।' তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভরে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলছি আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন— 'তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে, কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম— তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব ভুলে গেলুম— তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না।' আজ এই কথা বলব, 'আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসে একে পূর্ণ করো। তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কী, আমার ধুলোর মধ্যে ভিক্ষুকের মতো পড়ে থাকা যে ভালো।' হায় হায়, ধুলোবালি নিয়ে বাস্তবিকই এই-যে খেলা করছি এই কি আমার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কাজের জন্যেই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল। মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি। খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই পড়ে যায়। কিন্তু, তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে পড়ে যেতে পারে। খেলাঘর কত যত্ন করেই গড়ে তুলি; যেদিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সেদিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। সেদিন কেঁদে উঠে আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকবার চেষ্টা করি— এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ একদিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি— হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর, তোমাকে একদিনের জন্যেই ডাকলুম! এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি, দেখা মেলে নি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলেম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটিও যদি না দাও, তবু এ কথা বলতে পারব না 'ওগো আমি পারলুম না'। আমি ক্লান্ত, অক্ষম, দুর্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল— এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলেম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড়ো দুঃখ পেয়েছি এ কথা

বলবার অধিকার দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি, আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত, এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্‌গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃতলোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে তেমনি আমার জীবনকে করবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রাতঃকাল। ১১ মাঘ ১৩২০

ফাল্গুন ১৩২০

ছোটো ও বড়ো

এগারোই মাঘ সায়ংকালে লেখক-কর্তৃক পঠিত উপদেশ

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালোবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উদ্যম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মতো সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে, এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মতো আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করছে, অলসচিত্তে উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে, তবু সমস্ত মত্ততা অহংকার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে যে 'আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়'।

সেইজন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসারবুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বললেন 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'— এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব-কিছু হতেও প্রিয়— তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এইজন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্‌ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতি মুহূর্তকে মধুময় করে বিকশিত করছেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে তুলছেন, তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বললুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা সমস্ত দ্বেষবিদ্বেষ ভাগবিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটছে ; কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই-যে অনন্তের বিশ্বাস, এই-যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মতো রয়েছে, বারংবার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত ; কিন্তু এ যে মর্মের জিনিস, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই তো ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক-একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সংগীত বেজে উঠত সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠছে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেননা বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে জুড়ে ব'সে আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, তখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য জোগায় না, তখন খররৌদ্রের দিনই শুভদিন ; তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে সে মরবে তখনই যখন আমরা মরব। যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে ; মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই-যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃতলোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সংগীত বেজে উঠছে, আজ আমাদের উৎসব সেইখানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র। এই-যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে, এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়।

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করছে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে ; সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করছে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করছে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করছে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব ; এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েই তো আছে। বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে ; সেইদিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেইদিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরার ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল, সেইজন্যেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি। আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে, জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্মজাল বুনে বুনে চলা নয়, তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য পরমকল্যাণ পূজার অঞ্জলির মতো ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠছে ?

না, সে কথা তো আমরা সকলে মানি নে। আমাদের জীবনের মর্মনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনো হয়তো আসে নি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে, এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগে নি। কিন্তু তবুও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্যমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা, এ তো আমাদের কারও একলার সামগ্রী নয় ; আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসংগীত উঠবে সে তো কারও একলা কণ্ঠের বাণী নয় ; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডেকেছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে আমরা সেই সকল মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি— কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে যে তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকতে শিখেছি। মানুষের এই একটি আশ্চর্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মতো আহার-বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারই মধ্যেই 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্', আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি— সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি, তাই আনন্দ করছি, তা নয়। দ্বারে মৃত্যু

এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য ; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা ; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছে : বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন । মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে ; মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে ; ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে— এবং 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং', হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েছে । সে দেখা তো সহজ নয় ; সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা । মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই তো তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে ; তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দসম্মিলন ।

কিন্তু, বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায় । এমন কোন্ মহৎ সম্পদ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি । তাই এমন কথা শুনি, অনন্তকে নিয়ে তো আমরা উৎসব করতে পারি নে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র । বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব— কিন্তু, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোকধারার আবর্তন হয়ে কত শত শত বৎসর কেটে যায়, সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায় । তাই তো সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মতো করে ছোটো করে নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না ।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে । যখন উপভোগ করি নে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করি নে, তখনই কলহ করি । ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তা হলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত ; কিন্তু যে সূর্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে যায় ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা । আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত । হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই তো ঐ বাণী উঠেছে : বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন । এ তো তর্কযুক্তির কথা হল না ; চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা ।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে, কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন 'এষঃ', এই-যে তিনি, সেখানে তো কোনো কথা বলা চলে না । 'সীমা' শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা 'অসীম' শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি । কিন্তু অসীম তো 'না' নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ' । তাই তো তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয় । ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা । আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন— কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা ; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে ; মৃত্যুর 'না' দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে 'হাঁ' ।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্ছেন তেমনি ওঁ । তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্ছে, সমস্ত স্খলিত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্ছে । সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্তন সমস্ত গতায়াত সত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানছি ; নিরন্তর সমস্ত চলে-যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করছে । বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখছি ; কখনো আজ কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায় । তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে-একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে

আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে। যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন-কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করে নি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে— কিন্তু, সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে-একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন তাঁরাই বলেছেন : এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোহস্য পরমোলোকঃ, এষোহস্য পরমআনন্দঃ। এ তো জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই-যে ইনি, এই-যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমা গতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। তিনি এক দিকে যেমন গতি আর-এক দিকে তেমনি আশ্রয়, এক দিকে যেমন সাধনার ধন আর-এক দিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু, আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করছি বটে, তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ ; নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব, অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মতো গড়ে নিতে হবে, তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে— এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু, আমার বন্ধুকে যেমন আর নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তা হলে কখনো তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না— বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ— তেমনি অনন্তস্বরূপের প্রকাশও তো আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি ; তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করছেন। যখনই তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন তখনই তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাত তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা তো আমারই, বনের শ্যামল শোভা তো আমারই— ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে। ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সংগীত উঠেছে সে সংগীত কার জন্যে। আর, এই তো রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর-দক্ষিণ-হস্ত-ধরা বন্ধু, এই তো ঘরে বাহিরে যাদের ভালোবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন ; এদের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্ছে, এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন। এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আল্‌পনা-আঁকা বরণবেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করছেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব। সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা ? তাঁরই এই আপন আনন্দনিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালোবাসতে না পারলুম, তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কী ছিল। তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিনে হাওয়াকে উতলা করে তোলে। তবে তো বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না ; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেছে তাইতে তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা

করলুম, তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কী বলেছে, তার থেকে তুমি কী বুঝলে। সে বললে, সে কথা তো আমাদের মাস্টারমশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাস্টারমশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে, রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়, মাস্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর-একটা কথা বসানো, 'সুশীতল' শব্দের জায়গায় 'সুস্নিগ্ধ' শব্দ প্রয়োগ করা। এপর্যন্ত মাস্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে। যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি। এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না। সেও বলে আমি বুঝি নে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ শহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'নদী জিনিসটা কী— তুমি কখনো কি দেখেছ', সে বললে 'না'। ভূগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে ; এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এক্‌জামিন-পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাস্টারমশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নি, দেখতে পেলুম না। ওরে, বোঝবার আছে কী ? এই-যে এষঃ, এই-যে এই। এই-যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই-যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়ছে, এই-যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রঙ ভরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠছে ; এই-যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠছে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; আর ঐ-যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রে এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কশা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠছে— এই তো এষঃ, এই তো এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে নিজের কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি— সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং, সেই কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই-যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীরভাবে পূর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, সেই-যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে— পিতা, মাতা, বন্ধু— সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোটো করে আপন হাতে আপনার মতো ক'রে গড়েছি তখন কী যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না। যখন আমরা বলেছি 'আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্যে ছোটো করব', তখনই আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি। তখন টুকরো কেবলই হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থামতে চায় নি ; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে ; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে ; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মতো স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরোতে কেবলই ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে, অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়। থামার সীমাই হচ্ছে আমাদের মৃত্যু ; আরোর পরে আরোই হচ্ছে আমাদের প্রাণ— সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়তসাধনার দিক। সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোটো করতে গিয়ে পূজনীয়কে একপ্রকার বাদ দিয়ে বসে তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর-এক বিপদে গিয়ে পড়ে— আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতে পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে, অসীমকে কেবলমাত্র ছোটো করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড়ো করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়; তাঁকে শুধু ছোটো করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড়ো করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্ত ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোটো হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ, সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনি আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক, সেই স্বর্গলোক, যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত ক'রে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনই এ কথা সত্য হয়েছে তখনই এ কথাও সত্য— অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। এক দিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-এক দিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; এক দিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-এক দিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এইজন্যেই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই; সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়— বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে। মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে। কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানব-জন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো হয় কোনো পূর্বপিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু, তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ-সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে এক দিকে আনন্দের দ্বারা, অন্য দিকে

তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে ; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না— জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে, তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ এক দিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন, আবার আর-এক দিকে বলেছে : স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যাদ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করেছেন। এই দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্যাদ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরেছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম : আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে ! সে আরো গেয়েছিল : আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে ! তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিংবা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কী অর্থ বোঝে। কেননা, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বৈকি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেইজন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেছে : খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায় ! আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে !

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট -রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ ; তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয় ; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে : আমার মনের মানুষ কে রে ! আমি কোথায় পাব তারে ! সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না। তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে ; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। কোথায় পাব তারে ! কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না ; স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া ; আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে। এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে 'আমি কোথায় পাব তারে'। সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই ; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্যলাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার— এক কথায়, পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই-যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ তো কেবল রসের

বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না, জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে— ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে দিকেই মানুষ বলেছে 'আমি চিরকালের মতো পৌঁচেছি', 'আমি পেয়ে বসে আছি', এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই-যে তার চিরকালের গান : আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে! এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন : মনের মানুষ যেখানে, বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে! কেননা, সন্ধান এবং পেতে থাকা একসঙ্গে ; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর-এক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে 'পিতা নোঽসি', তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ ; কোনো অনন্ত তত্ত্বকে তো পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল। এতে কি কোনো অপরাধ হল। এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল। কিছুমাত্র না। কেননা, আমার ঘর ছেড়ে তিনি তো শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি ; মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে ; মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক-এক ভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবন-ভরা অসীমকে, আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে— আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে। সেইটেই আমার চরম ডাক, সেইজন্যেই আমার ঘর। সেইজন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি। সেইজন্যেই আমার জীবনের যত-কিছু জানা, যত-কিছু পাওয়া। তাই তো মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে 'পিতা নোঽসি', তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক ; কিন্তু, এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে যখন এই ছোটো অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা ব'লে পিতা ব'লে কেবলমাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না ; যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফললাভ করতে চাই, অন্যায় করে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু, এ তো কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য, ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্বলতাকে লালন করবার জন্যে, তাঁকে পিতা বলা নয়। সেইজন্যেই বলা হয়েছে : পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার মধ্যে উদ্‌বোধিত করতে থাকো। এ বোধ তো সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে তো চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে, সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে 'পিতা'— সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি! নমস্তেঽস্তু! পিতার বোধকে উদ্‌বোধিত করো— যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি— যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণকীর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্ত কালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তুমি সুখরূপে আনন্দকর, তোমাকে নমস্কার! তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর, তোমাকে নমস্কার! তুমি কল্যাণ তোমাকে নমস্কার! তুমি নব নবতর কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার।

সায়ংকাল। ১১ মাঘ ১৩২০

ফাল্গুন ১৩২০

১৬
সৌন্দর্যের সকরুণতা

প্রভাতের পূর্বগগনে আলোকের প্রথম বিকাশ যেমন মধুর, মানুষের জীবনের প্রথম প্রত্যুষের অরুণরেখা যেদিন জেগে ওঠে সেদিন শিশুর কণ্ঠে তার সংগীত তেমনি মধুর, তেমনি নির্মল। সমস্ত মানুষের জীবনের আরম্ভে এই মধুর সুরের উদ্‌বোধন লোকালয়ে ঘরে ঘরে দেখতে পাই। জীবনের সেই নির্মল সৌন্দর্যের ভূমিকাটি কেমন সুন্দর! জগৎসংসারে তাই যত মলিনতা থাক্, জরার দ্বারা মানুষ যেমনই আচ্ছন্ন হোক-না কেন, ঘরে ঘরে মনুষ্যত্ব নতুন হয়ে জন্মগ্রহণ করছে। আজ শিশুদের কণ্ঠে জীবনের সেই উদ্‌বোধনসংগীতের প্রথম কলকাকলি শুনতে পাচ্ছি— এ উদ্‌বোধন কে প্রেরণ করলেন। যিনি জীবনের অধীশ্বর তিনিই ঘরে ঘরে এই জাগরণের গীত পাঠিয়েছেন। আজ চিত্ত সেই গানে জাগ্রত হোক।

কিন্তু, এই উৎসবের সংগীতের মধ্যে একটি করুণ সুর, একটি কান্না রয়েছে; সকালের প্রভাতী রাগিণীর সেই কান্না বুকের মধ্যে শিরা নিংড়ে নিংড়ে বাজছে। আনন্দের সুরের মধ্যে করুণার কোমল নিখাদ বাজছে! সে কিসের করুণা। পিতা ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সকলের সময় হয়ে ওঠে নি। জাগে নি সবাই। অনন্ত শূন্যে প্রভাতআলোকের ভৈরবী সুর করুণা বিস্তার করে যুগ হতে যুগে ধ্বনিত হচ্ছে, তিনি উৎসবক্ষেত্রে ডেকেছেন। অনাদিকালের সেই আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে; কিন্তু, তাঁর ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙে নি। তারা কেউ বা উদাসীন, কারও বা কাজ আছে, কেউ বা উপহাস করছে, কাউকে বা অভ্যাসের আবরণ কঠিন করে ঘিরে আছে। তারা সংসারের কোলাহল শুনেছে, স্বার্থের আহ্বান শুনেছে, প্রতিদিনের প্রয়োজনের ডাক শুনেছে, কিন্তু আকাশের আলোকের ভিতরে আনন্দময়ের আনন্দভবনে উৎসবের আমন্ত্রণের আহ্বান শুনতে পায় নি।

প্রেমিকের ডাক প্রেমাস্পদের কাছে আসছে, মাঝখানে কত ব্যবধান! কত অবিশ্বাস, কত কলুষ, কত মোহ, কত বাধা! উৎসবের নহবত প্রভাতে প্রভাতে বাজছে, তারায় তারায় অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করে বাজছে— সেই উৎসবালোকে ফুল ফুটছে, পাখি গান করছে, শ্যামল তৃণের আস্তরণ পাতা হয়েছে, তাঁর মালীরা ফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু, এতই ব্যবধান, সেখানকার সংগীতকে এখানে আমাদের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না। সেইজন্যই তিনি যে সৌন্দর্যের সংগীত বাজাচ্ছেন তার মধ্যে অমন কান্না রয়েছে। পৌঁছল না, সবাই এসে জুটল না, আনন্দসভা শূন্য পড়ে রইল। জগতের সৌন্দর্যের বুকের মধ্যে এই কান্না বাজছে। ফুল ফুটতে ফুটতে ঝরতে ঝরতে কত কান্নাই কাঁদল। সে বললে: যে প্রেমলিপি আমি আনলুম সে লিপিখানি কেউ পড়ল না।

নদীর কলস্রোতে নির্জন পর্বতশিখর থেকে যে সংগীতকে বহন করে সমুদ্রের দিকে চলেছে সেই সুরে কান্না রয়েছে: আমি যে নির্জন থেকে নির্জনের দিকে চলেছি সেই নির্জনের সুর গ্রামে গ্রামে লোকালয়ে ঘোষণা করেছি, কারও সময় হল না সে আহ্বান শুনবার। আকাশের সমস্ত তারা এমন ডাক ডাকল, কাননের সমস্ত ফুল এমন ডাক ডাকল— দরজা রুদ্ধ— কেউ শুনল না। এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম, সেখানে কি কেবল কাজ! কাজ! কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল! কেবল এই কলহ মাৎসর্য বিরোধ! সেখানে এরাই কি সকলের চেয়ে প্রধান! এই সুরেই কি সূর্য চন্দ্র সুর মেলাচ্ছে! এই সুরেই কি সুর ধরিয়েছিলেন যেদিন জননী শিশুকে প্রথম মুখচুম্বন করলেন! এত বড়ো আকাশ, তার এমন নির্মল নীলিমা! একে মানব না? পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানব না! সেইজন্যই জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটি চিরবিরহের করুণা। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ হয়েছে, মাঝখানে স্বার্থের মরুভূমি। সেই মরুভূমি পার হয়ে ডাক আসছে 'এসো এসো'— সেই ডাকের কান্নায় আকাশ ভরে গেল, আলোক ফেটে পড়ল।

কিন্তু, যিনি উৎসবের দেবতা তিনি অপেক্ষা করতে জানেন। এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে তিনিই পার করছেন, পথহারাদের ক্রমে ক্রমে পথে টেনে আনছেন। দুঃখের অশ্রুতে তাঁর মিলনের শতদল বিকশিত

তিনি জানেন যে বধির সেও শুনবে, চিরযুগের রুদ্ধদ্বার একদিন খুলবে, পাষাণ একদিন গলবে। এই বাধা-বিরোধের ভিতর থেকে তিনি টেনে নেবেন।

মানুষের জাগরণ সহজ নয় বলেই তার মূল্য যে বেশি। এই জাগরণের জন্য যুগ যুগ যে অপেক্ষা করতে হয়। যেদিন জাগবে মানুষ সেদিন পাখির গানের চেয়ে তার গানের মূল্য অনেক বেশি হবে, ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার সৌন্দর্য অনেক বেশি হবে। মানুষ আজ বিদ্রোহ করছে ; কিন্তু ঝড়ের মেঘ যেমন শ্রাবণের ধারায় বিগলিত হয়ে তার বজ্রবিদ্যুৎকে নিঃশেষ করে মাটিতে লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়, তেমনি বিদ্রোহী মানুষ যেদিন ঝোড়ো মেঘের মতো কেঁদে ঝরে পড়বে সেদিন মরুভূমিতে বিকশিত হবে ফুল— তার মূল্য যে অনেক বেশি। সেইজন্য যুগ যুগ রাত্রিদিন তিনি জেগে রইলেন, অপেক্ষা করে রইলেন, পাপীর পাপের মলিনতা ধৌত হয়ে কবে তার হৃদয় ফুলের মতো নির্মল হয়ে ফুটে উঠবে। বৎসরে বৎসরে উৎসব ব্যর্থ হয় ; দিনের পর দিন আলোকদূত ফিরে ফিরে যায় ; অন্ধকার নিশীথিনীর তারকারা রাত্রির পর রাত্রি একই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, ক্ষান্ত হয় না ক্লান্তি আসে না— কারণ, এই আশা যে জেগে রয়েছে যে যেদিন মানুষ ডাক শুনবে সেদিন সমস্ত সার্থক হবে।

আজ উৎসবের প্রাঙ্গণে আমরা এসেছি ; এ দিন সকলের উৎসবের দিন কি না তা জানি না। সম্বৎসর তিনি ফুল ফুটিয়েছেন, প্রতিদিনই আমাদের ডেকেছেন। আজ কি আমরা নিজের হাতের তৈরি এই উৎসবক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রতি নিমেষের সাড়া দিচ্ছি। হে উৎসবের দেবতা, তোমার উৎসবের ক্ষেত্র ব্যর্থ হবে না। তুমি সাজিয়েছ, আমরা এসেছি। আমরা বললুম 'পিতা নোঽসি' ; তুমি পিতা এই কথা স্বীকার করলুম। বললুম নমস্তেঽস্তু, নমস্কার সত্য হোক। নমস্কার তো সত্য হয় নি। সংসারের মধ্যে নমস্কার সত্য হয় নি। তোমাকে বঞ্চনা করেছি। ক্ষমতার পায়ে, ধনের পায়ে নমস্কার করেছি। হে আমার উৎসবদেবতা, আজ একটুখানি নমস্কার বাঁচিয়ে এনেছি— আজ আসবার সময় ধনমানের কাছ থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটু নমস্কার আনতে পেরেছি— সে না হতে পারে প্রতিদিনের নমস্কার, না হতে পারে সমস্ত জীবনের নমস্কার, কিন্তু এই ক্ষণকালের নমস্কার তুমি নাও, সমস্ত জীবনের অসাড়তা অচৈতন্য দূর হোক, তুমি নিজের হাতে জাগাও—

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।

প্রাতঃকাল। ১১ মাঘ ১৩২১

ফাল্গুন ১৩২১

অমৃতের পুত্র

অমৃত-উৎসের ধারে মানুষকে একবার করে আসতে হবে এবং আপনাকে নতুন করে নিতে হবে। জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে নতুনকে কেবলই প্রকাশ করা। সংসারের মধ্যে জরা সব জীর্ণ করছে, যা-কিছু নতুন তার উপর সে তার তপ্ত হাতের কালিমা বোলাচ্ছে, তাই দেখতে দেখতে নির্মল ললাটে বলির রেখা পড়ে— সকল কর্মের ক্লান্তি ও অবসাদ কেবলই জমে ওঠে। এই জরার আক্রমণে আমরা প্রতিদিন পুরাতন হয়ে যাচ্ছি। সেইজন্য মানুষ নানা উপলক্ষ করে একটি জিনিসকে কেবলই প্রকাশ করতে চায়। সে জিনিসটি তার চিরযৌবন। জরাদৈত্য যে তার সব রক্ত শোষণ করেছে সে এ কথা মানতে চায় না। সে জানে যে তার অন্তরের চিরনবীন চিরযৌবনের ভাণ্ডারে অমৃত পরিপূর্ণ। সেই কথাটি ঘোষণা করবার জন্যই মানুষের উৎসব।

মানুষ দেখতে পেয়েছে যে সংসারের সঞ্চয় প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে যায়। যতই ভয় ভাবনা করি, যতই আগলে আগলে রাখি, কাল সমস্তই নষ্ট করবে— নবীন সৌন্দর্য কোথাও রাখবে না। সংসার যে বৃদ্ধকে তৈরি করছে ; সে আরম্ভ করে নবীন শিশুকে নিয়ে, তার পরে একদিন বৃদ্ধ ক'রে তাকে ছেড়ে দেয়। প্রভাতের শুভ্র নির্মলতা নিয়ে সে আরম্ভ করে, তার পরে তার উপর কালের প্রলেপ দিতে দিতে তাকে নিশীথ রাত্রের কালিমায় হারিয়ে ফেলে।

অথচ এই জরার হাত থেকে মানুষকে তো রক্ষা পেতে হবে। কেমন করে পাবে, কোথায় পাবে। যেখানে চিরপ্রাণ সেইখানে পাবে। সে প্রাণের লীলার ধারা তো একসূত্রের ধারা নয়। দেখো-না কেন, রাত্রির পরে দিন নতুন নতুন পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। দিনান্তে নিশীথের তারা নতুন করেই আপনার দীপ জ্বালাচ্ছে। মৃত্যুর সূত্রে প্রাণের মালাকর অমনি করে জীবনের ফুলকে নবীন করে গেঁথে তুলছেন। কিন্তু, সংসার একটানা মৃত্যুকে ধরে রেখেছে, সে সব জিনিসকে কেবলই ক্ষয় করতে করতে সেই অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কিন্তু, এই একটানা মৃত্যুর ধারা যদি চরম সত্য হত তবে তো কিছুই নতুন হয়ে উঠত না, তবে তো এত দিনে পৃথিবী পচে উঠত, তবে জরার মূর্তিই সব জায়গায় প্রকাশ পেত। সেইজন্য মানুষ উৎসবের দিনে বলে : আমি এই মৃত্যুর ধারাকে মানব না, আমি অমৃতকে চাই। এ কথাও মানুষ বলেছে : অমৃতকে আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি, সমস্তই বেঁচে আছে অমৃতে।

মৃত্যুর সাক্ষ্য চারি দিকে, অথচ মানুষ বলে উঠেছে : ওগো শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।

আমি তাঁকে জেনেছি এই বার্তা যাঁরা বলেছেন তাঁরা সে কথা বলবার আরম্ভে সম্বোধনেই আমাদের কী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন 'তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র— তোমরা সংসারবাসী মৃত্যুর পুত্র নও'! জগতের মৃত্যুর বাঁশির ভিতর দিয়ে এই অমৃতের সংগীত যে প্রচারিত হচ্ছে এ সংগীত তো পশুরা শুনতে পায় না। তারা খেয়েদেয়ে ধুলোয় কাদায় লুটিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। অমৃতের সংগীত যে তোমরাই শোনবার অধিকারী। কেন। তোমরা যে মৃত্যুর অধীন নও, তোমরা মৃত্যুর একটানা পথেই চলছ না—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

তোমরা যে ধামে রয়েছ, যে লোকে বাস করছ, সে কোন্ লোক। তোমরা কি এই পৃথিবীর ধুলোমাটিতেই রয়েছ যেখানে সমস্ত জীর্ণ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। না, তোমরা দিব্যলোকে বাস করছ, অমৃতলোকে বাস করছ। এই কথা মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বলছে, সমস্ত সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে মানুষ বলছে। এ কথা সে মরতে মরতে বলছে। এই মাটির উপর মাটির জীবের সঙ্গে বাস করে বলছে : তোমরা এই মাটিতে বাস করছ না, তোমরা দিব্যধামে বাস করছ।

সেই দিব্যধামের আলো কোথা থেকে আসে। তমসঃ পরস্তাৎ। তমসার পরপার থেকে আসে। এই মৃত্যুর অন্ধকার সত্য নয়, সত্য সেই জ্যোতি যা যুগে যুগে মোহের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আসছে। যুগে যুগে মানুষ অজ্ঞানের ভিতর থেকে জ্ঞানকে পাচ্ছে, যুগে যুগে মানুষ পাপকে মলিনতাকে বিদীর্ণ করে পুণ্যকে আহরণ করছে। বিরোধের ভিতর দিয়ে সত্যকে পাচ্ছে, এ ছাড়া সত্যকে পাবার আর-কোনো উপায় মানুষের নেই। যারা মনে করছে এই জ্যোতিই অসত্য, এই দিব্যধামের কথা কল্পনা মাত্র, তাদের কথা যদি সত্য হত তবে মাটিতে মানুষ একদিন যেমন জন্মেছিল ঠিক তেমনিই থাকত, তার আর কোনো বিকাশ হত না। মানুষের মধ্যে অমৃত রয়েছে ব'লেই না মৃত্যুকে ভেদ করে সেই অমৃতের প্রকাশ হচ্ছে। ফোয়ারা যেমন, তার ছোটো একটুখানি ছিদ্রকে ভেদ ক'রে ঊর্ধ্বে আপনার ধারাকে উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি এই মৃত্যুর সংকীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অমৃতের উৎস উঠছে। যাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা ডাক দিয়ে বলেছেন : ভয় কোরো না, অন্ধকার সত্য নয়, মৃত্যু সত্য নয়, তোমাদের অমৃতের অধিকার। মৃত্যুর কাছে দাসখত লিখে দিয়ো না ; যদি প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ কর তবে এই অমৃতত্বের অধিকারকে যে অপমানিত করবে। কীট যেমন করে ফুলকে খায় তেমনি করে প্রবৃত্তি যে একে খেতে থাকবে। তিনি নিজে বলেছেন : তোরা অমৃতের পুত্র, আমার মতন তোরা। আর আমরা সে কথা প্রতিদিন মিথ্যা করব?

ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র করে তোলা সহজ। মানুষের বিকাশে যত বাধা ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই। সে যে খোলা আকাশে থাকে ; সমস্ত আলোকের ধারা বাতাসের ধারা নিয়ত সেই আকাশ ধুয়ে দিচ্ছে— সে বাতাসে তো দূষিত বাষ্প জমা হয়ে তাকে বিষাক্ত করছে না, মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশ-ভরা প্রাণ সেই বিষকে ক্ষালন করে দিচ্ছে, তাকে কোথাও জমতে দিচ্ছে না। মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারি দিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে ; কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, 'আকাশের আলোকে আমি বিশ্বাস করব না, আমার ঘরে মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব ; আলোক নতুন, কিন্তু আমার ঐ দীপ সনাতন।' তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে ; সেইটেতেই সে পড়ে থাকতে চায়, কেননা, সে যে হল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে।

চিরদিন এমনি করে সত্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ। মানুষের নিজের হাতের গড়া জিনিসের উপর মানুষের বড়ো মোহ ; সেইজন্য মানুষ নিজের হাতেই নিজে মার খায়। মানুষ নিজের হাতে নিজেকে মারবার গদা তৈরি করে। সেইজন্য আজ সেই নিজের হাতে গড়া গদার আঘাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি আজ বলছে, 'ধর্মবুদ্ধির কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আমি গায়ের জোরে সব কেড়েকুড়ে নেব।' সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে ; সে ধর্ম— যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু, মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র; সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে। যা জমিয়েছে তাকে চিরকালই আঁকড়ে ধরে রাখবে এ কেমন মমতা। যেমন দেহের প্রতি আমাদের মমতা। আমরা কি হাজার চেষ্টা করলেও দেহকে রাখতে পারি। যতই কেঁদে মরি-না কেন, যতই বলি-না কেন যে তার সঙ্গে অনেক দিন ধরে আমার সম্বন্ধ— তাকে রাখতে পারব না, কারণ তাকে রক্ষা মানেই মৃত্যুকে ধরে রাখা। আমাদের-যে দেহকে ত্যাগ করে মৃত্যুকেই মারতে হয়। তেমনি বাপ-পিতামহ থেকে যা চলে আসছে, যা জমে রয়েছে, তাকে চিরকাল ধরে রাখবার ইচ্ছাও মৃত্যুকে ধরে রাখবার ইচ্ছামাত্র। দেহকে রাখতে পারলুম না, পুরাতনকেও রাখতে পারব না।

ইতিহাসবিধাতা তাই বললেন নতুন হতে হবে। কামানের গর্জনে আজ সেই বাণীই শুনতে পাচ্ছি— নতুন হতে হবে। জাতীয়তার আদর্শকে নিয়ে য়ুরোপ এতকাল ধরে তার প্রতাপকে অভ্রভেদী করে তুলেছে। ছোটো জাহাজ ছিল, তার পর বড়ো জাহাজ, তার পর বড়ো জাহাজ থেকে আরো বড়ো জাহাজ। কামান ছোটো ছিল, তা থেকে আরো বড়ো কামান গড়ে তুলে য়ুরোপ তার মারণ-অস্ত্র সব এতকাল বসে শানিয়েছে। জলে স্থলে এই-সব ব্যাপার করে তুলে তার তৃপ্তি হল না ; আকাশে পর্যন্ত মারবার যন্ত্র তাকে তৈরি করতে হল। নিজের প্রতাপকে এমনি করে অভ্রভেদী করে সে দুর্বলকে টিপে তার রক্ত পান করবে, এমন কথা কি সে বলতে পারে। মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে, এই হবে ? ইতিহাসবিধাতা তাই হতে দেবেন ? না। তিনি কামানের গর্জনের ধ্বনির ভিতর দিয়ে বলেছেন নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই ? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব ? ইতিহাসবিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন। দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন, 'না, হয় নি, তোমাদেরও হয় নি, নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয় নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায় বিশ্বাস করো। বীর পুত্র, দুঃসাহসিক পুত্র সব বেরিয়ে

পড়ো।'— এই বাণী কি আসে নি। এ কথা তিনি শোনান নি ?—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামবাসী। তোমাদের এই অন্ধকারের মধ্যে সেই পরপার থেকে আলোক আসছে। সেইখান থেকে যে আলোক আসছে তাতে জাগ্রত হও ; বসে বসে চকমকি ঠুকলে দিনকে সৃষ্টি করতে পারবে না। সেই আলোকে যে নব নব দিন অমৃতের বার্তা নিয়ে আসছে। নব নব লীলায় সব নূতন নূতন হয়ে উঠছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দ আসছে, রক্তস্রোতের উপর জীবনের শ্বেত শতদল ভেসে উঠছে।

সেই অমৃতের মধ্যে ডুব দাও, তবেই হে বৃদ্ধ, কাননে যে ফুল এইমাত্র ফুটেছে তুমি তার সমবয়সী হবে ; আজ ভোরে পূর্বাশার কোলে যে তরুণ সূর্যের জন্ম হয়েছে, হে প্রবীণ, তোমার বয়স তার সঙ্গে মিলবে। বেরিয়ে এসো সেই আনন্দলোকে, সেই মুক্তির ক্ষেত্রে। ভেঙে ফেলো বাধাবিপত্তিকে, নিত্যনূতনের অমৃতলোকে বেরিয়ে এসো। সেই অমৃতসাগরের তীরে এসে অকূলের হাওয়া নিই, সত্যকে দেখি। সত্যকে নির্মুক্ত আলোকের মধ্যে দেখি। সেই সত্য যা নিশীথের সমস্ত তারকার প্রদীপমালা সাজিয়ে আরতি করছে, সেই সত্য যা সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সাক্ষীর মতো সমস্ত দেখছে। নব নব নবীনতার সেই জ্ঞানময় সত্য যার মধ্যে প্রাণের বিরাম নেই, জড়তার লেশ নেই, যার মধ্যে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ।

ওরে সংকীর্ণ ঘরের অধিবাসী, ঘরের দরজা ভেঙেচুরে ফেলে দাও। আমরা উৎসবের দেবতাকে দর্শন করে মনুষ্যত্বের জয়তিলক এঁকে নেব, আমরা নূতন বর্ম পরিধান করব। আমাদের সংগ্রাম মৃত্যুর সঙ্গে। নিন্দা-অবমাননাকে তুচ্ছ করে অসত্যের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধ করবার অধিকার তিনি দিয়েছেন। এই অভয় বাণী আমরা পেয়েছি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

এই কথা বলবার দিন আজ এই ভারতবর্ষেরই এসেছে। আজ প্রতাপে মদোন্মত্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে— আমরা যত ছোটো হই সেই বল সংগ্রহ করব যাতে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, না, এ নয়, তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।

যে ধনমান পায় নি সেই জোরের সঙ্গে বলতে পারে : আমি সত্যকে পেয়েছি ; আমার ঐশ্বর্য নেই, গৌরব নেই, আমার দারিদ্র্য-অবমাননার সীমা নেই, কিন্তু আমার এমন অধিকার রয়েছে যার থেকে আমায় কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের আর-কিছু নেই বলেই এ কথা আমাদের মুখে যেমন শোনাবে এমন আর কারও মুখে নয়। পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্ছিত আমরা, আমরা বলব আমরা অমৃতের পুত্র— এবং আমরাই বলছি যে, তোমরাও অমৃতের পুত্র। আজ উৎসবের দিনে এই সুরটি আমাদের কানে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের অপমান দারিদ্র্য অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেইজন্যই সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ পেতে বাধা পাবে না, সে একেবারে নগ্ন হয়ে দেখা দেবে। পাথরের হর্ম্য গড়ে তুলে আমরাও আকাশের আলোককে নিরুদ্ধ করব না, আমাদের নিরাশ্রয় দীনের কণ্ঠে বড়ো মধুর সুরে বাজবে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

১১ মাঘ ১৩২১, প্রাতঃকাল

ফাল্গুন ১৩২১

যাত্রীর উৎসব

এই প্রাঙ্গণের বাইরে বিশ্বের যে মন্দিরে সন্ধ্যাকাশের তারা জ্বলে উঠেছে, যেখানে অনন্ত আকাশের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার শান্তি পরিব্যাপ্ত, সেই মন্দিরের দ্বারে গিয়ে প্রণাম করতে তো মন কোনো বাধা পায় না। বিশ্বভুবনে ফুলের যে রঙ সহজে পুষ্পকাননে প্রকাশ পেয়েছে, নক্ষত্রলোকে যে আলো সহজে জ্বলেছে, এখানে তো সে রঙ লাগা সহজ হয় নি, এখানে সম্মিলিত চিত্তের আলো তো সহজে জ্বলে নি। এই মুহূর্তে সন্ধ্যাকালের গন্ধগহন কুসুমের সভায়, নিবিড় তারারাজির দীপালোকিত প্রাঙ্গণে, বিশ্বের নমস্কার কী সৌন্দর্যে কী একান্ত নম্রতায় নত হয়ে রয়েছে! কিন্তু, যেখানে দশজন মানুষ এসেছে সেখানে বাধার অন্ত নেই; সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত ঢেউ তুলেছে— কত সংশয়, কত বিরোধ, কত পরিহাস, কত অস্বীকার, কত ঔদ্ধত্য! সেখানে লোক কত কথাই বলে: এ কোন্ দলের লোক, কোন্ সমাজের, এর কী ভাষা! এ কী ভাবে, এর চরিত্রে কোথায় কী দরিদ্রতা আছে, তাই নিয়ে এত তর্ক! এত প্রশ্ন এত বিরুদ্ধতার মাঝখানে কেমন করে নিয়ে যাব সেই প্রদীপখানি একটু বাতাস যার সয় না, সেই ফুলের অর্ঘ্য কেমন করে পৌঁছে দেব একটু স্পর্শেই যা ম্লান হয়। সেই শক্তি তো আমার নেই যার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হবে, সব বিক্ষোভের তরঙ্গ শান্ত হবে। জনতার মাঝখানে যেখানে তাঁর উৎসব সেখানে আমি ভয় পাই, এত বিরুদ্ধতাকে ঠেলে চলতে আমি কুণ্ঠিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসীন সেখানে তাঁর চরণে উপবেশন করতে আমি ভয় করি নি। সেখানে গিয়ে বলতে পারি, হে রাজন্, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমি তো কেবল বিশ্বের রাজা নও, আমার সঙ্গে যে তোমার অনন্ত কালের সম্বন্ধ। এ কথা বলতে কণ্ঠ কম্পিত হয় না, হৃদয় দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু, ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আমার বলে স্বীকার করতে কণ্ঠ যদি কম্পিত হয় তবে মাপ কোরো হে হৃদয়েশ্বর। ভিড়ের মধ্যে যখন ডাক দাও তখন কোন্ ভাষায় সাড়া দেব। তোমার চরণে হৃদয়ের যে ভাষা সে তো নীরব ভাষা, যে স্তবগান তোমার সে তো অশ্রুত গান। সে যে হৃদয়বীণার তন্ত্রে তন্ত্রে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে, সেই বীণা যে তোমার বুকের কাছে তুমি ধরে রেখেছ। যতই ক্ষীণ সুরে সে বাজুক সে তোমার বুকের কাছেই বাজে। কিন্তু, তোমার আমার মাঝখানে যেখানে জনতার ব্যবধান, নীরবে হোক সরবে হোক অন্তরে অন্তরে যেখানে কোলাহল তরঙ্গিত, সেই ব্যবধান ভেদ করে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠের সংগীত যে জাগবে আমার পূজার দীপালোক যে অনির্বাণ হয়ে থাকবে— এ বড়ো কঠিন, বড়ো কঠিন।

মানুষ গোড়াতেই যে প্রশ্ন করে, কে হে, তুমি কোন্ দলের। এ যে উৎসব— এ তো কোনো এক দল নয়, এ যে শতদল। এ কাদের উৎসব আমি কেমন করে তার নাম দেব। এক-একজন করে কত লোকের নাম বলব। হৃদয়ের ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে সমস্ত কোলাহল পার হয়ে স্তব্ধ শান্ত হয়ে যাঁরা এসেছেন আমি তো তাঁদের নাম জানি না। যাঁরা যুগে যুগে এই উৎসবের দীপ জ্বালিয়ে গেছেন এবং যাঁরা অনাগত যুগে এই দীপ জ্বালাবেন তাঁদের কত নাম করব আর কেমন করেই বা করব। আমি এই জানি, যে সম্প্রদায় আপনার বাইরে আসতে চায় না সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশমান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান, সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়।

উৎসব তো ভক্তির, উৎসব তো ভক্তেরই। সে তো মতের নয়, প্রথার নয়, অনুষ্ঠানের নয়। এ চিরদিনের উৎসব, এ লোকলোকান্তরের উৎসব। সেই অনন্ত কালের নিত্য-উৎসবের আলো থেকে যে একটুখানি স্ফুলিঙ্গ এখানে এসে পড়ছে যদি কেউ হৃদয়ের দীপমুখে সেটুকু গ্রহণ করে তবেই সে শিখা জ্বলবে, তবেই উৎসব হবে। যদি তা না হয়, যদি কেবল দস্তুর রক্ষা করা হয়, এ যদি কেবল পঞ্জিকার জিনিস হয়, তবে সমস্ত অন্ধকার; এখানে একটি দীপও তবে জ্বলে নি। সেইজন্য বলছি এ দলের উৎসব নয়, এ হৃদয়ের ভিতরকার ভক্তির উৎসব। আমরা লোক ডেকে আলো জ্বালাতে পারি, কিন্তু লোক ডেকে তো সুধারসের উৎসকে উৎসারিত করতে পারি না। যদি আজ কোনো জায়গায় ভক্তের কোনো একটি

আসন পাতা হয়ে থাকে, এ সভার প্রান্তে যদি ভক্তের হৃদয় জেগে থাকে, তবেই সার্থক হয়েছে এই প্রদীপ জ্বালা, সার্থক হয়েছে এই সংগীতের ধ্বনি, এই-সমস্ত উৎসবের আয়োজন।

এই উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী ; পথের ধারের কোনো পান্থশালাতে আমরা বদ্ধ নই। কোনো বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব হয় না— চলার পথে উৎসব, চলতে চলতে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে। যেদিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছি সেই দিন থেকে এই আনন্দ-উৎসবের আমন্ত্রণ পৌঁচেছে ; সেই আহ্বানে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সেই দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাই তো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে পথে চলেছি সে সংসারের পথ— তার মাঝে সংসার, তার শেষে সংসার ; তার লক্ষ্য ধনমান, তার অবসান মৃত্যুতে। কিন্তু না, পথ তো কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী তার দক্ষিণ হাত ধরে কত সংকটের মধ্য দিয়ে, সংশয়ের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, তাকে পাশে নিয়ে চলেইছ ; কোনো-কিছুতে এসে থামতে দাও নি। সে বিদ্রূপ করেছে, বিরুদ্ধতা করেছে, কিন্তু তুমি তার দক্ষিণ হাত ছাড় নি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছ ; তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মনুষ্যত্বের বিরাট রাজপথে, সেখানে সমস্ত যাত্রীর দল চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে কী আনন্দকোলাহল, কী জয়ধ্বনি ! সেই তো উৎসবের আনন্দধ্বনি ! তুমি বদ্ধ কর নি, তুমি বদ্ধ হতে দেবে না, তুমি কোনো মতের মধ্যে প্রথার মধ্যে মানুষকে নজরবন্দী করে রাখবে না। তুমি বলেছ, 'মাভৈঃ, যাত্রীর দল বেরিয়ে পড়ো।' কেন ভয় নেই। কিসে নির্ভয়। তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে চলছ। তাই তো যে চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে। যে চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনার সম্প্রদায়কেই পাচ্ছে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেছেন তিনি কবে চলবে বলে কারও জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েছে সে কি দেখতে পাচ্ছে না তার বন্ধন। সে কি জানে না যে এই বন্ধন না খুলে ফেললে সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না। সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেছি এমন কথা কে বলে ! অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে ? তুমি যত বড়ো মুগ্ধ হও-না কেন, তোমার মোহ-অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেলবে এত বড়ো স্পর্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে !

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি— তাকে বলেছি ; 'তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাহিরে নয়, তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়ো না।' সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব— মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর— এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না ? মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না ? তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন। তিনি কি বলতে পারেন যে তিনি বন্দী। তিনি এ কথা বললে সংসারকে কে বাঁচাবে। তিনি বলেছেন, 'সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত।' এই উদ্‌বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র এখনই নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে ; অনন্তকাল জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করছে। জপ করছে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা : জাগ্রত হও, জাগ্রত হও ; প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা কোরো না। সত্য তা হলে নিদারুণ হয়ে উঠবে ; যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি ? সইবে না বন্ধন : বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকবার নয়— চলবার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব, সেই সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি। কালের স্রোতে ডুবল না 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল— অন্ত নেই তার অন্ত নেই। অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সেই-যে মুক্তির আনন্দঘোষণার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা কজনে সম্পন্ন করব, এই কলকাতা শহরের এক প্রান্তে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দধ্বনি বেজে উঠবে না ? এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন। এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন, বিশ্বের মর্মকুহর থেকে এই মুক্তিমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এই-যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্ছে, সেই আগুনকে তাঁরা এই ক'টি সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব ? আর বলব সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ইতিহাসের জীর্ণ দেয়ালে ভাঙা-ঘড়ির কাঁটার মতো চিরদিনের জন্য থেমে গেছে ? গৌরব করে বলব 'আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে— বুকের উপরে সেই জগদ্দল পাথরের ভার আমরা বইছি' ? না, কখনোই না। উদ্‌বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজছে : যাত্রী, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। ভেঙে ফেলো তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে চলো যারা চন্দ্র-সূর্য-তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চলছে। ১১ মাঘ ১৩২১, সন্ধ্যার উদ্‌বোধন।

ফাল্গুন ১৩২১

মাধুর্যের পরিচয়

আমাদের মন্ত্রে আছে : পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি আমাদের পিতা, তুমি পিতা আমাদের এই বোধ দাও। এই পিতার বোধ আমাদের অন্তঃকরণে সজাগ নেই বলে আমাদের যেমনই ক্ষতি হোক, পিতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের দিক দিয়ে তাঁর কাজ সমানই চলেছে। আমাদের বোধের অসম্পূর্ণতাতে তাঁর কোনো ব্যাঘাত হয় নি। তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানের মধ্যে চৈতন্য ও প্রাণ প্রেরণ করেছেন, তাঁর পিতৃত্ব মানবসমাজে কাজ করেই চলেছে।

কিন্তু, এক জায়গায় তিনি সুপ্ত হয়ে আছেন ; তিনি যেখানে আমাদের প্রিয়তম সেখানে তিনি জাগেন নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রেম উদ্‌বোধিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি— এ কথা আমি জানলুম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম এ কথা সত্য। এ বললে স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ ঘটে ? কারণ তিনি যদি প্রিয়তম তবে তাঁকে ভালোবাসি না কেন। কিন্তু, তা বললে কী হবে, তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন। কত মানুষের ভিতরে জীবনের তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল ; মন ভরল না, সে কেঁদে বলল, 'জীবন ব্যর্থ হল— এমন একটি এককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পারি, দ্বিধা-সংশয়ের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে পারি।' ক্ষণে ক্ষণে এ মানুষকে ও মানুষকে আশ্রয় করলুম ; কিন্তু, জীবনের সেই-সব প্রেমের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলিকে ভরে তুলবে কেমন করে। কোন্ মাধুর্যের প্লাবনে ছেদগুলো সব ভরে যাবে। এমন একের কাছে আপনাকে নিবেদন করি নি বলেই এত বেদনা পাচ্ছি। তিনি যে আমার প্রিয়তম এই কথাটা জানলুম না বলেই এত দুঃখ আমার। তিনি সত্যই প্রিয়তম বলেই যা পাচ্ছি তারই মধ্যে দুঃখ রয়ে যাচ্ছে, তাতে প্রেম চরিতার্থ হচ্ছে কই। আমরা সব সন্ধানের মধ্যে এককেই খুঁজছি, এমন কিছুকে খুঁজছি যা সব বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দেবে। জ্ঞান কি জোড়া দিতে পারে। জ্ঞান একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুকে একবার মিলিয়ে দেখে, একবার বিশ্লেষ করে দেখে।

বিরোধটাকে মেটাতে পারে প্রেম, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে প্রেম। বৈচিত্র্যের এই মরুভূমির মধ্যে আমাদের তৃষ্ণা কেবলই বেড়ে উঠতে থাকে ; জ্ঞান সেই বৈচিত্র্যের অন্তহীন সূত্রকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে মারবে— সে তৃষ্ণা মেটাবে কেমন করে। সেই প্রেম না জাগা পর্যন্ত কী ঘোরাটাই ঘুরতে হয় ! একবার ভাবি ধনী হই, ধনে বিচ্ছিন্নতা ভরে দেবে, সোনায় রুপোয় সব পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু, সোনায় রুপোয় সে ফাঁক কি ভরতে পারে। খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মানুষের উপরে প্রভাববিস্তার, কিছু দিয়েই সে ফাঁক ভরে না। প্রেমে সব ফাঁক ভরে যায়, সব বৈচিত্র্য মিলে যায়। মানুষ যে তার সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে কেবলই সেই প্রেমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে— সত্যই যে তার প্রিয়তম। সত্য যদি প্রিয়তম না হবেন তবে তাঁর বিরহে মানুষ কি এমন করে লুটিয়ে পড়ত। যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে যায় সে যখন শূন্য হয়ে যায় তখন মানুষের সেই বেদনার মতো বেদনা আর কী আছে। মানুষ তাই একান্তমনে এই কামনাই করছে : আমার সকল প্রেমের মধ্যে সেই একের প্রেমরস বর্ষিত হোক, আমার সব রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে পাত্রের মতো করে তাঁর প্রেমের অমৃতে পূর্ণ করে মানুষ পান করতে চায়। অন্তরাত্মার এই কামনা, এই সাধনা, এই ক্রন্দন। কিন্তু অহমের কোলাহলে এ কান্না তার নিজের কানেই পৌঁচচ্ছে না। প্রতিবারেই সে মনে করছে, 'বড্ড ঠকেছি, আর ঠকা নয়, এবার যা চাচ্ছি তাতেই আমার সব অভাব ভরে যাবে।' হায় রে, সে অভাব কি আর-কিছুতে ভরে ! এমন মোহান্ধ কেউ নেই যার আত্মা পরম বিরহে এই বলে কাঁদছে না 'প্রিয়তম জাগলেন না'। ফুলের মালা টাঙানো হয়েছে, বাতি জ্বালানো হয়েছে, সব আয়োজন পূর্ণ, শুধু তাঁকে ডাকলুম না— তাঁকে জাগালুম না।

যেখানে তিনি পিতামাতা সেখানে তিনি অন্নপান দিচ্ছেন, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখছেন। মায়ের ভাণ্ডার তো খোলা রয়েছে ; ধরণীর ভোজে মা পরিবেশন করছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে সব দিচ্ছেন। সেখানে কোনো বাধা নেই। কিন্তু, যখন জগতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি এত সৌন্দর্য কেন, এত ফুল ফুটল কেন, আকাশে এত তারার প্রদীপ জ্বলল কেন, জীবনে মাঝে মাঝে বসন্তের দক্ষিনে হাওয়া যৌবনের মর্মরধ্বনি জাগিয়ে তোলে কেন, তখন বুঝি যে প্রিয়তম জাগলেন না— তাঁরই জাগার অপেক্ষায় যে এত আয়োজন।

তাই আমি আমার অন্তরাত্মাকে যা-কিছু এনে দিচ্ছি সে সব পরিহার করছে। সে বলছে, 'এ নয়, এ নয়, এ নয়— আমি আমার প্রিয়তমকে চাই।' আমি তাঁকে না পেয়েই তো পাপে লুটোচ্ছি, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার এই দাহ সহ্য করছি, আমি চারি দিকে আমার অশান্ত প্রবৃত্তি নিয়ে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছি। যাঁকে পেলে সব মিলবে তাঁকে পাওয়া হয় নি বলেই এত আঘাত দিচ্ছি। যদি তাঁকে পেতুম বলতুম, 'আমার হয়ে গেছে। আমার দিনের পর দিন, জীবনের পর জীবন ভরে গেল।'

সমস্ত সৌন্দর্যের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্যের ভিতরে যেদিন সেই মধুরকে পেলুম, সেদিন আমার মাধুর্যের পরিচয় দেব কিসে। মাধুর্যে বিগলিত হয়ে কি পরিচয় দেব। না। মাধুর্যের পরিচয় মাধুর্যে নয়, মাধুর্যের পরিচয় বীর্যে। সেদিন মৃত্যুকে স্বীকার করে পরিচয় দেব। বলব, 'প্রিয়তম হে, মরব তোমার জন্য। আমার আর শোক নেই, ক্ষুদ্রতা নেই, ক্ষতি নেই। প্রাণের মায়া আর আমার রইল না— বলো-না তুমি, প্রাণকে তোমার কোন্ কাজে দিতে হবে।' তোমাকে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে বেড়াব তা নয়, কেবল মধুর রসের গান করব তা নয় গো। যেদিন বলতে পারব 'যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর পরম সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন' সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে চলে যাব। সেদিন জানব যে কর্মে কোনো ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোনো বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তার সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেঁকে না— জগৎ ভরা আনন্দ যেদিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে সেদিন মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব সরল হবে, তার কর্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সেদিন মানুষ বীর। সেদিন ইচ্ছা করে সে বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগবেন সে খবর পাব কেমন করে। গান যে বেজে উঠবে। কী গান বাজবে। সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্রবীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে, 'সৌন্দর্যে অভিভূত হব বলে এ

পৃথিবীতে জন্মাই নি, সৌন্দর্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব।' মাধুর্যের প্রকাশ কেবল ললিতকলায় নয়। এই সৌন্দর্যসুধার মধ্যে বীর্যের আগুন রয়েছে ; মানুষ যেদিন এই সৌন্দর্যসুধা পান করবে সেদিন দুঃখের মাথার উপরে সে দাঁড়াবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয়বিষরসের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দরসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহচন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে— সেই বীর্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলই মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করছে— প্রাণের কোথাও বিরাম নেই। অন্তরাত্মা জানে যে, সেই সুধার ধারা জীবন থেকে জীবনান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে বয়েই চলেছে। কত যোগী, কত প্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় সমস্ত জীবনকে ডুবিয়ে অমৃতত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুর পুত্র নও।'

কিন্তু, সে কথায় মানুষের বিশ্বাস হয় না। সে যে বিষয়ের দাসত্ব করছে সেইটেই তার কাছে বাস্তব, আর এ-সব কথা তার কাছে শূন্য ভাবুকতামাত্র। সে তাই এ-সব কথাকে বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, অবিশ্বাস করে। যাঁরা অমৃতের বাণী এনেছেন মানুষ তাই তাঁদের মেরেছে। তাঁরা যেমন মানুষের হাতে মার খেয়েছেন এমন আর কেউ নয়, অথচ তাঁরা তো মলেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে রইল। কারণ, তাঁরাই যে মার খেতে পারেন ; তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারা তাঁরা অমৃতের প্রমাণ করেন। মানুষের দরজায় এসে দাঁড়ালে মানুষ তাঁদের আতিথ্য দেয় নি, আতিথ্য দেবে না ; মানুষ তাঁদের শত্রু বলে জেনেছে। কারণ, আমরা আমাদের যত-কিছু মত বিশ্বাস সমস্ত পাথরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছি, ঐ-সব পাগলকে ঘরে ঢোকালে সে-সমস্ত যে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এই মানুষের মস্ত ভয়। মৃত্যুকে কৌটার মধ্যে পুরে লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, ওরা ঘরে এলে কি আর রক্ষা আছে। লোহার সিন্দুক ভেঙে যে মৃত্যুকে এরা বার করবে।

সেই মৃত্যুকেই তাঁরা মারতে আসেন। তাঁরা মরে প্রমাণ করেন আছে সুধা সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে। নিঃশেষে পরম আনন্দে সেই সুধার পাত্র থেকে তাঁরা পান করেন। তাঁরা প্রিয়তমকে জেনেছেন, প্রিয়তম তাঁদের জীবনে জেগেছেন।

আমাদের গানে তাই আমরা ডাকছি : প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো। কেন না, প্রিয়তম হে, তুমি জাগ নি বলেই মনুষ্যত্ববিকাশ হল না, পৌরুষ পরাহত হয়ে রইল। তোমার কণ্ঠের বিজয়মাল্য দাও পরিয়ে তুমি আমাদের কণ্ঠে, জয়ী করো সংগ্রামে। সংসারের যুদ্ধে পরাভূত হতে দিয়ো না। বাঁচাও, তোমার অমৃতপাত্র আমার মুখে এনে দাও। অপমানের মধ্যে পরাভবের মধ্যে তোমাকে ডাকছি : জাগো, জাগো, জাগো। জাগরণের আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। ১১ মাঘ ১৩২১, সন্ধ্যার উপদেশ।

ফাল্গুন ১৩২১

একটি মন্ত্র

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে পঠিত

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন। সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে। সে কত পূজার অর্ঘ্য কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে। তাই মানুষ অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে কত জাদুমন্ত্র পড়েছে তার ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুকরো টুকরো হয়ে দেখা দিচ্ছে তাদের সমস্তকে অধিকার করে এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে সত্যং। অর্থাৎ, যা-কিছু দেখছি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখি নে কেন। কেননা, সে যে কিছুর সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে যদি হত 'একটি', তা হলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে কোনো একটা জায়গায় দেখতে পেতুম। কিন্তু সে যে হল 'এক', তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ করে দেখবার জো রইল না।

এত বড়ো আবিষ্কার মানুষ আর কোনো দিন করে নি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কী। বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ— তাতে বলছে জগতে কোনো জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করছে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তার পরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয় এ কথা বার বার চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু, যেগুলি মানুষের অমৃতবাণী সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরো বেড়ে চলে। মানুষের সেইরকম একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কিন্তু, মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে। কোথাও কিছুই তো স্থির হয়ে নেই, দেখতে দেখতে এক আর হয়ে উঠছে। আজ আছে বীজ, কাল হল অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই সমস্ত অরণ্য স্লেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজিবিজির মতো কতবার মাটির উপর থেকে মুছে মুছে যাচ্ছে। পাহাড়-পর্বতকে আমরা বলি ধ্রুব ; কিন্তু সেও যেন রঙ্গমঞ্চের পট, এক-এক অঙ্কের পর তাকে কোন্‌ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র সূর্য তারাও যেন আলোকের বুদ্‌বুদের মতো অন্ধকার সমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে ওঠে, আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এইজন্যেই তো সমস্তকে বলি সংসার, আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোন্‌খানে।

সত্যের তো প্রকাশ এমনি করেই, এই চিরচঞ্চলতায়। নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গিও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানাখানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে 'আমি নাচ দেখছি'। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গিই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গিকেই মুখ্য করে দেখছি নে ; আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুশি হয়ে উঠছি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পড়ে থাকে ; কিন্তু যে গাড়ি চলছে তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়তপ্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই, তবেই সে চলে। অর্থাৎ, তার দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার ক'রে, তাদের যুক্ত ক'রে, তাদের অতিক্রম ক'রে যদি সত্য না থাকে তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলই বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বলছে 'সমস্তই স্বপ্ন' নয় বলছে 'সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ— অতি ভীষণ'। সে হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে নয় ভীষণ বিশ্বের দেবতাকে দারুণ উপচারে খুশি করবার আয়োজন করছে। কিন্তু, যে লোক সমস্ত তরঙ্গের ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গির ভিতরকার নাচটি, সমস্ত সুরের ভিতরকার সংগীতটি দেখতে শুনতে পাচ্ছে সেই তো আনন্দের সঙ্গে বলে উঠছে সত্যং। সেই জানে, বৃহৎ ব্যাবসা যখন চলে তখনই বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে দেউলে হয়ে অচল হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনই তা সম্ভব। সংসারের সমস্ত-কিছু চলছে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উলটো কথা। আসল কথা সত্য বলেই সমস্ত চলছে। তাই আমরা চারি দিকেই দেখছি সত্তা আপনাকে স্থির রাখতে পারছে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চলে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন ক'রে। এ তো তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না ; এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখেছি। সত্যের রহস্য সব চেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায় পশুপাখিতে। সত্য যে প্রাণস্বরূপ তা এই পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্রে পত্রে লেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি

একটি বিরাট প্রাণ না থাকত তবে এই জগৎজোড়া লুকোচুরি খেলায় সে তো একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই ঘাসটুকুর মধ্যে আমরা কী দেখছি। যেমন গানের মধ্যে, আমরা তান দেখে থাকি। বৃহৎ অঙ্গের ধ্রুপদ গান চলছে; চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করছে মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক-একটি ছোটো ছোটো তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্যে ঢাকা আছে, ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্পপরিসরে নিখিল সত্যে প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের তত্ত্বটি কী তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বারা তাকে আটেঘাটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সব চেয়ে শক্ত যাকে আমরা সব চেয়ে সহজে বুঝেছি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেইজন্যে তাকে বোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। এক দিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; আর-এক দিকে দেখি সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্তমানকে অতিক্রম করে প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্তে আছে। বস্তুত সেই বর্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্তে না থাকা, এবং বর্তে থাকা, এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ন্যায়শাস্ত্রেই আছে— আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই তো চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে মুক্তি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমাদের কেউ অহল্যার মতো পাথর করে স্থির করে রাখে তবে বুঝি যে সেটা আমাদের অভিশাপ। আবার যদি আমাদের প্রাণের মুহূর্তগুলিকে কেউ চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মতো বর্ষণ করতে থাকে তা হলে সে প্রাণকে আমরা একখানা করে পাই নে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত, যা আপনাকে আপনি কেবল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে, যা অসীমকে সীমায় আকারবদ্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমরা নিখিলের প্রাণরূপে জানতে পারছি। বুঝতে পারছি এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সকলকে অতিক্রম করে আছে বলে বিশ্বসংসার কেবলই চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এইজন্য জগতে স্থিরত্বই হচ্ছে বিনাশ, কেননা স্থিরত্বই হচ্ছে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এইজন্যেই বলা হয়েছে। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ। আর, অপ্রাণ কোথাও নেই? অপ্রাণ আছে, কেননা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সেই অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্রাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা ফেলা একটা বাধায় ঠেকে। কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও এক দিকে বাধা, আর-এক দিকে বাধামোচন। সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয়; সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ; সেই দিকেই সে সমস্তকে মেলাচ্ছে এবং চালাচ্ছে।

যেদিন এই কথাটি আমরা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পেরেছি সেদিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিক্ষার দিন নয়; সেদিন কোনো উচ্ছৃঙ্খল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সেদিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য বলে আনন্দিত হবার দিন।

সেদিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু, সত্যের পূজা তো কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে তো বর পাবার জো নেই। সত্য প্রাণময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বর পাচ্ছে, তার দৈন্য দূর হচ্ছে, তার তেজ বেড়ে উঠছে। কোথায় দেখেছি। যেখানে মানুষের চিত্ত

অচল নয়, যেখানে তার নব নব উদ্‌যোগ, যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি, যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছেঁদে স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে মুক্ত রাখবার জন্যে মানুষ সর্বদাই সচেতন। জ্বালানি কাঠ যখন পূর্ণতেজে জ্বলে না তখন সে ধোঁয়ায় কিংবা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে। তেমনি দেখা গেছে, যে জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলই বাঁধতে চেয়েছে তার সত্য সকল দিক থেকেই ম্লান হয়ে এসে তাকে নির্জীব করে ; কেননা সত্যের ধর্ম জড়ধর্ম নয়, প্রাণধর্ম— চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে তখনই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারি দিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে ; তখন তার রথ পর্বত লঙ্ঘন করে, তার তরণী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সংকটের মধ্যে ঘা পেতে থাকে বটে, কিন্তু নুড়ির ঘা খেয়ে ঝর্নার কলগান যেমন আরো জেগে ওঠে তেমনি ব্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর, যারা মনে করে স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলই জমে ওঠে, নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটাখেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম। নিজের দুর্গতির জন্যে তারা পরকে অপরাধী করতে চায়, এ কথা ভুলে যায় যে যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিল সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কী, তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব। যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারলে না সেইখানে ? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী, তবে কোথায় যাব। যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয় সেইখানে ? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে, সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই— কেননা মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়— যেখানে আজো সে পৌঁছোয় নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়। তার ভিতরকার সত্য তাকে চলার দ্বারাই জানাচ্ছে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

তবেই দেখতে পাচ্ছি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি জানা লেগে আছে। আমাদের যে বিকাশ সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, সে জানার বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান লেগে রয়েছে, সেইজন্যেই মন্ত্রে আছে : সত্যং জ্ঞানং। অর্থাৎ, সত্য যার বাহিরের বিকাশ জ্ঞান তার অন্তরের প্রকাশ। যে সত্য কেবলই হয়ে উঠেছে মাত্র অথচ সেই হয়ে ওঠা আপনাকেও জানছে না, কাউকে কিছু জানাচ্ছেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমনি জ্বলে অমনি যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারে নি বলেই মানুষ বলেছে : সত্যং জ্ঞানং। সত্য সর্বত্র, জ্ঞানও সর্বত্র। সত্য কেবলই জ্ঞানকে ফল দান করছে, জ্ঞান কেবলই সত্যকে সার্থক করছে— এর আর অবধি নেই। এ যদি নাহয় তবে অন্ধ সৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু ; এই তো হল জগৎ। চার দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে ; স্বাভাবিক এই কাজ। অর্থাৎ, আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে ; এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না, যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং

উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত। এইজন্যই গায়ত্রীমন্ত্রে এক দিকে বাহিরের ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং অন্য দিকে অন্তরের ধী উভয়কেই একই পরমশক্তির প্রকাশরূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।

যেমন প্রদীপের মুখের ছোটো শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ, তেমনি আমার জানাও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, 'আমার জ্ঞানের জোরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে।' কিন্তু, এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত তবে এটা জ্ঞানই হত না ; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার করে বলে 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি' ; কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেইজন্যে যেদিন মানুষ বললে সত্যং সেইদিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরে সর্বত্র দেখতে পেলে। যেদিন বললে জ্ঞানং সেইদিন সে বুঝলে যে, সে যা-কিছু জানছে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে সমস্তই একটি বৃহৎ জানার মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এইজন্যই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে, তার শক্তির এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবলই বেড়ে চলবে, কোথাও সে থেমে যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ যাদুমন্ত্র পৌরোহিত্যের শরণ নিতে হবে না। এখন তার প্রার্থনা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা করো, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মীলিত হতে থাক্‌।

আমাদের মন্ত্রের শেষ বাক্যটি হচ্ছে : অনন্তং ব্রহ্ম। মানুষ আপনার সত্যের অনুভবে সত্যকে সর্বত্র দেখছে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্বত্র জানছে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলছে 'অনন্তং ব্রহ্ম'।

কোথায় সেই পরিচয়। আমাদের মধ্যে অনন্ত সেখানেই, যেখানে আমরা আপনাকে দান করে আনন্দ পাই। দানের দ্বারা যেখানে আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতি সেইখানেই আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সীমা, সেখানে আমরা কৃপণ। কিন্তু, দানই যেখানে আমাদের লাভ, ত্যাগই যেখানে আমাদের পুরস্কার, সেখানেই আমরা আমাদের ঐশ্বর্যকে জানি, আমাদের অনন্তকে পাই। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাই নে, সমস্ত উপকরণকে তখন দু হাতে আঁকড়ে ধরি— মনে করি বস্তুপুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড়ো হব। আর, যখনই কোনো বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখনই আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়! তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এইজন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়, আমাদের সমস্ত নিত্যকীর্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই মানুষ বলেছে : ভূমৈব সুখং, ভূমাই আমার সুখ ; ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকেই আমার জানতে হবে ; নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না। এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না ; এইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটো করে জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কারের ধূলিজালে আবৃত সেইখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে কৃপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বলতে, অক্ষম বলতে, লজ্জা বোধ করে না। 'সত্যকে মতে মানি, কাজে করতে পারি নে' এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সংকোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল-অনুষ্ঠানও বাহ্য-আচার-গত হয়ে ওঠে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এইজন্যই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না। সমাজের মধ্যে যখন

সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ 'আনন্দরূপমমৃতং' আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মতো আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে মানুষ অনন্তস্বরূপকে বলেছে 'আত্মদা', তিনি আপনাকে দান করছেন, সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

এইবার আমাদের সমস্ত মন্ত্রটি একবার দেখে নিই : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন ক'রে। তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্যই সত্য গতিমান্। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে, কোনো সীমায় এসে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন, এইজন্যই মন্ত্রের একপ্রান্তে সত্যং আর-এক প্রান্তে অনন্তং ব্রহ্ম— তারই মাঝখানে জ্ঞানং।

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে। কিন্তু, সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই, তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়েরই অতীত, তাঁর মধ্যে রূপ এবং অপরূপ দুইই সংগত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে 'বলদা', তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে ; আবার আত্মদা, সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটে নি— সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ স্বরূপের, অপরূপ মিলন ঘটে গেছে। সত্যং এবং অনন্তং অনির্বচনীয়রূপে পরস্পরের যোগে একই কালে প্রকাশমান হচ্ছে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে, সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দমিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটোর মধ্যে দেখতে পাই। এই রহস্যটি রবিচন্দ্রতারার পর্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে ; এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্যযোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজস্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মা-পরমাত্মার একাত্ম মিলনে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠছে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত চাঞ্চল্যের মর্ম-নিহিত শান্তি ; এই মঙ্গল দ্বন্দ্ববিহীন নির্জীব মঙ্গল নয়, সমস্ত দ্বন্দ্বমন্থনের আলোড়ন-জাত মঙ্গল : এই অদ্বৈত একাকারত্বের অদ্বৈত নয়, সমস্ত বিরোধবিচ্ছেদের সমাধানকারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি 'বলদা আত্মদা' ; সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কেবলই আপনাকে দান করছেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— এই মন্ত্রটি তো কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়, এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

সেই সাধনাটি কী। আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা-বশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।

এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সংকীর্ণ পথেই চালাতে চায়। তখন আমাদের কর্মের মধ্যে শান্তকে পাই নে, আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে শিবের অভাব ঘটে এবং আত্মার মধ্যে অদ্বৈতের আনন্দ থাকে না। কেননা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ; অনন্তের সঙ্গে যোগে তবেই সত্য জ্ঞানময় হয়ে ওঠে, তবেই আমাদের জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। যাদের জীবন বেগে চলছে, অথচ কেবলমাত্র আপনাকেই কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই চলা সেই বলক্রিয়া কলুর বলদের চলার মতো ; তা স্বাভাবিক নয়, তা জ্ঞানময় নয়।

আবার, যারা জীবনের সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অনন্তকে কর্মহীন সন্ন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে কিংবা

ভাবরসের মাদকতায় উপভোগ করতে চায় তাদেরও এই ধ্যানের কিংবা রসের সাধনা বন্ধ্যা। তাদের চেষ্টা হয় শূন্যকেই দোহন করতে থাকে নয় নিজের কল্পনাকেই সফলতা বলে মনে করে। যাদের জীবন সত্যের চিরবিকাশ-পথে চলছে না, কেবল শূন্যতাকে বা রসভোগবিহ্বল নিজের মনটাকেই বারে বারে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই অন্ধ সাধনা হয় জড়ত্ব নয় প্রমত্ততা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই মন্ত্রটিকে যদি গ্রহণ করি তবে আমাদের মনকে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহংকারের ঔদ্ধত্য থেকে নির্মুক্ত করবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করতে হবে— তা না হলে আমাদের কর্মের কলুষ এবং জ্ঞানের বিকার কিছুতেই ঘুচবে না। আমাদের যে অহং আজ মাথা উঁচু করে আমাদের সত্য এবং অনন্তের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়ে অজ্ঞানের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সে যখন প্রেমে বিনম্র হয়ে তার মাথা নত করতে পারবে তখন আমাদের জীবনে সেই অহংই হবে সসীম ও অসীমের মিলনের সেতু ; তখন আমাদের জীবনে তারই সেই নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন সুখদুঃখের চাঞ্চল্য আমাদের অভিভূত করবে তখন এই শান্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মান অপমান তরঙ্গদোলায় আমাদের ক্ষুব্ধ করতে থাকে তখন এই মঙ্গলমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন কল্যাণের আহ্বানে দুর্গম পথে প্রবৃত্ত হবার সময় আসবে তখন এই অভয়মন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন বাধা প্রবল হয়ে উঠে সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে তখন এই শক্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মৃত্যু এসে প্রিয়বিচ্ছেদের ছায়ায় আমাদের জীবনযাত্রার পথকে অন্ধকারময় করে তুলবে তখন এই অমৃতমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমাদের জীবনগত সত্যের সঙ্গে আনন্দময় ব্রহ্মের যোগ পূর্ণ হতে থাক্ ; তা হলেই আমাদের জ্ঞান নির্মল হয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ হতে, মত্ততা হতে, অবসাদ হতে রক্ষা করবে। নদী যখন চলতে থাকে তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসংগীত বাজে, আমাদের জীবন তেমনি প্রতিক্ষণেই মুক্তির পথে সত্য হয়ে চলুক, যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই অমৃতবাণীটি সংগীতের মতো বাজতে থাকে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বরূপে আপনাকে দান করছেন তাঁকে প্রতিদানরূপে আত্মনিবেদন করব, সেই নিত্য মালা-বদলের আনন্দ মন্ত্রটি হোক : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আর আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক—

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

জড়তা হতে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও, মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও।

অবিরাম হোক সেই তোমার নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি। কেননা, তুমি আবিঃ, প্রকাশই তোমার স্বভাব ; বিনাশের মধ্যে তোমার আনন্দ আপনাকে বিলুপ্ত করে না, বিকাশের মধ্যে দিয়ে তোমার আনন্দ আপনাকে বিস্তার করে। তোমার সেই পরমানন্দের বিকাশ আমাদের জীবনে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, আমাদের গৃহে সমাজে দেশে, বাধামুক্ত হয়ে প্রসারিত হোক, জয় হোক তোমার!

১৫ মাঘ ১৩২০

চৈত্র ১৩২০

১৭

উদ্‌বোধন

আজ আমাদের আশ্রমের এই বিশেষ দিনে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হোক। সংসারের মধ্যে আমাদের যে উৎসবের দিন আসে সে দিন অন্য দিন থেকে স্বতন্ত্র, প্রতিদিনের সঙ্গে তার সুর মেলে না। কিন্তু, আমাদের এই উৎসবের দিনের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগ আছে, এ যেন মোতির হারের মাঝখানে হীরার দোলক। যোগ আছে, আবার বিশেষত্বও আছে। কেননা, ঐ বিশেষত্বের জন্যে মানুষের একটু আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষ এক-একদিন প্রতিদিনের জীবন থেকে একটু সরে এসে তার আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়। যেজন্যে আমরা ঘরের অন্নকে একটু দূরে নিয়ে খাবার জন্যে বনভোজনে যাই। প্রত্যহের সামগ্রীকেই তার অভ্যাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু নূতন করে পেতে চাই। তাই আজ আমরা আমাদের আশ্রমের অন্নকে একটু সরে এসে একটু বিশেষ করে ভোগ করবার জন্যে আয়োজন করেছি।

কিন্তু, বনভোজনের আয়োজনে যখন খাদ্যসামগ্রী দূরে এবং একটু বড়ো করে বয়ে নিয়ে যেতে হয় তখন আমাদের ভাঁড়ারের হিসাবটা মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ে যায়। যদি প্রতিদিন অপব্যয় হয়ে থাকে তা হলে সেদিন দেখব টানাটানি পড়ে গেছে।

আজ আমাদের অমৃত-অন্নের বনভোজনের আয়োজনে হয়তো অভাব দেখতে পাব ; যদি পাই, তবে সেই অন্তরের অভাবকে বাইরের কী দিয়েই বা ঢাকা দেব। যারা শহরে থাকে তাদের সাজসরঞ্জামের অভাব নেই, তাই দিয়েই তারা তাদের উৎসবের মানরক্ষা করতে পারে। আমাদের এখানে সে-সমস্ত উদ্‌যোগের পথ বন্ধ। কিন্তু, ভয় নেই। প্রতিদিনই আমাদের আশ্রমের উৎসবের বায়না দেওয়া গেছে। এখানকার শালবনে পাখির বাসায়, এখানকার প্রান্তরের আকাশে বাতাসের খেলার প্রাঙ্গণে, প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের সুর কিছু-না-কিছু জমেছে। কিন্তু প্রতিদিনের অন্যমনস্কতায় সেই রোশনচৌকি ভালো করে প্রাণে পৌঁছয় নি। আজ আমাদের অভ্যাসের জড়তাকে ঠেলে দিয়ে একবার মন দিতে পারলেই হয়, আর-কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে না। চিত্তকে শান্ত করে বসি, অঞ্জলি করে হাত পাতি, তা হলে মধুবনের মধুফল আপনিই হাতে এসে পড়বে। যে আয়োজন চারি দিকে আপনিই হয়ে আছে তাকেই ভোগ করাই যে আমাদের উৎসব। প্রতিদিন ডাকি নি বলেই যাঁকে দেখি নি, আজ মনের সঙ্গে ডাক দিলেই যে তাঁকে দেখতে পাব। বাইরের উত্তেজনায় ধাক্কা দিয়ে মনকে চেতিয়ে তোলা, তাতে আমাদের দরকার নেই। কেননা, তাতে লাভ নেই, বরঞ্চ শক্তির ক্ষয় হয়। গাছের ভিতরের রসে যখন বসন্তের নাড়া পায় তখনই ফুল ফোটে ; সেই ফুলই সত্য। বাইরের উত্তেজনায় যে ক্ষণিক মোহ আনে সে কেবল মরীচিকা ; তাতে যেন না ভুলি। আমাদের ভিতরকার শক্তিকে উদ্‌বোধিত করি। ক্ষণকালের জন্যেও যদি তার সাড়া পাই তখন তার সার্থকতা চিরদিনের। যদি মুহূর্তের জন্যও আমরা সত্য হতে পারি তবে সে সত্য কোনোদিন মরবে না ; সেই অমৃতবীজ চিরকালের মতো আমাদের চিরজীবনের ক্ষেত্রে বোনা হয়ে যাবে। যে পুণ্য হোমাগ্নি বিশ্বের যজ্ঞশালায় চিরদিন জ্বলছে তাতে যদি ঠিকমত করে একবার আমাদের চিত্তপ্রদীপের মুখটুকু ঠেকিয়ে দিতে পারি, তা হলে সেই মুহূর্তেই আমাদের শিখাটুকু ধরে উঠতে পারে।

সত্যের মধ্যে আজ আমাদের জাগরণ সম্পূর্ণ হোক, এই প্রভাতের আলোক আজ আমাদের আবরণ না হোক, আজ চিরজ্যোতি প্রকাশিত হোন, ধরণীর শ্যামল যবনিকা আজ যেন কিছু গোপন না করে— আজ চিরসুন্দর দেখা দিন। শিশু যেমন মাকে সম্পূর্ণরূপে আলিঙ্গন করে তেমনি করেই আজ সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের মিলন হোক। যেমন কবির কাব্য পাঠ করবার সময় তাঁর ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়ে কবির আনন্দের মধ্যে গিয়ে আমাদের চিত্ত উপনীত হয়, তেমনি করে আজ এই শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ নির্মল বিশ্বশোভার অন্তরে সেই বিশ্বের আনন্দকে যেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করি। ৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

মুক্তির দীক্ষা

আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভিতরকার তত্ত্বটি কী তাই আজ আমাদের বিশেষ করে জানবার দিন। যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁরই দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক। আজকের এই উৎসবটি তাঁর জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের উৎসব নয়, তাঁর দীক্ষাদিনের উৎসব। তাঁর এই দীক্ষার কথাই এই আশ্রমের ভিতরকার কথা।

সকলেই জানেন যে, এক সময়ে যখন তিনি যৌবনবয়সে বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর অন্তরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হল। সেই বেদনার আঘাতে চারি দিক থেকে আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। যে সত্যের জন্যে তাঁর হৃদয় লালায়িত হল তাকে তিনি কোথায় পাবেন, তাকে কেমন করে পাবেন, এই ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার চারি দিকে যে-সকল অভ্যাস রয়েছে, যে-সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে, তারই মধ্যে বেশ আরামে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে জাগ্রত না হয়— ততক্ষণ তার এই বেদনাবোধ থাকে না। যেমন, যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোটো খাঁচায় ঘুমোলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। তখন সংকীর্ণ জায়গাতে আর আমাদের কুলোয় না। ধনমান যখন আমাদের বেষ্টন করে থাকে তখন তো আমাদের কোনো অভাব বোধ হয় না। আমরা সংসারে বেশ আরামে আছি এই মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকি। শুধু ধনমান কেন, পুরুষানুক্রমে যে-সব বিধিব্যবস্থা আচারবিচার চলে আসছে তার মধ্যেও নিবিষ্ট থাকলে মনে হয়— এ বেশ, আর নতুন করে কোনো চিন্তা বা চেষ্টা করবার দরকার নেই। কিন্তু, একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে, সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোয় মিশব তা নয়। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়ো আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্‌বোধিত হলে বলে ওঠে : কী হবে আমার এই চিরকালের অভ্যাস নিয়ে, আচার নিয়ে ! এ তো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, এতেই সংসার চলে যাচ্ছে, তা জানি। কিন্তু, এ আমার নয় !— সংসারের পনেরো-আনা লোক যেমন ধনমানে বেষ্টিত হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছে তেমনি যে-সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারও মধ্যে তারা আরামে রয়েছে। কিন্তু, একবার যদি কোনো আঘাতে এই আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় অমনি মনে হয় : এ কী কারাগার ! এ আবরণ তো আশ্রয় নয়।

এক-একজন লোক সংসারে আসেন যাঁদের কোনো আবরণে আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁদের জীবনেই বড়ো বড়ো আঘাত এসে পৌঁছয় আবরণ ভাঙবার জন্যে, এবং তাঁরা সংসারে যাকে অভ্যস্ত আরাম ব'লে লোকে অবলম্বন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকে তাকে কারাগার বলেই নির্দেশ করেন। আজ যাঁর কথা বলছি তাঁর জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পরিবারে ধনমানের অভাব ছিল না, চিরাগত প্রথা সেখানে আচরিত হত। কিন্তু, এক মুহূর্তেই মৃত্যুর আঘাতে তিনি যেমনি জাগলেন অমনি বুঝলেন যে এর মধ্যে শান্তি নেই। তিনি বললেন : আমার পিতাকে আমি জানতে চাই— দশজনের মতো করে তাঁকে জানতে চাই না, তাঁকে জানতে পারি না। সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চেয়েছিলেন ; দশজনের মুখের কথায় শাস্ত্রবাক্যে আচারে-বিচারে তাঁকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেছিলেন। সেই যে তাঁর উদ্‌বোধন, সে প্রত্যক্ষ সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধন ; সেই প্রথমযৌবনের প্রারম্ভে যে তাঁর দীক্ষা-গ্রহণ সে মুক্তির দীক্ষা-গ্রহণ। যেদিন পক্ষীশাবকের পাখা ওঠে সেইদিনই পক্ষীমাতা তাকে উড়তে শেখায়। তেমনি তারই দীক্ষার দরকার যার মুক্তির দরকার। চারি দিকের জড় সংস্কারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন।

তাঁর কাছে সেই মুক্তির দীক্ষা নেব বলেই আমরা আশ্রমে এসেছি। ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বাধীন মুক্ত যোগ সেইটে আমরা এখানে উপলব্ধি করব ; যে-সব কাল্পনিক কৃত্রিম ব্যবধান তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ হতে দিচ্ছে না তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। যেটা কারাগার তার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকাটি যদি সোনার শলাকা হয় তবু সে কারাগার, তার মধ্যে মুক্তি নেই। এখানে আমাদের সকল কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির সেই দীক্ষা নেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সেই দীক্ষাটিই

যে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

তাই আমি বলছি যে, এ আশ্রম— এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানসসরোবরে যেমন পদ্ম বিকশিত হয় তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে ; একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না। সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোনো নামকে পাই না। কতবার কত মহাপুরুষ এসেছেন— তাঁরা মানুষকে এইসব কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু, আমরা সে কথা ভুলে গিয়ে সেই বন্ধনেই জড়াই, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করি। যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পুজো শুরু করে দিই। বলি, 'আমার বিশেষ সম্প্রদায়-ভুক্ত সমাজ-ভুক্ত যে-সকল মানুষ তারাই আমার ধর্মবন্ধু, তারাই আমার আপন।' না, এখানে এ আশ্রমে আমাদের এ কথা বলবার কথা নয়। এখানে এই পাখিরাই আমাদের ধর্মবন্ধু, যে সাঁওতাল বালকেরা আমাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়ত জাগ্রত করছে তারাই আমাদের ধর্মবন্ধু। আমাদের এই আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না। স্বাস্থ্যলাভ করলে, বিদ্যালাভ করলে, মানুষের নাম যেমন বদলায় না, তেমনি ধর্মকে লাভ করলে নাম বদলাবার দরকার নেই। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের সবাইকে কোন্ বড়ো জিনিস দিয়ে গিয়েছেন। কোনো সম্প্রদায় নয়, এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে, দলের পুজো থেকে, আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব— এইজন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে যে-কোনো সমাজ থেকে যেই আসুক-না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ-দেশান্তর দূর-দূরান্তর থেকে যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।

যে মুক্তির বাণী তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গিয়েছিলেন তাকেই আমরা গ্রহণ করব ; সেই তাঁর দীক্ষামন্ত্রটি ; ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো। সেই মন্ত্রে তাঁর মন উতলা হয়েছিল। সর্বত্র সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন। কোনো সম্প্রদায় বলতে পারবে না যে, সে সত্যকে শেষ করে পেয়েছে। কালে কালে সত্যের নব নব প্রকাশ। এখানে দিনে দিনে আমাদের জীবন সেই সত্যের মধ্যে নূতন নূতন বিকাশ লাভ করবে, এই আমাদের আশা। আমরা এই মুক্তির সরোবরে স্নান করে আনন্দিত হই, সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আনন্দিত হই। ৭ পৌষ ১৩২০, প্রাতঃকাল।

মাঘ ১৩২০

প্রতীক্ষা

কতদিন নিভৃতে এখানে তাঁর নাম শুনেছি। আজ এই জনকোলাহলে তাঁরই নাম ধ্বনিত হচ্ছে, অস্ফুট কলোচ্ছ্বাসে এই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকাশকে মুখরিত করে তুলছে। এই কোলাহলের ধ্বনি তাঁকে চারি দিকে বেষ্টন করে উঠেছে। আজ অন্তরে অন্তরে জাগ্রত হয়ে অন্তর্যামীকে বিরলে স্মরণ করবার দিন নয় ; সংসারতরণীর কর্ণধার হয়ে যিনি সবাইকে নিয়ে চলেছেন আজ তাঁকে দেখবার দিন। অন্যদিন আকাশের গ্রহ-তারাকে বল্গার দ্বারা সংযত করে বিচিত্র বিশ্বরথকে একাকী সেই সারথি নিয়ে গেছেন— রথচক্রের শব্দ ওঠে নি, রাত্রির বিরামের কিছুমাত্র ব্যাঘাত করে নি। আজ নিদ্রা দূর হয়েছে, পাখিরা কুলায়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এই কোলাহলে যিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' তিনি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। কোলাহলের মর্মে যেখানে নিস্তব্ধ তাঁর আসন আজ আমরা সেইখানেই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য চিত্তকে উদ্‌বোধিত করি।

আমাদের উৎসবদেবতা কোলাহল নিরস্ত করেন নি, তিনি মানা করেন নি। তাঁর পূজা তিনি সব-শেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন, কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন, যাতে লোকে তাঁকে না মেনে থাকতে না পারে। কিন্তু, যিনি রাজার রাজা তাঁর কোনো আয়োজন নেই। তাঁকে যে ভুলে থাকে সে থাকুক ; তাঁর কোনো তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে, সেই তাঁর পূজা করুক— এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেননা, তাঁর কাছে কোনো ভয় নেই। বিশ্বের আর-সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মানতে হয়। আগুনে হাত দিতে ভয় পাই, কেননা জানি যে হাত পুড়বেই। কিন্তু, কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোনো ভয় নেই। তিনি বলেছেন, 'আমাকে ভয় না করলেও তোমার কোনো ক্ষতি নেই।' এই-যে আজ এত লোকসমাগম হয়েছে, কে তার চিত্তকে স্থির করেছে। তিনি কি দেখছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু, তাঁর শাসন নেই। যাঁদের পদমর্যাদা আছে, রাজপুরুষদের কাছে সম্মান আছে, এমন লোক আজ এখানে এসেছেন। যাঁরা জ্ঞানের অভিমানে মত্ত হয়ে তাঁকে বিশ্বাস করেন না এমন লোক এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু, তাঁর বসুন্ধরার ধৈর্য তাঁদের ধারণ করে রয়েছে, আকাশের জ্যোতির এক কণাও তাঁদের জন্য কমে নি— সব ঠিক সমান রয়েছে। তাঁর এই ইচ্ছা যে তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু নেবেন না। তাঁর প্রহরীদের কত ঘুষ দিচ্ছি, তারা কত শাসন করছে, কিন্তু বিশ্বমন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে আর আমাদের মনে ভয় জেগে উঠছে যে, পরকালে গিয়ে বুঝি এখানকার কাজের হিসাব দিতে হবে। না, সে ভয় একেবারেই সত্য নয়। তিনি যে কোনোদিন আমাদের শাস্তি দেবেন তা নয়। তিনি এমনি করে অপেক্ষা করে থাকবেন। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে সেই কুঁড়ি ফুটবে। যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পূজার অর্ঘ্য ভরছে না— তারই জন্য তিনি যুগ যুগান্তর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন। এমনি নির্ভয়ে যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে, এতেও তিনি ধৈর্য ধরে বসে আছেন। এতে তাঁর কোনোই ক্ষতি নেই।

কিন্তু, এতে কার ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে মানবাত্মার। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদমর্যাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। বিষয়ী লোকের, জ্ঞানাভিমানী লোকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তার। কবে শুভদিন হবে, কবে মোহরাত্রির অবসান হবে, কবে আনন্দে বিহঙ্গেরা গান ধরবে, কবে অর্ঘ্য ভরে উঠবে ! এই-যে বিশাল বসুন্ধরায় আমরা জন্মলাভ করেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে, কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব ! সেই সার্থকতার জন্যই যে তৃষিত হয়ে অন্তরাত্মা বসে আছে। কিন্তু, ভয় নেই, কোথাও কোনো ভয় নেই। কারণ, যদি ভয়ের কারণ থাকত তবে তিনি উদ্‌বোধিত করতেন। তিনি বলছেন, 'আমি তো জোর করে চাই নে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙবে।' ইচ্ছা ক'রে তাঁর কাছে আসতে হবে, এইজন্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বলব, 'আমার হল না, আমার হৃদয় ভরল না।' যেদিন সত্য করে চাইব সেদিন জননী কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু, এ ভুল তবে রয়েছে কেন। আমাদের এই ভুলের মধ্যেই যে তাঁর উপাসনা হচ্ছে। এরই মধ্যে যিনি সাধক তিনি তাঁর সাধনা নিয়ে রয়েছেন। যাঁদের উপরে তাঁর ডাক গিয়ে পৌঁচেছে সেই-সকল ভক্ত তাঁর অঙ্গনের কোণে বসে তাঁকে ধ্যান করছেন, তাঁকে ছাড়া তাঁদের সুখ নেই। এ যদি সত্য না হত তা হলে কি পৃথিবীতে তাঁর নাম থাকত। তা হলে অন্য কথাই সকলের মনের মধ্যে জাগ্রত, তারই কোলাহলে সমস্ত সংসার উত্ত্যক্ত হয়ে উঠত। ভক্তের হৃদয়ের আনন্দজ্যোতির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নিয়ত যোগ হচ্ছেই। এই জনপ্রবাহের ধ্বনির মাঝখানে, এই-সমস্ত ক্ষণস্থায়ী কল্লোলের মধ্য থেকে, মানবাত্মার অমর বাণী জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের চিরদিনের সাধনার প্রবাহকে সেই বাণী প্রবাহিত করে দিচ্ছে ; অতল পঙ্কের মধ্য থেকে পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠছে ; কোথা থেকে হঠাৎ বসন্তসমীরণ আসে, যখন এসে হৃদয়ের মধ্যে বয় তখন আমাদের অন্তরে পূজার পুষ্প ফুটব-ফুটব করে ওঠে। তাই দেখছি যে যদিচ এত অবহেলা, এত দ্বেষবিদ্বেষ, চারি দিকে এত উন্মত্ততা, তথাপি মানবাত্মা জাগ্রত আছে। কারণ, মানবের ধর্মই তাঁকে চিন্তা করা। মানবের ধর্ম যে তার চৈতন্যকে কেবল সংসারে বিলুপ্ত করে দেবে তা নয়। সে যে কেবলই জেগে জেগে উঠছে। যারা নিদ্রিত ছিল তারা হঠাৎ জেগে দেখছে যে এই অনন্ত আকাশে তাঁর আরতির দীপ

জ্বলেছে, সমস্ত বিশ্ব তাঁর বন্দনাগান করছে। এতেও কি মানুষের দুটি হাত জোড় হবে না। তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবের অন্তরের মধ্যে তপস্বীদের কণ্ঠে স্তবগান উঠছে। অনন্তদেবের প্রাঙ্গণে সেই স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, শোনো একবার শোনো ; সমস্ত মানবের ভিতরে, মানবের নিভৃত কন্দরে, যেখানে ভক্ত বসে রয়েছেন সেইখানে তাঁর কী বন্দনাধ্বনি উঠছে শোনো। এই অর্থহীন নিখিল মানবের কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই একটি চিরন্তন বাণী কালে কালে যুগে যুগে জাগ্রত। তাকে বহন করবার জন্য বরপুত্রগণ আগে আগে চলেছেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছেন। সে আজ নয়। আমরা অনন্ত পথের পথিক, আমরা যে কত যুগ ধরে চলেছি! যাঁরা গাচ্ছেন তাঁদের গান আমাদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাই যদি না পৌঁছয় তবে কী নিয়ে আমরা থাকব। দিনের পর দিন কি এমনি করেই চলে যাবে। এই কাড়াকাড়ি মারামারি উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে কী জীবন কাটবে। এইজন্যেই কি জন্মেছিলুম। জীবনের পথে কি এইজন্যেই আমাদের চলতে বলা হয়েছে। এই-যে সংসারে জন্মেছি, চলেছি, এখানে কত প্রেম কত আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে তা কি আমরা দেখছি না। কেবলই কি দেখব পদমর্যাদা, টাকাকড়ি, বিষয়বিভব। আর-কিছুই নয়? যিনি সকল মানবের বিধাতা একবার তাঁর কাছে দাঁড়াবার কি ক্ষণমাত্র অবকাশ হবে না। পৃথিবীর এই মহাতীর্থে সেই জনগণের অধিনায়ককে কি প্রণাম নিবেদন করে যাব না।

কিন্তু, ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি অন্যমনস্ক হয়ে আছি, তবু বলা যায় না— শুভক্ষণ যে কখন আসে তা বলা যায় না। তাই তো এখানে আসি। কী জানি যদি মন ফিরে যায়। তিনি যে ডাক ডাকছেন, তাঁর প্রেমের ডাক, যদি শুভক্ষণ আসে— যদি শুনতে পাই। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি। এই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই আমার জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলে নি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে। আমাদের সত্য প্রার্থনা, যা চিরদিন অন্তরের এক প্রান্তে অপেক্ষা করে রয়েছে, সেই প্রার্থনা আজ জাগুক : অসতো মা সদ্‌গময়। সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যাজাল ছিন্ন করে দাও। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক। ৭ পৌষ ১৩২০, রাত্রি

মাঘ ১৩২০

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান

স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন, যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা জড়িত নয় বলে আমার কবিতা পড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে। তার কারণ, খৃস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে ; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেইজন্য ফরাসীস্ বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্মকে আঘাত দেবার উদ্যম সেখানকার বুদ্ধিমান লোকদের পেয়ে বসেছে। অথচ ধর্মকে আঘাতমাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন করে! তাতে কিছুদিনের মতো মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনোই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবি জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন সেদিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলা যখন

প্রবল হয়ে ওঠে তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয় ; নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়। যেমন ধরো, আমাদের দেশে চার্বাক প্রভৃতির সময়ে একটা আন্দোলন জেগেছিল। কিন্তু, এখন লড়াই করবার প্রবৃত্তিই যে মানুষের নেই। এখন অন্ধ সংস্কারগুলি প্রায়ই পরাভূত হয়ে গিয়েছে। কাজেই লড়াই নিয়ে আর মানুষের মন ব্যাপৃত থাকতে পারছে না। বিশ্বাসের যে একটা মূল চাই, সংসারে যা-কিছু ঘটছে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিলে চলে না— এ প্রয়োজনবোধ মানুষের ভিতরে জেগেছে। ইউরোপের লোকেরা ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে ; যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ও দেশের লোকেরা মনে করছে যে, ঐ-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলে ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে। ঐ-সব ভূতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে ধর্মের সত্যকে তারা খুঁজছে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকের কথাবার্তা হয়েছে। আমি এই কথাই বলেছি যে, বিশ্বব্যাপারে তোমরা যদি বিশ্বাসের মূল না পাও তবে অন্য-কিছুতে এমনই কী ভিত্তি পাবে। নূতন জিনিস কিছু পেলেই মনকে তা আলোড়িত করে। একজন ইংরেজ কবি একদিন আমাকে বললেন যে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেডিয়মের আবিষ্কারে তাঁর বিশ্বাসকে ফিরিয়েছে। তার মানে, ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে, যেমন চোখ দিয়ে বাহ্যব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি তেমনি একটা অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়— তা হলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম্‌স্‌ প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে মিস্টিক বলে যাঁরা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন ; তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড়ো আশ্চর্য।

এই প্রসঙ্গের উপলক্ষে স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো-একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্বদেশের সর্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগ্‌মা' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন। বললেন, তোমরা খুব বেঁচে গেছ। ডগ্‌মার কোনো অংশ না টিকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। সে বড়ো বিপদ। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই ; তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

পূর্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেইজন্য খৃস্টান অত্যন্ত খৃস্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। এক-এক জাতি নিজের ধর্মকে আয়রন্‌চেস্টে সীলমোহর দিয়ে রেখেছে। কিন্তু, মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সবরকম সাহিত্যরস সবাই নিজের বলে ভোগ করবে এইটি হয়ে উঠছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি পরম ধন, ধর্ম, সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারকে রোধ করে রেখেছে, বিশেষ পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেই-সব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমদেশে যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক। সেই যাঁরা পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকও একজন। খৃস্টধর্ম যেখানে সংকীর্ণ সেখানে ব্রুক তাকে মানেন নি। তাঁর 'অন্‌ওঅর্ড ক্রাই' -নামক নূতন বইটির প্রথম উপদেশটি পাঠ করলেই সেটা বোঝা যাবে।

আজকের ৭ই পৌষের উৎসবের সঙ্গে সেই উপদেশের যোগ আছে।

তিনি Revelation-এর চতুর্থ অধ্যায় থেকে এই শ্লোকটি তাঁর উপদেশের বিষয় করে নিয়েছেন—

After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven : and the first voice I heard was as it were a trumpet talking with me ; which said : Come up hither and I will show thee things that shall be hereafter.

তাঁর উপদেশের ভিতরকার কথা হচ্ছে এই : বরাবর এই কথা আছে 'তুমি এসো আরো কিছু দেখাবার আছে' ; এই বাণী বরাবর মানুষ শুনে আসছে। আমাদের কোনো জায়গায় ঈশ্বর বদ্ধ থাকতে দেবেন না। জ্ঞানে ভাবে কর্মে সমাজে সকল দিকে স্বর্গ থেকে, উপর থেকে, ডাক আসছে : তোমরা চলে এসো, তোমরা বসে থাকতে পারবে না। ইহলোকের মধ্যেই সেই hereafter, সেই পরে যা হবে, তার ডাক মানুষ শুনেছে বলেই তার সমাজে উন্নতি হচ্ছে, তার জ্ঞান প্রসার লাভ করছে। পশু এ ডাক শোনে না— তাকে কেউ বলে না যে, তুমি যা দেখছ যা পাচ্ছ তাই শুধু নয়— আরো অনেক বাকি আছে। মানুষেরই এই একটি বিশেষ গৌরবের জিনিস যে, মানুষকে ঈশ্বর স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দিলেন না। যেখানে তার বদ্ধতা, তার সংকীর্ণতা, সেখানে ক্রমাগতই আহ্বান আসছে ; আরো কিছু আছে, আরো আছে। যা হয়েছে তা হয়েছে এ বলে যদি দাঁড়াই, যদি সেই 'আরো আছে'র ডাককে অমান্য করি, তা হলে মানুষের ধর্মের পতন। যদি তাকে জ্ঞানে অমান্য করি তা হলে মানুষের মূঢ়তায় পতন। যদি সমাজে অমান্য করি তা হলে জড়তায় পতন। কালে কালে মহাপুরুষেরা কী দেখান। তাঁরা দেখান যে, তোমরা যাকে ধর্ম বলে ধরে রয়েছ ধর্ম তার মধ্যে পর্যাপ্ত নন। মানুষকে মহাপুরুষেরা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন ; তাঁরা বলেন : চলতে হবে। কিন্তু, মানুষ তাঁদেরই আশ্রয় করে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে যায়, আর চলতে চায় না। মহাপুরুষেরা যে পর্যন্ত গিয়েছেন তারও বেশি তাঁদের অনুপন্থীরা যাবেন, এই তো তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু, তারা তাঁদের বাক্য গলায় বেঁধে আত্মহত্যা সাধন করে। মহাপুরুষদের পথ হচ্ছে পথ, কেবলমাত্র পথ। তাঁরা সেই পথে চলেছিলেন এইটেই সত্য। সুতরাং পথে বসলে গম্যস্থানকে পাব না, পথে চললেই পাব। উপরের থেকে সেই চলবার ডাকটিই আসছে। সেই বাণীই বলছে : তুমি বসে থেকে কিছু পাবে না ; চলো, আরো চলো ; আরো আছে, আরো আছে। মানুষের ধর্ম চলছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধর্ম আমাদের কোনো সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাখি যেমন আকাশে ওড়ে এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না, তেমনি আমরা অনন্তের মধ্যে যে অবাধ গতি রয়েছে তাতেই চলতে থাকব। পাখি পিঞ্জরের মধ্যে ছট্‌ফট্ করে তার কারণ এ নয় যে, সে তার প্রয়োজন সেখানে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকেই পাচ্ছে না। মানুষেরও তাই চাই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার, অনন্তের আনন্দকে পাওয়া। মানুষ যেখানে ধর্মকে বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ করেছে সেখানে যে ধর্ম তাকে মুক্তি দেবে সেই ধর্মই তার বন্ধন হয়েছে। য়ুরোপে ধর্ম যেখানে তাকে বেঁধেছে সেইখানেই মুক্তির জন্য য়ুরোপ ক্রন্দন করছে। onward cry মানুষের cry।

আজকে যাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিকে আমরা এসেছি তিনি onward cry শুনতে পেয়েছিলেন। যে সময়ে আমাদের দেশে ধর্মকে সমাজকে চারি দিক থেকে নানা আচার ও প্রথার বন্ধনে বেঁধেছিল, তাকে সংকীর্ণ করে রুদ্ধ করে রেখেছিল, সেই সময়ে তিনি এই আহ্বান শুনে জেগে উঠলেন। চারি দিকের এই রুদ্ধতা, এই বেড়াগুলো, তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। তিনি যখন আকাশে উড়তে চেয়েছিলেন তখন পিঞ্জরের প্রত্যেকটি শলাকা তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি জীবনকে প্রতিদিন অগ্রসর করবেন, প্রতিদিন অনন্তের আস্বাদ আপনার ভিতর থেকে পাবেন, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা সেদিনকার সমাজে বড়োই দুর্লভ ছিল। সকলেই নিজ নিজ প্রচলিত অভ্যাসে তৃপ্ত ছিল। এই ৭ই পৌষের দিন তিনি তাঁর দীক্ষার আহ্বান শুনেছিলেন, সে আহ্বান এই মন্ত্রটি : ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো। এই আহ্বান, এই দীক্ষামন্ত্রই তো এই আশ্রমের মধ্যে রয়েছে। উপনিষদের এই মন্ত্র, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে না। এ বাণী দেশে দেশান্তরে নির্ঝরধারার মতো যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলতে থাকবে : দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো।

সেইজন্য আজ আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, মহর্ষির জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সমাজে হয় নি, তা এই আশ্রমে হয়েছিল। বিশেষ সমাজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সেইখানেই তাঁর চিরজীবনের সাধনা তার বিশেষ সার্থকতা লাভ করে নি ; এই আশ্রমের মধ্যেই তার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'আরো'র দিকে চলো : সেই ডাক তিনি শুনে বেরিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ডাকটি সেই মন্ত্রটি তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন : এসো, এসো, আরো পাবে। অনন্তস্বরূপের ভাণ্ডার যদি উন্মুক্ত হয় তবে তার আর সীমা কোথায় ! তাই আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা যেন সেই পথে তাঁর অনুসরণ করি যে পথ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন। জ্ঞানে প্রেমে ধর্মে সকল দিকে যেন মুক্তির পথেই ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকি। এ কথা ভুলবার নয় যে, এ আশ্রম সম্প্রদায়ের স্থান নয়, এখানে সমস্ত বিশ্বের আমরা পরিচয় পাব। এখানে সকল জাতির সকল দেশের লোক সমাগত হবে। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রকে, সমস্তকে ঈশ্বরের মধ্যে দেখার মন্ত্রকে, আমরা কোথাও সংকোচ করব না। আমাদের অগ্রসরের পথ যেন কোনোমতেই বন্ধ না হয়। দ্বিপ্রহর।
৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

মা মা হিংসীঃ

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই-যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে এসেছে 'মা মা হিংসীঃ : আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো'— এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যে শারীরিক মৃত্যু তার নিশ্চিত ঘটবে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক প্রার্থনা করে তার কোনো লাভ নেই। সে জানে মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত সত্য আর নেই, দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন-না-একদিন ঘটবেই। এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু, সে যখন বলেছে 'আমাকে বিনাশ কোরো না', তখন সে যে কী বলতে চেয়েছে তা তার অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এমন যদি হত যে তার শরীর চিরকাল বাঁচত, তা হলেও সেই বিনাশ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কারণ, সে যে প্রতি মুহূর্তের বিনাশ। সে যে কত রকমের মৃত্যু একটার পর একটা আমাদের জীবনের উপরে আসছে। ক্ষুদ্র কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখদুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে যে প্রতিদিনই আমরা মরছি। যে গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তারই মধ্যে জীবন কত মরা মরছে, কত প্রেম কত বন্ধুত্ব মরছে, কত ইচ্ছা কত আশা মরছে— এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের মধ্যে এই মৃত্যুর ব্যথা যে আমাদের ভোগ করতে হয় তার কারণ হচ্ছে, আমরা দুই জায়গায় আছি। আমরা তাঁর মধ্যেও আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আমাদের এক দিকে অনন্ত, অন্য দিকে সান্ত। সেইজন্য মানুষ এই কথাই ভাবছে কী করলে এই দুই দিককেই সে সত্য করতে পারে। আমাদের এই সংসারের পিতা, যিনি এই পার্থিব জীবনের সূত্রপাত করে দিয়েছেন, তাঁকে শুধু পিতা বলে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই। কারণ, আমরা যে জানি যে, এই শারীরিক জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে। আমরা তাই সেই আর-একজন পিতাকে ডাকছি যিনি কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের নয়, কিন্তু চিরজীবনের পিতা। তাঁর কাছে গেলে মৃত্যুর মধ্যে বাস করেও আমরা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারি, এই আশ্বাস কেমন করে যেন আমরা আমাদের ভিতর থেকেই পেয়েছি। এইজন্যই পথ চলতে চলতে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে উপরের দিকে তাকায়। এইজন্যই সংসারের সুখভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে তার অন্তরের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে এবং তখন ইচ্ছাপূর্বক সে পরম দুঃখকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেন। কারণ, সে বুঝতে পারে মানুষের মধ্যে কতবড়ো সত্য রয়েছে, কতবড়ো চেতনা রয়েছে, কতবড়ো শক্তি রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মরছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত, তার উপর আসবেই আসবে—

কে তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু, যেমনি সে তার সমস্ত দুঃখ-আঘাতের মধ্যে সেই অমৃতলোকের আশ্বাস পায় অমনি তার এই প্রার্থনা আর-সকল প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে ওঠে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে বাঁচাও বাঁচাও, প্রতিদিনের হাত থেকে, ছোটোর হাতের মার থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বড়ো— আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার হাত থেকে নিয়ে যাও। তোমার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে আমার জীবন যেতে চাচ্ছে। আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে প্রতিদিন আপনার অহমিকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমার কোনো আনন্দ নেই। মা মা হিংসীঃ। আমাকে বিনাশ থেকে বাঁচাও।

যে প্রেমের মধ্যে সমস্ত জগতে মানুষ আপনার সত্য স্থানটিকে পায়, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই পরম প্রেমটিকে না পেলে মানুষকে কে বেদনা ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তখন তার উপর আঘাত নানা দিক থেকে ক্রমাগতই আসবে, পাপের দহন তাকে দগ্ধ করে মারবে। এইজন্যই সংসারের ডাকের উপর আর-একটি ডাক জেগে আছে : তোমার ভিতর দিয়ে সমস্ত সংসারের সঙ্গে যে আমার নিত্য সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে আমায় বাঁধো, তা হলেই মৃত্যুর ভিতর থেকে আমি অমৃতে উত্তীর্ণ হতে পারব।

পিতা নো বোধি। পিতা, তুমি বোধ দাও। তোমাকে স্মরণ করে মনকে আমরা নম্র করি। প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা আমাদের ঔদ্ধত্যে নিয়ে যায়, তোমার চরণতলে আপনাকে একবার সম্পূর্ণ ভুলি। এই ক্ষুদ্র আমার সীমায় আমি বড়ো হয়ে উঠছি এবং পদে পদে অন্যকে আঘাত করছি ; আমাকে পরাভূত করো তোমার প্রেমে। এই মৃত্যুর মধ্যে আমাকে রেখো না, হে পরম লোকের পিতা, প্রেমেতে ভক্তিতে অবনত হয়ে তোমাকে নমস্কার করি এবং সেই নমস্কারের দ্বারা রক্ষা পাই। তা না হলে দুঃখ পেতেই হবে, বাসনার অভিঘাত সহ্য করতেই হবে, অহংকারের পীড়ন প্রতিদিন জীবনকে ভারগ্রস্ত করে তুলবেই তুলবে। যতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্রতার সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছি ততদিন পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে বিকটমূর্তি ধারণ করে চতুর্দিককে বিভীষিকাময় করে তুলবেই তুলবে।

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল! অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। পীস কন্‌ফারেন্‌স্‌, শান্তিস্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে : সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে ; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে : মা মা হিংসীঃ। পিতা, তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কখনো এটা সত্য হতে পারে না যে, মানুষ কেবলমাত্র আপনার ভিতরেই আপনার সার্থকতাকে পাবে। তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকলের পিতা, এই কথা বলতেই হবে। এই কথা বলার উপরেই মানুষের পরিত্রাণ। মানুষের পাপের আগুন এই পিতার বোধের দ্বারা নিভবে ; নইলে সে কখনোই নিভবে না, দাবানলের মতো সে ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে হতে সমস্ত ছারখার করে দেবে। কোনো রাজমন্ত্রী কূটকৌশলজাল বিস্তার করে যে সে আগুন নেভাতে পারবে তা নয় ; মার খেতে হবে, মানুষকে মার খেতেই হবে।

মানুষের এই-যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন, যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর তবেই ভালো, আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে। আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে ; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে— আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! এই পাপ এই হিংসা মানুষকে আজ কী প্রচণ্ড মার মারবে— তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে!

আমরা আজ এই পাপের মূর্তি যে কী প্রকাণ্ড তা কি দেখব না। এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এ কথা কি আমরা বুঝব না। আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলছি। এ পাপ কতদিন ধরে জমছে, কত যুগ ধরে জমছে। প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছি নে। বহু শতাব্দী থেকে আমরা কি কেবলই মরছি নে। সেইজন্যই তো এই প্রার্থনা : মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও, এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও। এই-সমস্ত দুঃখশোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্ট হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপরে জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব ; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা বাঁচব। সেইখানে আমাদের মুক্তি দাও।

আজ অপ্রেমঝঞ্ঝার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে, এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই-যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি— সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠেছে : মা মা হিংসীঃ। মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। কে বাঁচাবে। পিতা নোঽসি। তুমি যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাঁচাও। তোমার বোধের দ্বারা বাঁচাও। তোমাকে সকল মানুষ মিলে যেদিন নমস্কার করব সেই দিন নমস্কার সত্য হবে। নইলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নমস্কার করতে হয় সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাও। দেশদেশান্তরে তোমার যত যত সন্তান আছে, হে পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র করো তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। দেশ থেকে দেশান্তরে জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা করো। ২০ শ্রাবণ ১৩২১

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১

পাপের মার্জনা

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময়ে মুখের কথা হয় ; কারণ, চারি দিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছয় না। কিন্তু, ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, এমন এক-একটি দিন আসে যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। তখনই এই কথাটি বার বার জাগ্রত হয় : বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারি না 'আমাদের পাপ ক্ষমা করো' ; কারণ, তিনি ক্ষমা করেন না, তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা : তুমি মার্জনা করো। যেখানে যত-কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারংবার রক্তস্রোতের দ্বারা, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা, সেখানে তিনি মার্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্বলের ভীরুর প্রার্থনা, সে প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছবে না।

আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু-আধটু খবর পাই তার পশ্চাতে কী অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি। যে হানাহানি হচ্ছে তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে।

ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এইজন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর ; কারণ, যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ, সে যদি বেদনা পেত তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয় ; কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক-এক সময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে : যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয় ; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না ; সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না। সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন ; সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ী ছিন্ন হয়ে যাবে। যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে।

তাই বলছি যে সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে যে-একটি পরম বেদনা পরম প্রেম আছেন, তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে। এই কথাটি আজ বিশেষভাবে অনুভব করো।

তাই এ কথা আজ বলবার কথা নয় যে 'অন্যের কর্মের ফল আমি কেন ভোগ করব'। 'হাঁ, আমিই ভোগ করব— আমি নিজে একাকী ভোগ করব' এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি করো, তপস্যা করো, দুঃখকে গ্রহণ করো। তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখে দগ্ধ হয়ে হয়তো মরতে হবে। কারণ, তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে, প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে। ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে : সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই 'যদ্‌ভদ্রং তৎ' যা ভদ্র তাই আসবে। ওরে তপস্বী, দুঃসহ দুর্ভর দুঃখভারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে যাক, তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছোক ! নমস্তেঽস্তু। বলো, পিতা, তুমি যে আছ সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর, সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ দলন করুক। পিতা নো বোধি। আজই তো সেই উদ্‌বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে, পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমোতে দেবে না ; তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত। যেখানে প্রেম আছে জাগুক, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগুক ; সকলে আজ তোমার বোধে উদ্‌বোধিত হয়ে উঠুক। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত করো। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত ; তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো। দুঃখের দ্বারা মার্জনা করো, রক্তস্রোতের দ্বারা মার্জনা করো, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জনা করো।

এই প্রার্থনা, সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা, আজ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক : বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে ; শুচি হতে হবে, সমস্ত

হৃদয়কে মার্জনা করতে হবে। আজ সেই তপস্যার আসনে পূজার আসনে উপবিষ্ট হও। যে পিতা সমস্ত মানবসন্তানের দুঃখ গ্রহণ করছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত নেই, যাঁর প্রেমের বেদনা উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে, তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সেই তাঁর প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি। ৯ ভাদ্র ১৩২১

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১

সৃষ্টির ক্রিয়া

অবকাশের পর আবার আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আর-একবার আমাদের চিন্তা করবার সময় হয়েছে। এখানকার সত্য আহ্বানকে অন্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট করে উপলব্ধি করবার জন্য এবং মনের মধ্যে যেখানে গ্রন্থি রয়েছে, দীনতা রয়েছে, তাকে মোচন করবার জন্য আবার আমাদের ভালো করে প্রস্তুত হতে হবে।

এই শান্তিনিকেতনে যেখানে আমরা সকলে আশ্রয় লাভ করেছি এবং সম্মিলিত হয়েছি, এখানে এই সম্মিলনের ব্যাপারকে কোনো একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করতে পারি নে। বিশ্বের মধ্যে আমাদের জীবনের অন্যান্য যে-সকল সম্ভাবনা ছিল তাদের এড়িয়ে এই এখানে যে আমরা আশ্রয় পেয়েছি এর মধ্যে একটা গভীর অভিপ্রায় রয়েছে। এখানে একটি সৃষ্টি হচ্ছে ; এখানে যারা এসেছে তারা কিছু দিচ্ছে, কিছু নিয়ে যাচ্ছে, এমনি করে ক্রমশ এখানে একটি জীবনের সঞ্চার হচ্ছে। এর মধ্যে নানা ভাঙাগড়ার কাণ্ড চলেছে ; কেউ বা এখানে স্থায়ী, কেউ অস্থায়ী। সুতরাং এই আশ্রমকে বাহির থেকে দেখলে মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয় যে, এ ভাঙাগড়া বুঝি দৈবক্রমে ঘটছে। একটা ঘর তৈরি হবার সময় কত চুন সুরকি মাল মসলার অপব্যয় হয়, চার দিকে এলোমেলো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে সেগুলো পড়ে থাকে। কিন্তু, সমস্ত ঘরটি যখন তৈরি হয়ে ওঠে তখন আদ্যোপান্ত হিসাব পাওয়া যায়। তখন কী অপব্যয় হয়েছিল তাকে কেউ গণনার মধ্যেই আনে না। তেমনি এই আশ্রমের প্রত্যেক মানুষের জীবনের ইতিহাসের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে কেউ বা কিছু পাচ্ছে, কেউ বা কিছুই পায় নি। সে হিসাবে এখানকার সমগ্র সৃষ্টির চেহারা দেখা যায় না। এই-যে এখানে চারি দিক থেকে প্রাণের প্রবাহ আসছে, এ ব্যাপারটাকে আমাদের খুব সত্য ক'রে, খুব বড়ো ক'রে অন্তরের মধ্যে দেখবার শক্তি লাভ করতে হবে। এ একটা বিশ্বের ব্যাপার। কত দিক থেকে প্রাণের ধারা এখানে আসছে এবং কত দিকে দিগন্তরে এখান থেকে পুনরায় বয়ে চলবে— একে আকস্মিক ঘটনা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্বের কোনো ব্যাপারকেই যে আমরা দেখতে পাই নে তার কারণ, আমরা সমস্ত মন দিয়ে দেখি নে। চোখ দিয়ে দেখতে পাই নে, কারণ এ তো চোখ দিয়ে দেখবার জিনিস নয়। একে যে চরিত্র দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাব দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাবের ভিতর দিয়ে দেখতে হয় বলেই স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা দরকার হয়। আমরা এই আশ্রমে যতই উপদেশ দিই এবং যতই উপদেশ পাই-না কেন, এই আশ্রমের ভিতরে যে অমৃত-উৎসটি উঠছে তাকে দেখবার, তার কাছে যাবার শক্তি যে আমাদের সকলের রয়েছে তা নয়। সেই দেখতে পাই না বলেই উপদেশে কিছু হয় না, কথারচনা ব্যর্থ হয়। সেই আনন্দস্বরূপকে দেখলেই আনন্দ যে ভরে উঠবে। সেই আনন্দে যে সমস্ত ত্যাগ সহজ হয়ে যাবে, বিরোধ দূর হবে, সব নির্মল হবে, সকল বাধা কেটে যাবে। আনন্দের লক্ষণ দেখলেই চেনা যায়। যখন দেখি যে আমাদের ভিতরে দুশ্চিন্তা ও দুশ্চেষ্টা থামছে না, অন্যায় ক্ষুদ্রতা মিথ্যা কত কী আমাদের ঘিরে রয়েছে, তখন বুঝতে পারছি যে সেই আনন্দকে দেখবার শক্তি আমাদের হয় নি। তার লক্ষণ আমাদের মধ্যে ফুটছে না।

আপনাকে এবং জগৎকে সত্য করে জানবার ও দেখবার জন্যই মানুষ এই জগতে এসেছে। মানুষও যে-সমস্ত অনুষ্ঠান রচনা করেছে, তার বিদ্যালয়, তার রাজ্যসাম্রাজ্য, নীতিধর্ম, সমস্তেরই মূল কথা এই যে, মানুষ যে যথার্থ কী সেটা মানুষকে প্রকাশ করতে হচ্ছে। মানুষের অনুষ্ঠানে মানুষই বিরাট রূপ ধরে প্রকাশ

পাচ্ছে। সেইজন্য সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতরকার আদর্শ হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। মানুষ নিজেকে যে ছোটো বলে জানছে মানুষের ধর্ম কর্ম তারই প্রতিবাদ করে তাকে বলছে : তুমি ছোটো নও ; তুমি আপনার মধ্যে আপনি বদ্ধ নও ; তুমি সমস্ত জগতের ; তুমি বড়ো, বড়ো, বড়ো।

কিন্তু, মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রবেশ করছে। মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে, এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে ; কত অন্যায়, কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে। মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎরূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎমঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু, সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের তপস্যা এক দিকে, অন্য দিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন— এ দুইই পাশাপাশি রয়েছে।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমেও সেই তপস্যা রয়েছে ; ধর্ম যে কত বড়ো, বিশ্ব যে কত সত্য, মানুষ যে কত বড়ো, এই আশ্রম সে কথা নিয়তই স্মরণ করিয়ে দেবে। এইখানে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ জাতিভেদ ভুলব। আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র ক'রে সংকীর্ণ ক'রে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে, আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব। এত বড়ো আমাদের কাজ। কিন্তু, আমরা একে কেউ বা স্কুলের মতো করে দেখছি। কেউ বা আপনার আপনার ছোটোখাটো চিন্তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। একে আমরা উপলব্ধি করছি নে বলে গোলমাল করতে করতে চলেছি। আপনার সত্য পরিচয় পাচ্ছি নে, এরও যথার্থ পরিচয় পাচ্ছি নে। এই আশ্রমের চারি দিকে যে একটি অনন্তত্ব রয়েছে তাকেই নষ্ট করছি। কেবলই আবর্জনা ফেলছি, আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে। এমনি করে এখানকার স্থান সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। প্রত্যেকের রাগদ্বেষ-মোহমলিনতার দ্বারা এখানকার বাতাস কলুষিত হচ্ছে, আকাশ অবরুদ্ধ হচ্ছে।

আমি অধিক কথা বলতে চাই না। বাক্যের দ্বারা ক্ষণিক উত্তেজনা ও উৎসাহ সঞ্চার করার উপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। আমি জানি প্রত্যেকের জীবন নিজের ভিতর থেকে নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারলে বক্তৃতা বা উপদেশে কোনো ফললাভ হয় না। প্রতি দিনের সাধনায় শক্তিকে জাগ্রত করে তবে আমরা মুক্তি পাব। আমি বৃথা এ আক্ষেপও রাখতে চাই না যে, কিছু হচ্ছে না। শান্তভাবে গম্ভীরভাবে স্তব্ধ হয়ে আমাদের আপনার ভিতরে দেখতে হবে যে, 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' রয়েছেন ; তিনি সত্য, তিনি আমার ভিতরে সত্য, তিনি জগতে সত্য। দেখি কোন্‌খানে বাধছে, কোন্‌খানে জগতের মধ্যে যিনি 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' তাঁর শান্তিতে আমি ব্যাঘাত করছি। এ প্রত্যেককে আলাদা করে নিজের ভিতরে দেখতে হবে। কারণ, প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা স্বতন্ত্র। কার কোন্‌খানে দীনতা ও কৃপণতা তা তো আমরা জানি না। এই মন্দিরে আমাদের যেমন সম্মিলিত উপাসনা হচ্ছে তেমনি আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সাধনা এইখানেই জেগে উঠুক। একবার আমাদের চিত্তকে চিন্তাকে গভীর করে অন্তরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা একবার দেখবার চেষ্টা করি এই আশ্রমের মধ্যে যে সত্যসাধনা রয়েছে সেটি কী। আর-একবার মনকে দিয়ে বলিয়ে নিই ; পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। এ যে কত বড়ো বোধ। সেই বোধের দ্বারা আমাদের দৃষ্টির কলুষ, আমাদের বুদ্ধির জড়তা, আমাদের চৈতন্যের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাক। এ তো কোনো উপদেশের দ্বারা হবার জো নেই। যেমন করে ছোটো অঙ্গার থেকে বৃহৎ অগ্নি জ্বলে উঠতে পারে তেমনি করে এই ছোটো কথাটি থেকে বোধের অগ্নি জ্বলে উঠুক ; দগ্ধ হোক সকল মলিনতা ও সংকীর্ণতা। যদি সমস্ত ইচ্ছাকে জাগ্রত করে আমরা এই সত্যকে গ্রহণ করি তবেই এই বোধ উদ্‌বোধিত হবে, যদি না করি তবে হবে না। মিথ্যার মধ্যে জড়িয়ে আছি— যদি বলি তাই নিয়েই কাটবে, কাটাও, কেউ কোনো বাধা দেবে না। সংসারে কেউ তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। কোনো উপদেশ কোনো উত্তেজনায় ফল হবে না।

মানুষের কণ্ঠে নয়, এই স্তবমন্ত্রের বাণী বিশ্বের কণ্ঠে জেগে উঠুক। এই বাণী জগতে শক্তি প্রয়োগ করুক,

বাতাসে শক্তি প্রয়োগ করুক, আলোকে শক্তি প্রয়োগ করুক। বাধা বিস্তর, আবরণ সুকঠিন জানি। কিন্তু এও জানি যে, মানুষের শক্তির সীমা নেই। দেশে কালে মানুষ অনন্ত, তার সেই অনন্ত মহত্ত্বকে কোনো আবরণ প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। আমি সত্য, আমি সত্য, এই কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ হোক। জাতীয়তার আবরণ, বিশেষ ধর্মের গণ্ডি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, এ সমস্ত থেকে মুক্তিলাভ করি। সেই মুক্তির জন্যই যে এই স্থানটি তৈরি হয়েছে আজ সেই কথা স্মরণ করি। আজ স্থির হয়ে ভাবি যে, প্রতিদিনের জীবনে কোন্‌খানে ব্যাঘাত রয়েছে। অভ্যস্ত ব'লেই তো সেই ব্যাঘাতকে দেখতে পাই নে। সমস্ত জীবনের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। যেমন বাতাসে এত ধুলো রয়েছে, অথচ দরজার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি এলে তবেই সেটা দেখা যায়, তেমনি অন্তরে যে কী দীনতা রয়েছে তা এমনি দেখা যায় না— শান্তিনিকেতনের সাধনার জ্যোতির ভিতর দিয়ে তাকে দেখে তার থেকে মুক্তিলাভের ব্রতকে গ্রহণ করি। বোধ আবির্ভূত হোক। বোধ পরিপূর্ণ হোক। কার্তিক ১৩২১

অগ্রহায়ণ ১৩২১

দীক্ষার দিন

আশ্রমকে যেদিন সত্য করে দেখতে হবে সেদিন আনন্দের সংগীত বেজে উঠবে, ফুলের মালা দুলবে, সূর্যের কিরণ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। কারণ, আনন্দের মধ্য দিয়েই সত্যকে দেখা সম্ভব হয়, আর-কোনো উপায়ে নয়। আমাদের একান্ত আসক্তি দিয়ে সব জিনিসকে বাইরের দিক থেকে আঁকড়ে থাকি ; সেইজন্যই সেই আসক্তি থেকে ছাড়িয়ে ভিতরকার আনন্দরূপকে দেখবার এক-এক দিন আসে।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কোন্ দিনটিকে আশ্রমের এই সত্যরূপকে দেখবার উৎসবের দিন করেছেন ? সে তাঁর দীক্ষার দিন। দীক্ষা সেই দিন যেদিন মানুষ আপনার মধ্যে যেটি বড়ো, আপনার মধ্যে যে অমর জীবন, তাকে স্বীকার করে। সংসারের ক্ষেত্রে মানুষ যে জন্মায় তাতে তার কোনো চেষ্টা নেই ; সেখানকার আয়োজন তার আসবার অনেক পূর্বে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু, মানুষ আপনাকে আপনি অতিক্রম করে যেদিন একেবারে সূর্যের আলোর কাছে, নিখিল আকাশের কাছে, পুণ্য সমীরণের কাছে, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ হস্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে— যেদিন এই কথা বলে যে 'আমি অনন্তকালের অমৃতজীবনের মানুষ, আমারই মধ্যে সেই বৃহৎ সেই বিরাট সেই ভূমার প্রকাশ'— সেদিন সমস্ত মানুষের উৎসবের দিন। সেইরকম একটি দীক্ষার দিন যেদিন মহর্ষি বিশ্বের মধ্যে অনন্তকে প্রণাম করেছেন, যেদিন আপনার মধ্যে অমৃতজীবনকে অনুভব করে তাকে অর্ঘ্যরূপে তাঁর কাছে নিবেদন করে দিয়েছেন, সেই দিনটি যে বাস্তবিকই উৎসবের দিন এই কথা অনুভব করে তিনি তাকে আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। মহর্ষির সেই দীক্ষাকে আশ্রয় করেই এখানে আমরা আছি। এই আশ্রম তাঁর সেই দীক্ষাদিনটিরই বাইরের রূপ। কারণ, এখানে কর্মে দীক্ষা, শিক্ষায় দীক্ষা, শিক্ষকতায় দীক্ষা— সেই অমরজীবনের দীক্ষা। সেই পরমদীক্ষার মন্ত্রটি এই আশ্রমের মধ্যে রয়ে গেছে। প্রতিদিন সে কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকি অন্তত আজ উৎসবের আনন্দালোকে আশ্রমের সেই অমৃতরূপকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হও। আজ উদ্‌বোধিত হও, সত্যকে দেখো। আজ বাতাসের মধ্যে সেই দীক্ষার মন্ত্র শ্রবণ করো—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত এবং আকাশের অনন্ত আরতিদীপের কোনোদিন নির্বাণ নেই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন তা উপলব্ধি করো। সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে— আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে ; ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে, পিতামাতার গভীর স্নেহে, মাধুর্যধারার

অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত ; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো। মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ কোনো লোভ না আসুক, পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।

এই মন্ত্র আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে, এই মন্ত্র এই আশ্রমকে রক্ষা করেছে। এই আশ্রমের আকাশে, পুণ্য সমীরণে, নির্মল আলোকে, উদার প্রান্তরে, এই আমাদের সম্মিলিত জীবনের মধ্যে এই মন্ত্রকে দেখবার, শ্রবণ করবার, গ্রহণ করবার জন্য অদ্য এই উৎসব। চিত্ত জাগ্রত হোক, আশ্রমদেবতা প্রত্যক্ষ হোন, তিনি তাঁর মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন। এই ফুলের মতো সুকুমার তরুণজীবনগুলির উপর তাঁর স্নেহাশীর্বাদ পড়ুক ; বিকশিত হোক এরা পুণ্যে প্রেমে পবিত্রতায় ; স্মরণ করুক এই শুভদিন, গ্রহণ করুক এই মন্ত্র, এই চিরজীবনের পাথেয়। এদের সম্মুখে সমস্ত জীবনের পথ রয়েছে, অমৃত আশীর্বাদ এরা গ্রহণ করে যাত্রা করুক ; চিরজীবনের দীক্ষাকে লাভ করে এরা অগ্রসর হয়ে যাক। পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি সংকটকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে এই দীক্ষার মন্ত্র তাদের সহায় হোক। উদ্‌বোধিত হও, জীবনকে উদ্‌বোধিত করো! প্রাতঃকাল। ৭ পৌষ ১৩২১

মাঘ ১৩২১

আরো

আরো চাই, আরো চাই— এই গান উৎসবের গান। আমরা সেই ভাণ্ডারে এসেছি যেখানে আরো পাব। পৃথিবী ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, মানুষের ঘর স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মীর কোলে মানুষ জন্মেছে। সেখানে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে। এক-একদিন তার বাইরে এসে 'আরো'র ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মানুষের উৎসব।

একদিন মানুষ পৃথিবীতে দেবতাকে বড়ো ভয় করেছিল। কে যে প্রসন্ন হলে জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে, কে যে অপ্রসন্ন হলে দুর্যোগ উপস্থিত হয়, তা মানুষ কোনোমতেই সেদিন ভেবে পায় নি। যে শক্তির সঙ্গে আত্মার যোগ নেই তাকে প্রসন্ন রাখবার জন্য বলির পশু নিয়ে তখন ভয়াতুর মানুষ একত্র মিলেছে। তখনকার সেই ভয়ের পূজা তো উৎসব নয়। ডাকাতের হাতে পড়লে যেমন ভীরু বলে ওঠে 'আমার যা আছে সব দিচ্ছি কিন্তু আমায় প্রাণে মেরো না', তেমনি পৃথিবীর মধ্যে অদৃশ্য শক্তিকে খুশি রাখবার জন্য সেদিন মানুষ বলেছিল : আমি তোমাকে সব দেব, তুমি আমায় সংকটে ফেলো না ; কিন্তু, সে তো আনন্দের দান নয়। আনন্দের দেবতাকে উপলব্ধি করলে আর ভয় নেই। কারণ, এই আনন্দের দেবতাই যে 'আরো', এই তো সকলকে ছাড়িয়ে যায়। যা-কিছু পেয়েছি, বুঝেছি, তার চেয়ে তিনি আরো ; যা পাই নি, হারিয়েছি, তার চেয়েও তিনি আরো। তিনি ধনের চেয়ে আরো, মানের চেয়ে আরো, আরামের চেয়ে আরো। তাই তো সেই আরো'র পূজায়, আরো'র উৎসবে মানুষ আনন্দে বলেছে : আমার ধন নাও, প্রাণ নাও, সম্মান নাও। অন্তরে এবং বাহিরে মানুষের এই যে আরো'কে জানা এ বড়ো আরামের জানা নয়। যেদিন মানুষ জেনেছে যে সে পশু নয়, তার দেবতা পাশব নয়, সে বড়ো, তার দেবতা বড়ো, সেদিন সে যে পরম দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েছে। সেদিন মানুষ যে বিজয়ী, মানুষ যে বীর, তাই সেই বিজয়লাভের জয়োৎসব সেদিন হবে না? পাখি যেমন অন্ধকারের প্রান্তে জ্যোতির স্পর্শমাত্রে অকারণ আনন্দে গেয়ে ওঠে, তেমনি যেদিন পরম জ্যোতি তাকে স্পর্শ করেন সেদিন মানুষও গেয়ে ওঠে। সেদিন সে বলে : আমি অমৃতের পুত্র। সে বলে : বেদাহমেতং, আমি পেয়েছি। সেই পাওয়ার জোরে নিজের মধ্যে সেই অমৃতকে অনুভব করে ভয়কে সে আর ভয় করে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে : আমার পথ সামনে, আমি পিছু হটব না, আমার পরাজয় নেই— রুদ্র, তোমার প্রসন্নতা অন্তহীন।

একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে ! সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখছে, কী প্রলয়ের বিভীষিকা। সেখানে এই বিভীষিকার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে। সেখানে ইতিহাসের ডাক এসেছে, সেই ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে ! কে ভুল করেছে, কে ভুল করে নি, এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী, সে কথা দূরের কথা। কিন্তু, ইতিহাসের ডাক পড়েছে ; সে ডাক জর্মান শুনেছে, ইংরাজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন ; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে তা হবে না, ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এত দিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন, 'না, এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না।' যেমনি এই হুকুম পৌঁচেছে অমনি কামানের গোলা দুই পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। বীরের দল ইতিহাসবিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে। যারা আরামে ছিল তারা আরামকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছে, প্রাণকে আঁকড়ে থাকব না, প্রাণের চেয়ে মানুষের মধ্যে আরো আরো বেশি আছে। কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে। মা কেঁদে উঠেছে, স্ত্রীপুত্র অনাথ হয়ে বক্ষে করাঘাত করছে। সেই কান্নার উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে উৎসব হচ্ছে ; বাণিজ্য ব্যবসায় চলছিল, ঘরে টাকা বোঝাই হচ্ছিল, রাজ্যসাম্রাজ্য জুড়ে প্রতাপ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল— ডাক পড়ল বেরিয়ে আসতে হবে। মহেশ্বর যখন তাঁর পিণাকে রুদ্র নিশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে 'যাও'। স্ত্রীকে কেঁদে নিজের হাতে স্বামীকে বর্ম পরিয়ে দিতে হয়েছে। সমুদ্রপারে আজ মরণযজ্ঞে সেই প্রাণের মহোৎসব।

সেই উৎসবের ধ্বনি আমাদের উৎসবের মধ্যে কি আজ এসে পৌঁছয় নি। ভীত মানুষ, আরামের জন্য লালায়িত মানুষ, যে প্রতিদিন তুচ্ছ স্বার্থটুকু নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করে মরেছে, কে তার কানে এই মন্ত্র দিলে 'সব ফেলে দাও— বেরিয়ে এসো' ! যাঁর হাতে আরো'র ভাণ্ডার তিনিই বললেন, 'যাও, মৃত্যুকে অবহেলা করে বেরোও দেখি !' বিরাট বীর মানুষের সেই পরিচয়, যে মানুষ আরো'র অমৃত-পানে উন্মত্ত হয়েছে সেই মানুষের পরিচয়, আজ কি আমরা পাব না। আমরা কি এ দেশে অজ্ঞানদেবতা উপদেবতার মন্দির তৈরি করে ষোড়শোপচারে তার পূজা করি নি। তার কাছে মানুষের বুদ্ধিকে শক্তিকে বলি দিই নি ? যে অজ্ঞানমোহে মানুষ মানুষকে ঘৃণা ক'রে দূরে পরিহার করে সেই মোহের মন্দির, সেই মূঢ়তার মন্দির কি আমাদের ভাঙতে হবে না। আমাদের সামনে সেই লড়াই নেই ? আমাদের মার খেতে হবে আত্মীয়স্বজনের। আমরা দুঃখকে স্বীকার করব, আমরা অপমান নিন্দা বিদ্রূপের আঘাত পাব, তাতে আমরা ভয় করব না।

আমাদের শান্তিনিকেতনে ইতিহাসবিধাতা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কোন্ অমৃতমন্ত্রে সেই শক্তিকে আমরা পাব। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ভয় নেই ; সমস্তই পরিপূর্ণতার দ্বারা আবৃত। মৃত্যুর উপরে সেই অমৃত। ঈশের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখো— সর্বত্র সেই আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হবে, ভয় চলে যাবে। দূর করো সব জালজঞ্জাল, বেরিয়ে এসো।

ভোগসুখ মোহকলুষ আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে, নির্ভয়ে সব ফেলে দিয়ে বীরত্বের অভিষেকস্নানে শুচি হয়ে বেরিয়ে এসো। আজ জগৎ জুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে তার মধ্যে ভয়ের সুর নেই ; তার ভিতর দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, তারই মধ্যে ইতিহাসবিধাতার আনন্দ। সে ক্রন্দন তাঁর মধ্যে শান্ত। সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতমের মধ্যে মৃত্যু মরেছে। তিনি নিজের হাতে মানুষের ললাটে জয়তিলক পরিয়েছেন। তিনি বিচ্ছেদবিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন। যাত্রীরা যেখানে যাত্রা করেছে, মৃত্যুর ঝংকার যেখানে প্রতিধ্বনিত, সেইখানে দেখো সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতং। আজ সেই রুদ্রের দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। রুদ্রের প্রসন্ন হাসি তখনই দেখা যায় যখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর বীর সন্তানেরা দুঃখকে

অগ্রাহ্য করেছে। তখনই তাঁর সেই প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হয়ে সত্যজ্যোতিতে অভিষিক্ত করে দেয়। রুদ্রের সেই প্রসন্নতা আজ উৎসবের দিনে আমাদের জীবনের উপরে বিকীর্ণ হোক। প্রাতে ৭ পৌষ ১৩২১

মাঘ ১৩২১

আবির্ভাব

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।

আশ্চর্য কথা এই যে আমরা এই গানে বলছি যে, তুমি আমার ভবনে অতিথি হয়ে এসেছ। এই একটি কথা বলবার অধিকার তিনি আমাদের দিয়েছেন। যিনি বিশ্বভুবনের সব জায়গা জুড়ে বসে আছেন, তাঁকেই আমরা বলছি, 'তুমি আমার ভবনে অতিথি।' কারণ, আমার ভবনে তাঁকে ডাকবার এবং না ডাকবার অধিকার তিনিই আমাকে দিয়েছেন। তাই সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে ইচ্ছা করলে ভবনের দ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি।

জীবনে কত অল্প দিন আমরা সেই বন্ধুকে ঘরে ডেকে আনি। তাঁকে আমার ভবনে ডাকব এমন দিন তো আসে না। তিনি এই ঘরের প্রান্তেই মুখ আবৃত করে বসে থাকেন ; অপেক্ষা করেন— 'দেখি আমায় ডাক দেয় কি না।' তিনি আমার ঘরের সামান্য আসবাবটি পর্যন্ত প্রকাশ করছেন, তিনি সর্বঘরে সর্ববিষয়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন, অথচ তিনিই ঘরে নেই। প্রত্যেক নিশ্বাসের ওঠানামায় তাঁর শক্তি কাজ করছে, চক্ষের প্রত্যেক পলক তাঁর ইচ্ছায় পড়ছে, রক্তের প্রত্যেক কণা নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে, অথচ আমাদের এতবড়ো আস্পর্ধা তিনি দিলেন যে, আমরা না ডাকলে তিনি ঘরে প্রবেশ করবেন না।

সেইজন্যে যেদিন তিনি আসেন সমস্ত হৃদয় খুলে দিয়ে সেদিন প্রেমের ডাকে তাঁকে ডাকি, সেদিন বিশ্বভুবনে রব ওঠে : তিনি এসেছেন। সূর্যের তরুণ আলোকে সেই বাণী প্রকাশ হয়, নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে সেই বার্তা ধাবিত হয়, বিকশিত পুষ্পের পাপড়িতে পাপড়িতে লেখা থাকে : তিনি এসেছেন। তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন আলোকের পর্দার ও পারে, জীবনের সুখদুঃখের ও দিকে ; ডাক যেই পড়ল অমনি যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্যচন্দ্রতারার জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি একটি কীটের গহ্বরের মতো ক্ষুদ্র ঘরে স্থান পেলেন। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর স্থান ছিল, স্থান ছিল না এই ছোটো ঘরটিতে। এই ঘরটি ধনজনমানে ভর্তি ছিল, তাই তাঁর জন্য এখানে জায়গা হয় নি। কিন্তু, যেদিন এলেন সেদিন তড়িৎবেগে সমস্ত বিশ্বে এই বার্তা গোপনে গোপনে প্রচারিত হয়ে গেল : তিনি এসেছেন। ফুলের সৌন্দর্যে, আকাশের নীলিমায় এই বার্তা ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

পুত্র কখনো কখনো পিতার জন্মোৎসব করে থাকে, সংসারে এমন ঘটনা ঘটে। সেদিন পুত্র মনে ভাবে যে তার পিতা একদিন শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন যেন তার ঘরে সে নূতন করে তার পিতার জন্মব্যাপারকে অনুভব করে। পিতাকে সে যেন নিজের পুত্রের মতো লাভ করে। এ যেমন আশ্চর্য, তেমনি আশ্চর্য বিশ্বপিতা যেদিন জন্মগ্রহণ করেন আমাদের ঘরে। যিনি অনন্ত ভুবনের পিতা তিনি একদিন আমার অন্তরের ভিতরে চৈতন্যের মধ্যে জন্মলাভ করবেন ; তিনি আসবেন। পিতা নোঽসি। পিতা তুমি পিতা হয়ে আছ, আমার জীবনকে তোমার মহাজীবনে আলিঙ্গন করে আছ, যুগ হতে যুগে লোক হতে লোকান্তরে আমায় বহন করে এনেছ। পিতা নো বোধি। কিন্তু, আমার বোধের মধ্যে তো তোমার আবির্ভাব হয় নি। সেই বোধের অপেক্ষায়, আমার উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় যে তাঁকে থাকতে হয়। যেদিন আমার বোধের মধ্যে পিতারূপে তাঁর আবির্ভাব হবে সেদিন পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠবে। ভক্তের চৈতন্যে সেদিন যে তাঁর নবজন্মলাভ।

সংসারের সুখে দুঃখে যখন তরঙ্গায়িত হচ্ছি, চৈতন্যের মধ্যে তখন আমরা পিতৃহারা। জীবধাত্রী বসুন্ধরা পিতার সিংহাসন বহন করছে ; প্রাণের ভাণ্ডার, অন্নের ভাণ্ডার সেখানে পরিপূর্ণ। কিন্তু, অন্তরে যে দুর্ভিক্ষ,

সেখানে যে পিতা নেই। সে বড়ো দৈন্য, সে পরম দারিদ্র্য। যিনি রয়েছেন সর্বত্রই, তাঁকে আমি পাই না। পাই না, কারণ ভক্তি নেই। যুক্তি খুঁজে পাওয়া সহজ, কিন্তু ভক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দ সহজ না হলে পাওয়া যায় না। উপনিষদে বলে— মন বাক্য তাঁকে না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে তার আর ভয় নেই। তাঁকে দেখা উৎসবের মধ্যে দেখা ; জ্ঞানে নয়, তর্কের মধ্যে নয়। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই পাবার উপায় নেই।

এই-যে উৎসবের আলোক জ্বলছে একে কি তর্ক করে কোনোমতেই পাওয়া যেত। চোখের মধ্যে আলো পাবার আনন্দ আছে, তাই তো চোখ আলো পায় ; চোখ যে আলোর জন্য লালায়িত। এক সময়ে জীবের তো চক্ষু ছিল না ; চক্ষু কেমন করে ক্রমে জীবের অভিব্যক্তিতে ফুটল ? জীবের মধ্যে আলোককে পাবার তৃষ্ণা ছিল, দেহীর দেহের পর্দার আড়ালে বিরহীর মতো সেই তৃষ্ণা জেগে ছিল ; তার সেই দীর্ঘ বিরহের তপস্যা সহসা একদিন চক্ষুবাতায়নের ভিতরে সার্থক হল। আলোকের আনন্দদূত তার চোখের বাতায়নে এল। আলোককে পাবার আনন্দের জন্য তপস্যা ছিল ; সেই তপস্যা অন্ধ জীবের অন্ধকার দেহের মধ্যে চক্ষুকে বিকশিত করে স্বর্গের আলোকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। সেই একই সাধনা অন্ধ চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে ; আত্মা কাঁদছে সেখানে। যতদিন পর্যন্ত অন্ধ জীব চক্ষু পায় নি সে জানত না তার ভিতরে আলোকবিরহী কাঁদছিল ; সে না জানলেও সেই কান্না ছিল বলেই চোখ খুলেছে। অন্তরের মধ্যে চৈতন্যগুহায় অন্ধকারের পরমজ্যোতির জন্য মানুষের তপস্যা চলেছে। এ কথা কখনোই সত্য নয় যে কোনো মানুষের আত্মা ধনজনের জন্য লালায়িত। মগ্নচৈতন্যের অন্ধকারময় রুদ্ধ বাতায়নে বিরহী আত্মা কাঁদছে ; সেই কান্না সমস্ত কোলাহলের আবরণ ভেদ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত উঠেছে। আনন্দ যেদিন আসবে সেদিন চোখ মেলে দেখব সেই জ্যোতির্ময়কে। সেদিন তিনি আমার ভবনে আসবেন এবং বিশ্বভুবনে তার সাড়া পড়ে যাবে। সায়ংকাল, ৭ পৌষ ১৩২১

মাঘ ১৩২১

অন্তরতর শান্তি

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে !

তিনি যে চেয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে, আমার অন্তরের মাঝখানে, এ কি উপলব্ধি করব এইখানে। এ-সব কথা কি এই কোলাহলে বলবার কথা। তারার আলোকে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে, ভক্তের অন্তরের নিস্তব্ধলোকে, যখন অনন্ত আকাশ থেকে একটি অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টি পড়ে তখন সেই নিঃশব্দ বিরলতার মধ্যেই এই পরম আনন্দের গভীর বাণী জেগে উঠতে পারে— এই কথাই মনে হয়। কিন্তু তা নয়, সেই বিরলতার মধ্যেই যে সাধকের উৎসব সম্পূর্ণ হয় তা কখনোই সত্য নয়। মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনাবেচার বিচিত্র লীলা চলেছে, এরই মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই, তাঁর পূজার গীত উঠছে— এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনোই তাঁর উৎসব নয়। আকাশের তারায় তারায় যে সংগীত উঠছে যুগযুগান্তর ধরে সে সংগীতের কেবলই পুনরাবৃত্তি চলছে। সেখানে কোনো কোলাহল নেই, ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই ; নক্ষত্রলোকে যেন বিশ্বরূপ বাউল তার একতারার একটি সুর ফিরে ফিরে বাজাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জগতে যে গান উঠছে সে কি একটি তারের সংগীত। কত যুদ্ধবিগ্রহ বিরোধ সংগ্রামের কত বিচিত্র তার সেখানে ঝংকৃত হচ্ছে, তার বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে, শান্তির সুর বাজছে। মানুষের চারি দিকে ষড়্‌রিপুর হানাহানি, তাণ্ডবলীলা চলেছে ; কিন্তু এত বেসুর এসে কই এই একটি সুরকে তো লুপ্ত করতে পারলে না ! সকল বিরোধ, সকল বিপ্লব, সকল যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে এই সুর বেজে উঠল : শান্তং শিবং অদ্বৈতং।

মানুষের ইতিহাসে এই-যে উৎসব চলছে তারই কি একটি প্রতিরূপ আজকের এই মেলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে কেউ বাজার করছে, কেউ খেলা করছে, কেউ যাত্রা শুনছে, কিন্তু নিষেধ তো করা হয় নি, বলা হয় নি 'এখানে উপাসনা হচ্ছে— তোমরা সাধু হয়ে চুপ করে বসে থাকো'। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জগতে যে-একটা প্রচণ্ড কোলাহল চলছে শান্তিনিকেতনের নিভৃত শান্তিকে তা আবিল করুক। মানুষই কোলাহল করে, আর তো কেউ করে না। কিন্তু মানুষের কোলাহল আজ পর্যন্ত কি মানুষের সংগীতকে থামাতে পারল। ঈশ্বর যে খনির ভিতর থেকে রত্নকে উদ্ধার করতে চান, তিনি যে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্য থেকেই তাঁর পূজাকে উদ্ধার করবেন। কারণ, এই কোলাহলের জীব মানুষ যখন শান্তিকে পায় তখন সেই গভীরতম শান্তির তুলনা কোথায়। সে শান্তি জনহীন সমুদ্রে নেই, মরুভূমির স্তব্ধতায় নেই, পর্বতের দুর্গম শিখরে নেই। আত্মার মধ্যে সেই গভীর শান্তি। চারি দিকের কোলাহল তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়; কোলাহলের ভিতরে নিবিড়রূপে সুরক্ষিত সেই শান্তি। হাট বসে গিয়েছে, বেচা-কেনার রব উঠেছে; তারই মধ্যে প্রত্যেক মানুষ তার আপনার আত্মার ভিতরে একটি যোগাসনকে বহন করছে। হে যোগী, জাগো। তোমার যোগাসন প্রস্তুত, তোমার আসন তুমি গ্রহণ করো; এই কোলাহলে, ষড়্‌রিপুর ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিরোধের মাঝখানে অক্ষতশান্তি, সেইখানে বোসো। সেখানে তোমার উৎসবপ্রদীপ জ্বালো, কোনো অশান্ত বাতাস তাকে নেবাতে পারবে না। তুমি কোলাহল দেখে ভীত হোয়ো না; ফলের গর্ভে শস্য যেমন তিক্ত আবরণের ভিতরে থেকে রক্ষা পায়, সেইরূপ কোলাহলের দ্বারাই বেষ্টিত হয়ে চিরকাল মানুষের শান্তি রক্ষা পেয়ে এসেছে। মানুষ তার বৈষয়িকতার বুকের উপর তার ইষ্টদেবতাকে সর্বত্রই তো প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে তার আসক্তি জীবনের সব সূত্রগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে তারই মাঝখানে তার মন্দিরের চূড়া দেবলোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাদের চিত্ত আজ অনুকূল হয় নি, ক্ষতি নেই। যাক যার মন যেখানে খুশি যাক, কোনো নিষেধ নেই। তবু এই অসীম স্বাধীনতার ভিতরে মানুষের পূজার ক্ষেত্র সাবধানে রক্ষিত হয়ে এসেছে। সেই কথাটি আজ উপলব্ধি করবার জন্য কোলাহলের মধ্যে এসেছি। যার ভক্তি আছে, যার ভক্তি নেই, বিষয়ী ব্যবসায়ী পাপী, সকলেরই মধ্যে তাঁর পূজা হচ্ছে। এইখানেই এই মেলার মধ্যেই তাঁর পূজা হয়েছে, এই কোলাহলের মধ্যেই তাঁর স্তব উঠেছে। এইখানেই সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতমের পদধ্বনি শুনছি; এই হাটের রাস্তায় তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে। মানুষের এই আনাগোনার হাটেই তাঁর আনাগোনা; তিনি এইখানেই দেখা দিচ্ছেন। রাত্রি, ৭ পৌষ ১৩২১

মাঘ ১৩২১

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনের পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। বিশ্বভারতী-প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর পঞ্চদশ ও ষোড়শ খণ্ড বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইল।

মহুয়া

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদে ও রঙিন নামচিত্রে ভূষিত হইয়া ১৩৩৬ আশ্বিনে মহুয়া কাব্যের প্রথম প্রকাশ। তৎপূর্বে ইহার অনেক কবিতা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রচারিত, মাস বর্ষ ও পৃষ্ঠাঙ্ক-সহ তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :

শিরোনাম	সাময়িক পত্রে প্রকাশ	নামান্তর
অচেনা	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৫। ২৬	
অন্তর্ধান	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৫। ৭৭০	
অবশেষ	মাসিক বসুমতী। বৈশাখ ১৩৩৫। ১	দিনান্তে[১]
অশ্রু	প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৫। ৪৬৩	
আহ্বান	বঙ্গলক্ষ্মী। কার্তিক ১৩৩৫। ৮৮৭	
দিনান্তে	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৪। ৭৭৩	মিলন
নাম্নী	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৫। ১	
নির্ঝরিণী	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৫। ৩৪	
নৈবেদ্য	প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৫। ৪৬২	
পথের বাঁধন	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৫। ৬৬৩	
পুরাতন	মানসী ও মর্ম্মবাণী। ফাল্গুন ১৩৩৫। ১	পুরাতন গান
প্রণতি	প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৫। ৪৬৭	
প্রতীক্ষা	বঙ্গলক্ষ্মী। আশ্বিন ১৩৩৫। ৭৯২	প্রত্যাশা
বরযাত্রা	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৫। ৩	
বসন্ত	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৫। ১	বিজয়ী
বাসরঘর	প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৫। ৪৭০	
বিজয়ী[২]	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬	বৈকালী (৪)
বিদায়	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৫। ৭৭১	
বিদায়সম্বল	বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৪। ৬৭৩	যাবার দিকের পথিক
বিরহ	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৫। ৩০৩	শেষ কথা
বোধন	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৩৫। ৫৮৯	উদ্বোধন
মাধবী	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৫। ৫	
মুক্তি[২।৩]	প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৩৩। ৪০৩	বৈকালী (১)
শুকতারা	প্রবাসী। মাঘ ১৩৩৫। ৪৬৪	
শেষ মধু	সবুজ পত্র। বৈশাখ ১৩৩৪। ৪৫৯	
	বিচিত্রা। আষাঢ় ১৩৩৪। ৬৮	
সাগরিকা[৪]	প্রবাসী। পৌষ ১৩৩৪। ৩০১	

১ লিপিচিত্র রূপে মুদ্রিত।

২ দ্রষ্টব্য, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৪, পৃ ৫৪ পাদটীকা ২। ১৩৩৩ বৈশাখে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মহুয়ার বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল, এবং রচনাতারিখ ও পাঠ পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইল।

নির্ঝরিণী, শুকতারা, অচেনা, পথের বাঁধন, বাসরঘর, বিদায়, প্রণতি, নৈবেদ্য, অশ্রু, অন্তর্ধান— এই দশটি কবিতা শেষের কবিতা[৫] উপন্যাসের জন্য লিখিত হইলেও 'ভাবানুষঙ্গবশত মহুয়াতেও মুদ্রিত হইয়াছে'। রচনাবলী-সংস্করণে মহুয়ার সেই রূপ অপরিবর্তিত রাখা হইল।

মহুয়ার প্রথম সংস্করণের পাঠপরিচয় পাদটীকায় জানানো হইয়াছে যে, 'বিচ্ছেদ' ও 'বিরহ' শেষের কবিতার জন্য লিখিত হইলেও ঐ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় নাই।

পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কয়েকটি কবিতার মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

[উৎসর্গ]

৩ শুধায়ো না মোর গান
কারে করেছিনু দান
পথধুলা-'পরে আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে মান।

২ যে সেই ধুলার ফুলে
হার গেঁথে লয় তুলে—
হেলার সে-ধন হয়-যে ভূষণ
তাহারি মাথার চুলে।

১ ফুল ছিঁড়ে লয় হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে পাওয়া—
আনমনে তার পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে যাওয়া।

[১৯২৭]

উৎসর্গ-কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নিত প্রথম পাঠ ; পরে পার্শ্ববর্তী সংখ্যানুযায়ী শ্লোকগুলির ক্রম পরিবর্তিত হইয়াছিল। ১৩৫২ সনে প্রকাশিত স্ফুলিঙ্গ কাব্যে প্রকাশিত।

যে গীতিকবিতা-গুচ্ছ ('বৈকালী') প্রবাসী পত্রে ছাপিবার জন্য দিয়া যান, তাহার অন্তর্গত। 'এর অনেকগুলি, সম্ভবত সবগুলিই, তার পূর্বে কয়েক মাসের মধ্যে রচিত'— পুলিনবিহারী সেন এরূপ অনুমান করেন। 'প্রবাসী'র উদ্দেশে প্রেরিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে কোথাও রচনাকালের উল্লেখ নাই।

৩ প্রবাসীর পাঠে ও মহুয়া-ধৃত পাঠে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত তিনটি স্তবকই আদৌ (শ্রাবণ ১৩৩৯) গীতবিতানে সংকলিত হইয়া থাকিলেও, দিনেন্দ্রনাথ ইহার প্রথম স্তবকেরই স্বরলিপি প্রণয়ন করেন— উহা তৃতীয় খণ্ড স্বরবিতানে মুদ্রিত। বর্তমানে গীতবিতান গ্রন্থেও স্বরবিতানেরই অনুসরণ করা হয়। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় প্রবাসী-ধৃত মূল পাঠের রচনাকাল : ১২ চৈত্র ১৩৩২।

৪ পাণ্ডুলিপি-ধৃত ও প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত যে স্তবকটি বর্জিত তাহা পরে যথাস্থানে সংকলন করা হইয়াছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার গ্রন্থে (রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ, ১৩৭১, পৃ ৬৫২) এই বর্জিত স্তবক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

৫ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড ; সুলভ সংস্করণ পঞ্চম খণ্ড।

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র অগ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক ম'রে,
জাগো চিরস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।
যাহা স্থূল, যাহা ক্লান্ত তব,
অঙ্গ সাথে দগ্ধ হোক, হও নিত্যনব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

সংকটবন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ—
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষগম্ভীর।
যাক দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

তপতী নাটকের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত (পৃ· ৫২-৫৪) অনেকাংশে-পৃথক পাঠ।

উজ্জীবন

উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা
হে মন্মথ, মনসিজ, হে মনের মায়ামরীচিকা—
তৃষ্ণামরুবিহারে বিলাস,
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

দহনে দ্বিগুণ দীপ্তি লভিল দাহনশক্তি তব,
পুরাতনে ভস্ম করি বাহির হয়েছ নিত্যনব—
দুঃখে তব দুর্জয় বিকাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

পুষ্পের প্রচ্ছন্ন তলে ইন্দ্রের যে বজ্র কর চুরি
মিলন করুক তীব্র, বিরহের দুঃসহ মাধুরী

শান্তি মোর করুক বিনাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

নিন্দাকণ্টকিত পথে জয়যাত্রা অতন্দ্র অধীর
আনন্দে সার্থক করো— দাও মোরে বিশ্ববিস্মৃতির
সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

'তপতী'র পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র পাঠ। অসম্পূর্ণ ?

বরণডালা

আজি এই মম সকল ব্যাকুল
অঙ্গ-মাঝে
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

এই বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল মিলিছে তোমার
চরণমূলে।
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে।
দিনু পূজা মম, নাহি যদি লও
মরিব লাজে।
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

তরু হতে ফুল আনি নাই আমি
আনি নি ফল।
দেশ দেশ হতে আনি নি ভরিয়া
তীর্থজল।
আমার আপন তনুতে উছলে
অধরা ধারা,
অধীরতা তার তোমারি মাঝারে
হোক-না সারা।
ঘনযামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।

ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

বৈশাখ ১৩৩৩

সম্ভবত ইহা পূর্বপাঠ। কবির 'বৈকালী' (আষাঢ় ১৩৮১) গ্রন্থে (পৃ. ৫৪) প্রাপ্ত। নটীর পূজা নাটকের 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটির সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বরণ

পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি
দময়ন্তী নিয়েছিল বাছি
মানবেরে, ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
রাজকন্যা চিনেছে সেদিন
দেবমূর্তি, সে যে ছায়াহীন।

তাই শুনে একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে—
আমি লব স্বয়ম্বরে বরি দেবতারে,
সর্বমানবের মাঝে চিনিব তাহারে;
তারি লাগি মোর দেহে মনে
বরমাল্য গাঁথিব যতনে।

বুঝি নি, কঠিন মোর পণ
কেমনে যে করিব সাধন।
কত-না মানুষ ফেরে দেবতার বেশে
লয়ে পূজারির দল দেশ হতে দেশে।
হেথা হোথা দিনে দিনে তাই
দ্বিধা লয়ে ফিরেছি সদাই।

খরতর রৌদ্রের বেলায়
জনতার মুখর মেলায়
দাঁড়ালেম একদিন রাজপথ-পাশে,
চেয়ে চেয়ে দেখিলাম যারা যায় আসে।
দেখিলাম যতটুকু কায়া
তার চেয়ে দীর্ঘতর ছায়া।

স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কত কণ্ঠস্বর
শুনিলাম ভেদিছে অম্বর।
দেখিনু দীনের মূর্তি উজ্জ্বল সজ্জায়,
ধনসমারোহে তারে ঢাকিল লজ্জায়;
যতই ছুটায় অশ্বরথ
সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

সেদিন সবার ঠেলাঠেলি
নানা শব্দে উঠিল উদ্বেলি।

তুমি পথপ্রান্তে একা ছিলে হাস্যমুখে
নিঃশব্দে দেখিতেছিলে নিস্তব্ধ কৌতুকে ;
হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে ।

বহে গেল জনতার ঢেউ ।
তোমা-পানে চাহে নাই কেউ ।
কেবল একেলা আমি দেখেছি তোমারে,
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে ।
মালা হাতে কাছে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার মুখে চেয়ে ।

চৌরঙ্গি
২৫ অগস্ট ১৯২৮

পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত স্বতন্ত্র পাঠ ।

মহুয়া

রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
প্রাণ তোর উচ্চশির রহে রাজকুলবনিতার
মর্যাদা বহিয়া । হেরিয়াছি তোরে শালবীথিকায়
বনস্পতিসভা-মাঝে, সজ্জা তোর প্রচুর ছায়ায়
লুণ্ঠিত তৃণের 'পরে ; বিপুল পল্লবঘন স্তরে
আগন্তুক বিহঙ্গমে সংগীতগুণীর সমাদরে
ডেকে নিস উদার আশ্রয়ে । উঠে যবে হুহুংকার
ক্রুদ্ধ কালবৈশাখীর, গর্ব জাগে শাখাপ্রশাখার,
তর্জনে গর্জিয়া উঠে দৃপ্তবলে রাখে আশ্রিতেরে ।
অনাবৃষ্টিশীর্ণ দিনে বনের প্রাঙ্গণ হতে ফেরে
বুভুক্ষু অতিথি যবে, বন্য নারী আসে তোর পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি পূর্ণ করি দিস সদাব্রতে ।
যে-বধূরে ভাবি মনে, কানে-কানে কহি আমি তোরে—
যদি তার দেখা পাই ডাকিব মহুয়া নাম ধ'রে ।

২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নাঙ্কিত প্রথম পাঠ ।

বিরহ ও অন্তর্ধান

শক্তি আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল—
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ কথা কহিবার কাল ।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
গেলে তুমি দূর পথে, নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে ।

ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অন্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো।

তব অন্তর্ধানে তব হেরিলাম রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে,
কান পাতি রহে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে—
তোমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্ কানে-কানে কথা।
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
ক্ষান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

বিরহের সঙ্গহীন স্তব্ধতার গভীর নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্ম-মাঝে পশি
দিলে অনির্বচনীয় ধ্যানমন্ত্রবাণী মহীয়সী।

অন্তরের অন্ধকারে এতদিনে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তে মোর তোমারি সে দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

'বিরহ' ও 'অন্তর্ধান' কবিতা-দুটির পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত একীকৃত প্রাথমিক পাঠ।

'দায়মোচন' কবিতাটির প্রথম শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোদ্‌ধৃত একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্লোক আছে :

শ্রাবণের বর্ষণে যা দিয়েছে ঢালি,
দান সেই অল্প তো নয়।
ফাল্গুনে ধরণীর যৌবনডালি
ভরে সেই রসসঞ্চয়।
তার পরে আশ্বিনে মেঘ উদাসীন
শূন্য গগনতলে সম্বলহীন ;
স্বচ্ছ প্রভাতে ধরা চাহে তার পানে,
বিদায়ঋতুরে নাহি ডরে।
আলোতে শিশিরে আর সৌরভে প্রাণে
গৌরবে বিচ্ছেদ ভরে।

'সাগরিকা' কবিতাটির মহুয়ায়-প্রচলিত পাঠে নিম্নমুদ্রিত একটি সম্পূর্ণ স্তবক বর্জিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি ও মাসিক পত্রে (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৪) প্রাপ্ত এই স্তবকটির স্থান বর্তমান পাঠের চতুর্থ স্তবকের পরে :

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণরাগে—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে,
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্‌বোধনমন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহোযোগীর চরণ স্মরি' যুগল করি' পাণি।

'সাগরিকা' কবিতাটির স্বতন্ত্র একটি পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র।—চিঠিপত্র ১১, পৃ ৭২-৭৬

'বিদায়সম্বল' কবিতাটির বর্জিত শেষ শ্লোকটি পাণ্ডুলিপি ও বিচিত্রা (কার্তিক ১৩৩৪) হইতে নিম্নে সংকলিত হইল :

যাবার দিকের পথিক যখন
শেষ কাঁদা শেষ হাসা
মিটায়ে চলিছে, থাক্‌-না তখন
মিছে ওইটুকু আশা।
বিদায়ের আগে সজল আঁখিতে
উঠুক ঘনিয়া ক্ষণিকের গীতে
'ভুলিব না কভু' এই কথাটিতে
অন্তিম ভালোবাসা।

মহুয়ার কয়েকটি কবিতা পূর্বপ্রচারিত রবীন্দ্র-সংগীতের রূপান্তর ; গানগুলি প্রথম-সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে (শ্রাবণ ১৩৩৯) প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। গানগুলির তালিকা[৬]—

কবিতা	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	গী· বি· পৃষ্ঠা
বিজয়ী	বিরস দিন, বিরল কাজ	৮০৪
সন্ধান	আমার নয়ন তোমার নয়নতলে	৭৫৫

৬ প্রথম গান ও 'বিজয়ী' কবিতায় পাঠভেদ অল্প, এজন্য গানের রচনাকাল দিয়াই কবিতা-রচনার কাল নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে গানের রূপান্তর বা জন্মান্তর হওয়ায়, কবিতায় পৃথক পৃথক রচনাকাল দেখা যায়। মূল গানগুলির রচনার সময় পাণ্ডুলিপি হইতে বা অন্য বিশ্বস্ত সূত্রে যেরূপ জানা যায়, সংকলন করা গেল—

চপল তব নবীন আঁখি দুটি। ১২ চৈত্র ১৩৩২
জানি তোমার অজানা নাহি গো। ১৬ চৈত্র ১৩৩২
আমার নয়ন। পরিত্রাণ-ধৃত। শারদীয়া বসুমতী (বার্ষিক) ১৩৩৪
অনেক দিনের আমার যে গান। ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-পূর্ব
আরো একটু বোসো তুমি। ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-পূর্ব
কাহার গলায় পরাবি গানের। ২৯ মাঘ ১৩৩৪

উল্লিখিত দ্বিতীয় গানের রচনাকাল রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সহজেই অনুমেয়, অনাদিকুমার দস্তিদারের তৎকালীন গানের খাতা হইতেও নিশ্চিত জানা যায়।

মুক্তি	চপল তব নবীন আঁখি দুটি	৭৯২
উদ্‌ঘাত	জানি তোমার অজানা নাহি গো	৭৯৪
নিবেদন	কাহার গলায় পরাবি গানের	৮৩৩
গুপ্তধন	আরো একটু বোসো তুমি	৮২৭
পুরাতন	অনেকদিনের আমার যে-গান	৭৬৬

প্রত্যাশা, সন্ধান, বরণডালা, নিবেদন, নির্ভয়, গুপ্তধন, অবশেষ— মহুয়ার এই সাতটি কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়াছিলেন ; দ্বিতীয়-সংস্করণ গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। বর্তমানে প্রচলিত গীতবিতানে সবগুলি গানই পাওয়া যায়।

১৩৩৬ সালে গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে মহুয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :

লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা— প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে— আর তাঁরই দালালি করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব 'মহুয়া'র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কালবিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পঙ্‌ক্তিতে বসাও তা হলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে কিছু যেন অত্যুক্তি করা হল। ফরমাশ ব্যাপারটা মোটরগাড়ির স্টার্টারের মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তার পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে— কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি হয়ে বসে। এইজন্য আমার বিশ্বাস, তোমরা এই লেখার মধ্যে নতুন কিছু পাবে, আকারে এবং প্রকারে। নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না ; নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তর-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে— সেখানে ভাবে ভঙ্গিতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর-একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে— নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না। তুমি তো জানই কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা করেছি। তার কারণ প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। তাই অন্যমনস্কভাবে এই পত্রের পূর্বাংশে তোমাকে যা লিখেছি অপরাংশে তার প্রতিবাদ করতে হল। বলেছিলুম এ লেখাগুলি আকস্মিক। ভুলেছিলুম সব কবিতাই যখনই লেখা যায় তখনই আকস্মিক। সব কবিতা বললে হয়তো বেশি বলা হয়। এক-একটা সময়ে এক-একটা নতুন ঝাঁকের কবিতা। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায়, সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা ক'রে বিদায় গ্রহণ

করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলনের মতো। মনের যে-ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফর্মাসের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। এগুলি যখন লিখছিলুম অপূর্বকুমার[৭] প্রায় রোজ এসে শুনে যেত, সে যে-উত্তেজনা প্রকাশ করত সেটা অপূর্বতারই উত্তেজনা। রূপের দিকে বা ভাবের দিকে একটা-কিছু নতুন পাচ্ছে বলেই তার আগ্রহ— তখন সুধীন্দ্র দত্তও ছিল তার সঙ্গী। তার থেকে আমার বিশ্বাস আপনার এই সমর্থন পেত যে, মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে— তাকে পূরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু বললে চলবে না।

পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর-একদল কবিতা আছে— সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনোখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখি নি— তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তার রীতিমত শুরু হয়েছে শারদোৎসবে— তার পরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পড়েছিল ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট। সেই প্রভেদ যদি না থাকত তা হলে লেখবার উৎসাহই থাকত না। মহুয়ার কবিতা যখন পড়বে তখন আমার স্বভাবের এই কথাটা মনে রেখো। এই বইয়ের প্রথমে ও সব শেষে যে-গুটিকয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

মহুয়া নামটা নিয়ে তোমার মনে একটা দ্বিধা হয়েছিল জানি। কাব্যের বা কাব্যসংকলন-গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগেভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতিনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে— মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হোক, অর্থের অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই বলেই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।

কবির স্বহস্তাঙ্কিত নামপত্র এবং উৎসর্গ-কবিতাটি প্রচলিত সংস্করণের মতো রচনাবলী-সংস্করণ মহুয়াতেও মুদ্রিত হইয়াছে।

মহুয়ার প্রথম সংস্করণে 'সবলা' কবিতাটির চতুর্থ ছত্র বাদ পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে স্মৃতি হইতে সংশোধন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ পুলিনবিহারী সেনকে ২৭ অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখের একটি পত্রে সম্পূর্ণ এক নূতন পঙ্‌ক্তি লিখিয়া পাঠান :

মহুয়াতে 'সবলা' বলে যে কবিতাটি আছে, তাতে একটা লাইন ছুট হয়েছে—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতঃ,
সংকোচের দৈন্যজাল কেন তুমি পাতো—

এই শেষের লাইনটা পড়ে গিয়েছে— এই লাইনটাকে উদ্ধার কোরো। পরের লাইনে আছে—

পথপ্রান্তে কেন র'ব জাগি—

পথপ্রান্তে শব্দের পর সেমিকোলন দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো— তা হলে মানে হবে সংকোচের জালটা পাতা হচ্ছে চলবার পথে।

৭ অপূর্বকুমার চন্দ

বলা বাহুল্য, এই সম্পূর্ণ নূতন পঙ্‌ক্তি স্বতন্ত্র মহুয়া গ্রন্থে কিংবা রবীন্দ্র-রচনাবলী-ভুক্ত মহুয়া গ্রন্থে গ্রহণের অবকাশ ছিল না, কেননা এই পত্র রচনার কয়েক বৎসর পূর্বেই, পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধার করিয়া 'ছুট' ছত্রটি ('নত করি মাথা') মহুয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৪১) মুদ্রিত হইয়াছিল। পত্রটি লিখিবার কালে সে কথা স্মরণ না থাকায় রবীন্দ্রনাথ নূতন একটি ছত্র লিখিয়া পাঠান এরূপ অনুমান করা যায়।

মহুয়ার 'প্রচ্ছন্ন' ও 'প্রত্যাগত' কবিতা দুইটি শিল্পী নন্দলাল বসুর দুইখানি চিত্রের প্রেরণায় লিখিত তাহা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'পত্রাবলী'র বিভিন্ন পত্রে জানা যায়। দ্রষ্টব্য, দেশ : ২০ ফাল্গুন ১৩৬৭, পত্র ৮২ ও ২৫ চৈত্র ১৩৬৭। পত্র ১১৫। সর্বশেষ বাক্য ও তৎসম্পর্কে পাদটীকা।

বহুকাল-প্রচলিত একটি বিশেষ মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে বিদায় কবিতায় পাণ্ডুলিপি দেখার ফলে। পৃ ৭৭, দ্বিতীয় ছত্রে 'বিস্মৃত প্রদোষে' স্থলে মূলানুগ শুদ্ধপাঠ : 'বিস্মৃতিপ্রদোষে'।

বনবাণী

বনবাণী ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-সংস্করণে গ্রন্থটির 'বনবাণী' এবং 'বৃক্ষরোপণ-উৎসব' কেবল এই দুইটি কবিতা-অংশ মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অনেক কবিতার রচনাকাল ও পাঠ সংশোধিত এবং রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল।

বনবাণীর ভূমিকাটি তেজেশচন্দ্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের'[৮] পরিমার্জিত রূপ। 'কুটিরবাসী' কবিতার ভূমিকায় ইনিই 'তরুবিলাসী তরুণবন্ধু' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পাণ্ডুলিপিতে উক্ত কবিতাটির আরম্ভে নিম্নমুদ্রিত তিনটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে :

বাসাটি বেঁধে আছ মুক্তদ্বারে
বটের ছায়াটিতে পথের ধারে।
সমুখ দিয়ে যাই ; মনেতে ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি,
হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে।

এখানে পথে-চলা পথিক জনা
আপনি এসে বসে অন্যমনা।
তাহার বসা সেও চলারই তালে,
তাহার আনাগোনা সহজ চালে,
আসন লঘু তার, অল্প বোঝা—
সোজা সে চলে আসে, যায় সে সোজা।

আমি যে ফাঁদি ভিত বিরাম ভুলি',
চূড়ার 'পরে চূড়া আকাশে তুলি।
আমি যে ভাবনার জটিল জালে
বাঁধিয়া নিতে চাই সুদূর কালে—
সে জালে আপনারে জড়াই ঠেসে,
পথের অধিকার হারাই শেষে।

৮ দ্রষ্টব্য : 'গাছপালার প্রতি ভালোবাসা'—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৪।

'শাল' কবিতার ভূমিকায় 'কিশোর কবিবন্ধু' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ আছে তিনি পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০)[৯]।

বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ৩০ আষাঢ় ১৩৩৫ সালে (১৪ জুলাই ১৯২৮)। প্রতিমা ঠাকুরকে একটি পত্রে (৯ শ্রাবণ ১৩৩৫)[১০] রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন :

... এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হল হলচালন।... তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীতে কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হল।... তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হল— আমি এই উপলক্ষে ছোটো একটি গল্প[১১] লিখেছিলুম, সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুশি হতে। একটা কালো রেশমের ধুতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরিদেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর।...

এই অংশের কতকগুলি গীতিকবিতার রচনাকাল অতঃপর দেওয়া গেল—

আয় আমাদের অঙ্গনে। শান্তিনিকেতন, ২ শ্রাবণ ১৩৩৬
বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো। [জুলাই ১৯২৮]
হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী। [জুলাই ১৯২৮]
সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক। [জুলাই ১৯২৮]
হে পবন কর নাই গৌণ। [জুলাই ১৯২৮]
আকাশ তোমার সহাস উদার দৃষ্টি। [জুলাই ১৯২৮]
প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক। খসড়া : ১৩ জুলাই ১৯২৮

পরিশেষ

পরিশেষ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু— পরিশেষের এই ছয়টি কবিতা পুনশ্চ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পরিশেষের বর্তমান সংস্করণে বর্জিত হইল। কবিতাগুলি রচনাবলী-সংস্করণে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের (প্রচলিত ষোড়শ খণ্ড, সুলভ বর্তমান খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে অনেক কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তারিখ ও পাঠ সংশোধিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে।

'বিচিত্রা' কবিতাটির একটি স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল।

বিচিত্রা

চুরি করে নিয়ে গেলে মোর মন কোন্ শিশুকালে,
হে বিচিত্রা, বাঁধি মায়াজালে—
বস্তুর আড়ালে যেথা দিনরাত্রি সাজাইছ তুমি
তোমার রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশে ছড়ায়ে কেশ বাঁশি বাজায়েছ চুপে চুপে,
সেই সুরে মোর চক্ষে কত স্বপ্ন অপরূপ রূপে

৯ দ্রষ্টব্য বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে 'বন্ধুস্মৃতি'।
১০ দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পত্র ২৮।
১১ 'বলাই', গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড।

করেছে বিচিত্র লীলা ধরণীর ধূলির সীমায়,
দিগন্তের দূর নীলিমায়।

নারিকেলপল্লবের আকম্পিত ইঙ্গিতমর্ম্মরে
বৈশাখের খরসূর্যকরে
আকাশ নিশ্বসি উঠি মধ্যাহ্নের আতন্দ্র আলসে
ভরিয়াছে রহস্যের রসে।
তৃণাগ্রে শিশিরবিন্দু শরতের শুভ্রতার বাণী
বাতাস ঝলকি' দিত, মুক্তির আনন্দ দিত আনি,
কাঁপিত প্রভাত আলো বালকের পুলকিত বুকে
হে বিচিত্রা, চাহি তব মুখে।

চৈত্রে স্বচ্ছ পূর্ণিমায় যত্নে-গাঁথা মল্লিকার মালা
ভরে যবে রাত্রির নিরালা
মিলন-আশ্বাসগন্ধ, শ্রান্তিহীন পাপিয়ার গানে,
অনিদ্রা নিবিড় করি আনে—
যৌবনের সেই রাত্রে, বিচিত্রা, কাহার কালো চোখে
সোহিনীর মিড়খানি মিলাইতে চাঁদের আলোকে,
মধুর সংশয়ে-ছোঁওয়া শরমের কুহেলিকা আনি
হাসির উপরে দিতে টানি।

লোকালয়ে ফিরায়েছ সুখদুঃখে নিজে হাত ধরি
পথে পথে দিবসশর্বরী।
প্রাণের বীণার তন্ত্রে মৃত্যুসুরে তুলেছ স্পন্দন,
বাঁধিয়াছ, ছিঁড়েছ বন্ধন।
মর্মের বেদনা মোর তোমার আপন রসধারে
পেয়েছে সুতীব্র বর্ণ, দিয়েছ গভীর অর্থ তারে,
মোর নৌকা খেয়া দিতে বারে বারে ঝঞ্ঝাবায়ু তুলে
নিয়ে গেছ অপূর্বের কূলে।

সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম পাঠ।

কয়েকটি কবিতার পরিশেষ-গ্রন্থে-বর্জিত অনুচ্ছেদ পাণ্ডুলিপি বা সাময়িক পত্র হইতে নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল :

সহসা জ্যৈষ্ঠের শেষরাতে
গুরু গর্জনের সাথে
পূর্ববনান্তের শাখে মর্মরিয়া জাগে বায়ুবেগ,
ঘননীল মেঘ
দিগন্তের তটে আনে বর্ষণের নিবিড় আশ্বাস—
তৃষিত মাটির বক্ষে দৈন্যজীর্ণ ঘাস
উল্লাসে তখনি
করিয়া অশ্রুত জয়ধ্বনি
থরে থরে
ছোটো ছোটো অক্ষরে অক্ষরে

আকাশের স্তবগান ফুটাইয়া তুলে
তিনীল তিনাল ফুলে ফুলে।—
সে-পুলক নেব মোর সর্বদেহ ভরি'
রক্তের লহরী
উঠিবে উচ্ছলি।
বসন্তে কুঞ্জের গলি
সুগন্ধিচ্ছায়ায়,

'জন্মদিন' কবিতা পাণ্ডুলিপিতে বর্জনচিহ্নিত রচনাংশ—
বর্তমান রচনাবলীর ১২৫ পৃষ্ঠার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে।

কবি আমি কারো গুরু নই।
জানি না কী আছে হোথা কৈবল্যের পারে
বৈকুণ্ঠের ধারে।

'পান্থ' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির পরে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত রচনাংশ

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্তের ঘাটে যে-প্রাণ নবীন,
চিরন্তন মানবের মহাসত্তা-মাঝে
এল কোন্ কাজে ?
এক আমি-কেন্দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্তের দল অগণন
সৃষ্টির নিগূঢ় শক্তি করিয়া বহন দিনরাতি
কী গাঁথনি তুলিতেছে গাঁথি আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে ঝংকৃত কায়ায়,
রূপে রসে বর্ণে নৃত্যে গন্ধে গানে বেষ্টিত মায়ায়।

'অপূর্ণ' কবিতার বর্জিত প্রথম অনুচ্ছেদ। দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৮— 'জন্মদিন'।

শুধু প্রাণরক্ষা আর বংশরক্ষা কাজে
তোমার চিত্তের শক্তি সাঙ্গ হয় নাই আত্ম-মাঝে,
যা রহিল বাকি
ধূলি তারে ফাঁকি দিবে নাকি।
সে চিত্ত অসীম-পানে বাতায়ন দিল খুলি,
প্রত্যহের আপনারে ভুলি'
নিত্যের নৈবেদ্যথালে
আপনার শ্রেষ্ঠ দান ভরি দিয়াছিল কালে কালে।

অসীম প্রাণের বার্তা যবে এসেছিল কানে
মরপ্রাণ তুচ্ছ করেছিলে আত্মদানে,
অর্থ তার কোথাও কি হবে না সমাধা,
মৃত্যু তারে দিবে বাধা,

ধুলায় কি হবে ধূলি
মহাক্ষণগুলি।

জন্মদিন এই বাণী
দিক তব চিত্তে আনি—
মর্ত্যের জরায়ু
আপনাতে বদ্ধ করি লুপ্ত করিবে না তব আয়ু,
অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ—
এ গর্ভবন্ধনে তার হলে অবসান,
আরবার নবজন্ম লবে
পূর্ণের উৎসবে।

'অপূর্ণ' কবিতার শেষ দুটি বর্জিত অনুচ্ছেদ।

আঁধার তিথিতে তারকাবীথিতে তন্দ্রাজড়িত চন্দ্র।
যূথীকলিগুলি দিতেছে আকুলি হিমগদ্‌গদ গন্ধ!
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, ঘন কুয়াশায়,
ঘুমে জাগরণে, কায়ায় মায়ায়,
তোমায় আমায় আলোয় ছায়ায়
যুগলে ঘটিল দ্বন্দ্ব।
জন্মমরণ-অতীত বেলায় স্মরণের পরপারে
তব ভাবনায় মোর চেতনায় এক হল একেবারে।

'তুমি' কবিতার বর্জিত প্রথম শ্লোক। দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৮— 'প্রাণলক্ষ্মী'।

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকূল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখি বাঁধা।
ভাবীকালের হাতে।

'দিনাবসান' কবিতার তৃতীয় অনুচ্ছেদের পরবর্তী বর্জিত অনুচ্ছেদ। দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩— 'জন্মোৎসবের দিনে'। অপিচ দ্রষ্টব্য : বৈকালী (আষাঢ় ১৩৮১), পৃ· ৪৭ ও ৯৭।

পরিশেষের কয়েকটি কবিতা সাময়িক পত্রে গদ্যভূমিকা-সংবলিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে গদ্যাংশগুলি মুদ্রিত হইল।

অবুঝ মন

জাহাজ চলছে, সমুদ্রের জল কেবলই ছল্‌ছল্‌ করে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। একটি ছোটো শিশু ; আমরা আছি আপন আপন কোণে একটিমাত্র কেদারা নিয়ে, কিন্তু সে আছে সমস্ত ডেক জুড়ে। তার অবুঝ মনখানি অসংলগ্ন অহৈতুক আগ্রহে ফ্যাল্‌ফেলে চোখের ভিতর দিয়ে বিশ্বের পরিচয় নিচ্ছে। আয়ার অঙ্কবিহারী সেই আটদশমাসের শিশুটির খেলা দেখে আমার অনেকটা সময় কাটে।

এটা বুঝতে পারছি যে, ওরই ঐ মনটি আদিমকালের বহু পুরাতন। আমার যে মন ওকে দেখছে আর ভাবছে, সেই হল নূতন ; অনেক চেষ্টায় অনেক শিক্ষায় ও সাধনায় এই বিচারবুদ্ধিমান মন গড়ে উঠছে, এখনো সে অসমাপ্ত। ওরই অবচেতন মনটির সঙ্গে মেলে গাছপালার মধ্যে যে নির্বোধ মন জলের দিকে তার শিকড় চালাচ্ছে, সূর্যের দিকে যার আকুতি, যা স্বপ্নচালিতের মতো আপন ফুলের ভিতর দিয়ে আপন ফলের উদ্দেশ্য সাধন করে। আমার নতুন মন গাছপালার মধ্যে ঐ পুরাতন সহজ মন দেখে গভীর শান্তি পায়, আনন্দিত হয়। শিশুর মধ্যেও সেই আদিম মনটি দেখতে তার এত ভালো লাগে। মেয়েদের প্রকৃতিতেও মনের এই আদিমতার প্রাধান্য, তাদের সহজ বোধ সহজ প্রবৃত্তি বিচারবুদ্ধির চেয়ে অনেক প্রবল। আমরা অনেকদিন থেকে ওদের সরলা অবলা বলে আসছি, সে কথার মানেই ঐ— যে-তর্কে দ্বিধা আনে ওদের স্বভাবে ভালো করে সেই তর্কবুদ্ধি দখল পায় নি। নতুন-বুদ্ধিওয়ালা পুরুষের মনের কাছে এই সহজ মনের সংস্পর্শ আরামের। নতুন-বুদ্ধিওয়ালা মনটা ক্লান্ত করে, বিভ্রান্ত করে, সংশয়ে আন্দোলিত করে ; এইজন্যে মানুষ অনেকসময় মদ খায়, এই উদগ্রবুদ্ধিমান মনটাকে বিহ্বল করে দিয়ে সেই আপন আদিম অবোধ মনের মধ্যে ছুটি নিতে চায়, যেখানে অরাজকতা।

শিশুর মধ্যে যাকে দেখছি, সেই আদিম মনটাকে আর-এক জায়গায় দেখছি যেখানে গণসংঘ। সেই গণেশের হাতির মুণ্ড, তার যূথবুদ্ধির মাথা, সে বশ মানতেও যেমন, মেতে উঠতেও তেমনি। তার প্রকাণ্ড শক্তির সঙ্গে তার নীরব বশ্যতার মিল পাই নে, তেমনি তার অকস্মাৎ দুর্দামতারও হিসেব পাওয়া যায় না। সেই অবুঝ মনটার সংস্কারগুলো, তার সমস্ত অন্ধ প্রবর্তনা গণসম্প্রদায়কে ঠেলে নিয়ে চলে। তারাই হল বাহন। নতুন মনটা সারথিগিরি করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘোড়া প্রায়ই চার পা তুলে ছোটে। নইলে য়ুরোপে সেদিন যে যুদ্ধকাণ্ড হয়ে গেল, তা হতে পারত না। আদিম মনটা যখন বুদ্ধিওয়ালা মনটাকে একেবারেই মানতে চায় না, তখন মানুষ যাকে সভ্যতা বলে তার ঘটে দুর্গতি। প্রাচীন গ্রীস তার অসামান্য বুদ্ধি সত্ত্বেও যদি মরে থাকে, তার কারণটা ছিল অবচেতন মনের মধ্যে, যেখানে তার গুহাচর প্রবৃত্তির, তার গর্তবাসী সংস্কারের বাসা। আজকের দিনে য়ুরোপ কোনোমতেই স্থায়ী শান্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারছে না, তার কারণ সংস্কারগুলো লাগাম দাঁতে চেপে ধ'রে ছুটতে চায়।

সভ্যতা এর উলটো কারণেও মরে। নতুন মন যখন সনাতন সহজ মনের শক্তিকে আপন জটিল কর্মজালে সম্পূর্ণ চাপা দিতে চায়, আপন রথের চাকার তলায় তাকে খণ্ড খণ্ড করে, তখন তার শক্তির আদিম আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়। আকাশগামী চূড়াটা ধুলোর আশ্রয় ছাড়িয়ে উঠতে চায়; ক্ষতি নেই, কিন্তু যখন সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করে তখনি ফিরে তাকে সেই ধুলোয় এসে পড়তে হয়। আদিম অবুঝ মনের সঙ্গে নতুনবুদ্ধিমান মনের পদে পদে রফা-নিষ্পত্তি করে চলাই পাকাচালে চলা। এই তো গেল আমার চিন্তার কথা। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে যখন তাকিয়ে দেখতুম তখন যে-আনন্দ বোধ করতুম সেটা চিন্তার আনন্দ নয় ; তখন আমি বিশ্বব্যাপী আদিম প্রাণের বৃহৎ রঙ্গলীলা শিশুর দুটি চোখের বুদ্ধিবিহীন চঞ্চল ঔৎসুক্যের মধ্যে দেখতে পেতুম। শিশুর মধ্যে সেই বিশ্বশিশুকে দেখার আনন্দেই এই কবিতাটি লিখেছি।

—বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

আরেক দিন

যখন বছর দুয়েক হল দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেছিলুম তখন মনের মধ্যে কোনো ভার ছিল না। যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আমার কাছ থেকে বক্তৃতা চান না, আমাকেই চান। দেশের দিক থেকেও কোনো অনুরোধ নিয়ে আসি নি, কেবল জাহাজে ওঠবার আগে একটি বাঙালী মেয়ের চিঠি পেয়েছিলুম, সে ইচ্ছে জানিয়েছিল আমি যেন ডায়ারি লিখি। তার পরে ভেসে পড়লুম সমুদ্রে। মন অনেকদিন এমন মুক্তি পায় নি। সামনে পিছনে কর্তব্যের তাগিদ নেই, আশেপাশেও তথৈবচ। বহুকাল পূর্বে, তখন বয়স অল্প, ঘরে কিংবা বাইরে খাতির করবার লোক নেই— লেখা আরম্ভ করেছি কিন্তু সে লেখা দূরে পৌঁছয় নি। আমার কাছে দেশের লোকের বা বিদেশের লোকের কোনো প্রত্যাশা ছিল না। পাঠক জমতে আরম্ভ করে নি তা বলা যায় না, কিন্তু পাঠকমণ্ডলী-নামক প্রকাণ্ড একটি শনিগ্রহ আমার জীবনকে তার উপগ্রহদলে ভরতি করবার জন্যে টান মারে নি। তখন মাসিকপত্র দুটি-চারটি, তার মধ্যে যারা প্রবলকণ্ঠশালী তারা ছিল আমার নিয়ত প্রতিকূল। সাপ্তাহিক যে-কয়টি ছিল তারা কেউ আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তাই আমার দায়িত্ব ছিল প্রধানত আমার নিজের কাছেই। তখন না ছিলেম অখ্যাত, না ছিলেম বিখ্যাত, ছিলেম প্রত্যাখ্যাত। তখন বাংলাদেশের নির্জন নদীর চরে ছিল আমার যাওয়া-আসা। সম্পূর্ণ নিজের মনেই লিখে যেতুম, শোনবার লোক কেউ ছিল না তা নয়, ছিল দুটি-চারিটি। আমার মন ছিল পাখি ; তার না ছিল খাঁচা, না ছিল পায়ে শিকল— না ছিল তার 'পরে শৌখিনের দাবি, না ছিল তার জন্যে প্রশংসার বাঁধা খোরাক। তার পর চল্লিশ বছর হয়ে গেল। এবার চলল সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ ; পরিচিত সঙ্গী কেবলমাত্র একজন, এল্‌ম্‌হর্স্ট, বাংলাভাষায় তার কান ছিল না। ডাঙার কোলাহল বহুদূরে। তার উপর শরীর হল অসুস্থ, তাতে ক'রেও সংসারের দায়িত্ব আরো অনেক দূরে দিলে সরিয়ে। বহুবৎসর পরে তাই ছুটি পাওয়া গেল, অল্পবয়সের হালকা জীবনের ছুটি। অমনি কলম আপনি ছুটল কবিতার চেনা রাস্তায়। ক্যাবিনে বসেও কবিতা লেখা চলে, এইবারে তার প্রথম আবিষ্কার। ক্যাবিনের খাঁচা বাইরের খাঁচা, সেটা ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি মনের মধ্যে পর্দা উঠে যায়, যদি ছুটির আকাশ থেকে হুহু করে হাওয়া ছুটে আসে। সেদিন শুধু কাব্য লিখি নি, গদ্যও লিখেছি ; সেই কবিতা আর গদ্য ছিল ভাইবোন, সগোত্র।

এইবারে সেই ছুটি ঠিক মিলল না। মন ডানা নড়াতে গিয়ে দেখে ডানার উপরে কর্তব্যের ফরমাশ গট হয়ে চেপে ব'সে ; মনের আপন খেয়ালের জায়গা খুব সংকীর্ণ। দূর হোকগে— বোঝাটাকে নিয়ে দেশদেশান্তরে আর বয়ে বেড়াতে পারি নে। কাল ডেকের উপর কেদারায় বসে মনে মনে বললুম, বিশ্বের কাছে আমার দায়িত্ব আছে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এই কথাটা ভুলব। তাই একটা ছোটো কালো খাতা নিয়ে ঝুঁকে পড়া গেল, গৌড়জনকে নিরবধি মধু খাওয়াব সংকল্প করে নয়, অদৃষ্টের কাছে আজও ছুটির পাওনা দাবি করতে পারি এইটি প্রমাণ করবার জন্যে।

তার পরে সন্ধে হয়ে এল। দূরে দেখা যায় তটরেখা, নীল পাহাড় ঝাপসা হয়ে এসেছে। হাওয়া উঠেছে, সমুদ্রে দিয়েছে ঢেউ। ডেকের উপর আলো জ্বলল। আবার একবার কলম হাতে খাতা খুললুম।

—বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৪

তে হি নো দিবসাঃ

অপরাহ্ণে আর-একটা কবিতা লিখে বসেছি। কর্তব্য হাতে না থাকলে অকাজের প্রাদুর্ভাব কিরকম প্রবল হয় তারই এটা প্রমাণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন কর্তব্য সম্বন্ধে ওড্ লিখেছিলেন তখন তাঁকে যদি মুলোর চাষ করতে হত, তা হলে অতবড়ো দুর্ঘটনা ঘটত না। পোড়ো বাড়িতেই ভূতে বাসা করে।

—বিচিত্রা, ফাল্গুন ১৩৩৪

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পরিশেষের 'দুয়ার' কবিতাটির শ্লোক-চারিটি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে চারিটি দ্বারের উদ্দেশে রচিত হইয়া দ্বারগুলির শীর্ষফলকে অঙ্কিত হইয়াছে।

সংযোজন

পরিশেষ প্রকাশের বৎসরে (১৩৩৯) ও তৎপূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতা বনবাণী বা পরিশেষে সংকলিত হইতে পারিত অথচ কোনো কবিতাগ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের কতকগুলি প্রচলিত পঞ্চদশ-খণ্ড (সুলভ সংস্করণ বর্তমান খণ্ড) রচনাবলীর সংযোজন-বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশেষে গ্রন্থের কবিতাগুলির ভাবানুষঙ্গ বিচারে অব্যবহিত পরবর্তী কালের কয়েকটি রচনাও এই অংশে সংকলিত হইয়াছে। একই কারণে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' হইতে 'লক্ষ্যশূন্য' এবং 'জাভা-যাত্রীর পত্র' হইতে 'নূতন কাল' কবিতা দুটিও মুদ্রিত হইল।

সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত কবিতার তালিকা পত্রিকার নাম, প্রকাশকাল ও সম্ভাব্যস্থলে পৃষ্ঠাঙ্ক-সহ নিম্নে মুদ্রিত হইল। পত্রিকায় প্রকাশকালে শিরোনাম [ ] বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হইল :

প্রাচী	প্রাচী। আষাঢ় ১৩৩০
আশীর্বাদ (পৃ· ২১২)'	প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৪৮। ৪৯৮
আশীর্বাদ (পৃ· ২১২)	বিচিত্রা। শ্রাবণ ১৩৩৫। ১৫৯
প্রবাসী[১২]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৩। ১
বুদ্ধজন্মোৎসব[১৩] [বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব]	প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৪। ১
প্রথম পাতায়[১৪]	প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। ১৫৭
নূতন	কল্লোল। বৈশাখ ১৩৩৫
শুকসারী [শুক ও সারী]	উত্তরা। আশ্বিন ১৩৩৮। ৩১১
সুসময়	বিচিত্রা। আষাঢ় ১৩৩৫। ১
পরিণয়মঙ্গল	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৩৪। ৫৪৮
গৃহলক্ষ্মী	বঙ্গলক্ষ্মী। বৈশাখ ১৩৩৪
রঙিন	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৩৮। ৫৭৩
আশীর্বাদী	উপাসনা। আশ্বিন ১৩৩৮
বসন্ত-উৎসব	বিচিত্রা। বৈশাখ ১৩৩৯। ৪২৯
আশীর্বাদ (পৃ· ২২৪)	প্রবাসী। অগ্রহায়ণ ১৩৩৯। ১৭৭
আশীর্বাদ (পৃ· ২২৫)	বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৯
উত্তিষ্ঠত নিবোধত [আশীর্বাদ]	প্রবাসী। মাঘ ১৩৪৮। ৩৭৭
প্রার্থনা	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৪০। ১৪১
অতুলপ্রসাদ সেন	উত্তরা। আশ্বিন ১৩৪১। ২০৫

'জীবনমরণ' ১৩৪৮ আশ্বিনের মেঘনা পত্রিকায় 'বসন্ত' নামে প্রকাশিত হয়, সেখানে উহার তারিখ— দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪। 'জীবনমরণ' ও 'সুসময়' কবিতাদুটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পূর্বপাঠ মুদ্রিত হইল :

১২ প্রবাসী পত্রিকায় পঁচিশবৎসর পূর্তি উপলক্ষে আশীর্বাণী।
১৩ দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয়-সংস্করণ নটীর পূজা, পৃ· ৫৬
১৪ 'ছোটো একটি মেয়েকে লেখা' কয়েকটি পত্রের সহিত প্রকাশিত।

জীবনমরণ

জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা
বসন্ত নাচিয়া চলে চরণ চঞ্চল।
মাটির বন্দিনী ধরা তাই তো অধীরা
সাথে চলে যেতে চায় ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল।
আজি হেরো করে কোলাকুলি
এক দোলে দোঁহে দোলাদুলি
জীর্ণ পাতা কিশলয় কচি,
আজি হেরো শিরীষের বনে
নূতনের সাথে পুরাতনে
উৎসবের ডালি দেয় রচি।

বিদায় টেনেছে মিড় মিলনের তারে,
আনন্দের সুরে লাগে মূর্ছিত মূর্ছনা।
যুগল কপোতকণ্ঠে করুণা সঞ্চারে
ছায়াতলে বনলক্ষ্মী উৎসুক উন্মনা।
মোর প্রাণে যাওয়া আর আসা
একসুরে খোঁজে দোঁহে ভাষা,
একতালে দোলে কান্নাহাসি।
যে আছে যে নাই দোঁহে মিলি
মোর ভাবনায় নিরিবিলি
বাজাইছে ফাল্গুনের বাঁশি।

৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

সুসময়

'দাও লেখা দাও' দেয় কত জন তাড়া,
চার দিকে চাই, না পাই বাণীর সাড়া।
চায় যবে কেউ অমনি ধরাই পড়ে
নই তো সে-জন লেখন যে-জন গড়ে—
লক্ষ্মীছাড়ার মিথ্যে দুয়ার নাড়া।

চাবার মানুষ চায় না যখন কেহ
'তীখন কথার লিখন ভিক্ষা দেহো',
হাটের পথিক নাই যবে কেউ বাকি,
একলা শাখায় বউ-কথা-কও পাখি,
হরিণশিশুর নাই মনে সন্দেহ—
ক্লান্ত সমীর শান্ত কোমল শ্বাসে
অস্ফুট সুর জাগায় যখন ঘাসে—
তখন হঠাৎ আলগা দুয়ার খোলা—
স্বপনমগন-নয়ন, আপন-ভোলা
লেখক যে-জন বাহির-ভুবনে আসে।

যখন-তখন লুকিয়ে তাহার আসা,
প্রদোষ-আলোয় পথহারা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
নাই জানা নাই কোথায় সে-ফুল তোলে—
চক্ষে তাহার কোন্ ইশারার ভাষা।

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যাসোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
মেঘের উপর যতই দারুণ দাবি,
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন আপন অবগুণ্ঠন টানে।

তার পরে যেই শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দকলির স্নিগ্ধ শীতল কথা,
আকাশ সে কোন্ স্বপন-আভায় হাসে—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ খেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোক ছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে—

হঠাৎ তখন সূর্য-ডোবার কালে
দীপ্তি জাগায় দিক্‌ললনার ভালে।
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
পরম আশার চরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

পূর্বোদ্‌ধৃত 'সুসময়' কবিতার প্রথম চারটি শ্লোকের পরিবর্তিত স্বতন্ত্র রূপ পাণ্ডুলিপির অন্যত্র স্বাধীন কবিতার আকারে পাওয়া গিয়াছে; তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'লিখন দেহো, লিখন দেহো' ডাকে,
খুঁজে না পাই বাণী কোথায় থাকে।
চায় কেহ যেই তখন ধরা পড়ে
নই আমি সেই লেখা যে-জন গড়ে,
লেখনী মোর শরমে মুখ ঢাকে।

চাবার মানুষ নাইকো যখন কেহ,
বলে না কেউ 'লিখন দেহো দেহো',
তখন দেখি মনের দুয়ার খোলা,
স্বপন-লাগা নয়ন ভাবে ভোলা
লেখক আসে অভয় অসন্দেহ।

হঠাৎ তাহার গোপন যাওয়া আসা—
কোন্ গভীরে অজানা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
কেউ জানে না কোথায় সে ফুল তোলে,
চক্ষে তাহার কোন্ ইশারার ভাষা।

এই কবিতাটির অন্য একটি পাঠ "লিখন" নামে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "কখনো কখনো সময়ের একটু আধটু ফাটল দিয়ে বুনোলতার মতো দুই একটা কবিতাও বেরোচ্চে। তারি একটা তোমাকে পাঠাই। একজন মেয়ে লিখ্তে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে পাঠিয়েছি।" —দ্র চিঠিপত্র ১১, পৃ· ৪৮-৫১

'লক্ষশূন্য' ও 'নূতনকাল' কবিতাদুটির সূচনাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন,'যাত্রী'[১৫] গ্রন্থ হইতে তাহা যথাক্রমে অংশতঃ উদ্‌ধৃত হইল :

লক্ষ্যশূন্য

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁঠকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা hurdle race খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধকালের নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণবর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লিবাসীদের প্রতি কথায় কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যাপ্রচারের শয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি। এমন-কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রাপাগাণ্ডা রেয়াত করে না। এই-সব নীতি হচ্ছে সবুর না করা নীতি— এরা হল পাপের দ্রুত চাল, এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে 'বাহবা'।

—পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

১৫ 'যাত্রী' গ্রন্থের অঙ্গীভূত 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র'— রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালার স্বতন্ত্র দুইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

নূতন কাল

... আমরা যারা এখানে [বালীদ্বীপে] বাহির থেকে এসেছি, আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি ; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে 'আমি হার মানলুম' ; সে দীনভাবে বলছে, 'এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।' নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব— বৈরাগ্যমেবাভয়ং, অর্থাৎ বৈনাশ্যমেবাভয়ং।

... এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভবরকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে— যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধরে,বর্তমানকালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বার বার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি...

—জাভা-যাত্রীর পত্র। ৩০ অগস্ট, ১৯২৭

'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' কবিতাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ রমা দেবীকে নিম্নমুদ্রিত পত্রটি (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) লিখিয়াছিলেন :

যে-আশীর্বাদ তোমাকে পাঠালুম এখনি তার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি নেই, রইল তোমার কাছে। এর মধ্যে যে কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই, ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, একে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় একে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তা হলেই এই দান সার্থক হবে— নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য পেয়েও হারানো হবে। 'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' এই মন্ত্রের অর্থ এই— 'ওঠো, জাগো।' জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধনা করতে হয়।

'প্রবাসী' কবিতাটিকে ভাঙিয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দুটি গান রচনা করিয়াছিলেন ; প্রথম-সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' (পৃ· ৭৯০) এবং 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' (পৃ· ৮৪৪) গানদুটি দ্রষ্টব্য।

'নূতন' কবিতাটিরও একটি পরিবর্তিত সংগীতরূপ প্রথম সংস্করণ গীতবিতানে (পৃ· ৮৪৪) পাওয়া যায়। গানটির প্রথম ছত্র— 'দূর রজনীর স্বপন লাগে'।

উল্লিখিত গানগুলি অধুনাপ্রচলিত গীতবিতানের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যাইবে।

পুনশ্চ

পুনশ্চ ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে, পরিশেষ গ্রন্থ হইতে— খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু এবং নূতন-লিখিত তীর্থযাত্রী, চিররূপের বাণী, শুচি, রঙরেজিনী, মুক্তি, প্রেমের সোনা ও স্নানসমাপন এই তেরোটি কবিতা সংযোজিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই খণ্ডে উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত হইল।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব-অনুচ্ছেদে প্রথম-সংস্করণ পরিশেষের যে ছয়টি কবিতার উল্লেখ, তাহার কোনোটি গদ্যছন্দে লেখা নয় ; 'মিল'-ছুট হইলেও ছন্দ-ছুট নয় ; ছন্দের কলামাত্রিক সাধু রীতিই অনুসৃত। পুনশ্চ কাব্যে পূর্বাবধি এরূপ 'মিল'-হীন অথচ ছন্দোবদ্ধ কবিতা আছে আরো আটটি— কোমলগান্ধার (পৃ ২৫৩), শালিখ (পৃ ২৭৯), অস্থানে (পৃ ৩১৪), ঘরছাড়া (পৃ ৩১৫), ছুটি (পৃ ৩২৯), গানের বাসা (পৃ ৩৩০), পয়লা আশ্বিন (পৃ ৩৩১) প্রত্যেকটি দলমাত্রিক ছড়ার ছন্দে ; তাহা ছাড়া, মৃত্যু (পৃ ৩১৭) পূর্ববৎ (পূর্বে পরিশেষ কাব্যে যেমন) কলামাত্রিক সাধু রীতিতে।

যথার্থ গদ্যছন্দে লেখা কবির প্রথম কবিতা সম্ভবত শিশুতীর্থ (পৃ ৩১৯)।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের রচনারীতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন অতঃপর নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

গানের আলাপের সঙ্গে পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয় নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ, বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ-পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাকের একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয় যখন 'এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান'। যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে এ কথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকন-পরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না ; তার যেটি আদর্শ এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ ব'লেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বর-ক'নে টোপর মাথায় আল্পনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ও দিকে আকাশ থেকে আসছে শাহানা রাগিণীতে শানাইয়ের সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত-ছন্দ-ওয়ালা কাব্যে সেই শানাই-বাজনা সেই মন্ত্র-পড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়-লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্যোমিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে ? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর

মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহঅনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল, কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে শাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন-কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই ব'লেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদ্‌জনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন-কি, বাম দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই, অথচ সংসারযাত্রা আছে, এমনও ঘটে। কিন্তু, সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু, যে সংসারটা প্রতিদিনের অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না, তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তন-স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন-কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু, সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রঙফলানো চওড়া বলেই লোকে ঐটের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে উত্তররামচরিত রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ঐ দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়— কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু-নিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর : সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ কায়দা চাই। চারি দিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু, এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল ; তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে ? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মাল-মসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির প্রান্ত-তুলে-ধরা আধ-ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো-একটা পুনশ্চ নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না এমন পণ করি নি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারি নে। যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা

এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মদ্‌রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম বিচিত্রিতা। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে, আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।... খড়দহ, দেওয়ালি, ১৩৩৯

—পরিচয়। বৈশাখ ১৩৪০

'বাসা' (১৯ অগস্ট ১৯৩২। ৩ ভাদ্র ১৩৩৯) কবিতা রচনার দুই বৎসর পূর্বে কবি বর্লিন হইতে প্রতিমা দেবীকে একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিখানি উক্ত কবিতার প্রাথমিক খসড়া বলা যাইতে পারে—

... থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ— খাড়া দাঁড়িয়ে, তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেয়ালের উপর,— জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে সমস্ত দুপুরবেলা ; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে— কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে, জারুল পলাশ মাদারে চলেছে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায় ; অশথগাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করছে— আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেচে চামেলি লতা। নদীতে নেবেচে একটি ছোটো ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারই এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম-কেদারা— মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পুব দিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে লীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটিরে তার বাসা— যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশকালে সাহিত্য-আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে— নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো— সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে, জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসছে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চ'রে বেড়াচ্ছে আমার পাটল রঙের গাইগোরু, তার বাছুর নিয়ে। শাক-সব্জির খেত আছে, বিঘে-দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়াদাওয়া নিরামিষ, ঘরে-তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট— রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়ছে আছি বর্লিনে— বড়োলোক সেজে— বড়ো কথা বলতে হবে— বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন— জগৎ-জোড়া সব সমস্যা রয়েছে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ও দিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী— তার অনেক দাবি, অনেক দায়— ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কতদিনই বা বাঁচব— ইতিমধ্যে কর্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক— রেলে চ'ড়ে, মোটরে চ'ড়ে, জাহাজে চ'ড়ে, ব্যোমযানে চ'ড়ে— সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি ১৮ অগষ্ট ১৯৩০ [১ ভাদ্র ১৩৩৭]

—পত্রসংখ্যা ৩৬। চিঠিপত্র ৩

এভাবে ১৩৩৯ ভাদ্রের বিভিন্ন রচনা, সুন্দর/ বিচ্ছেদ (৭ ভাদ্র), নাটক (৯ ভাদ্র), পত্র (১০ ভাদ্র), ফাঁক (১১ ভাদ্র), এগুলির বিশেষ তুলনাস্থল নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে-সকল পত্র, সেগুলির তারিখ যথাক্রমে ৩২ আষাঢ়, ৮ শ্রাবণ, ২৩ শ্রাবণ ও ১৫ শ্রাবণ ১৩৩৬, অপিচ ২৭ চৈত্র ১৩৩৭। অধিকাংশ পত্র 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে সংকলিত আর সবগুলি পাওয়া

যাইবে সাপ্তাহিক দেশ পত্রে প্রকাশিত (২৫ চৈত্র ১৩৭৬ - ৩০ আষাঢ় ১৩৬৮) 'পত্রাবলী'তে। স্বতন্ত্র-প্রচারিত পুনশ্চ গ্রন্থে এই-সকল পত্র হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হইয়াছে।

প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যের কারণেও পুনশ্চ স্বতন্ত্র সংস্করণ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

'শিশুতীর্থ' কবিতার বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে বর্তমান গ্রন্থপরিচয়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে। ঐ কবিতার মূলে আছে The Child, যাহার রচনা ১৯৩০ খৃস্টাব্দে জর্মনির মিউনিক শহরে। এই রচনায় বিশেষ প্রেরণা জোগাইয়াছে জর্মনিতে খৃস্টজীবনের অপূর্ব নাট্যরূপ-দর্শন, ইহা অনেকেই জানেন। ইহার কয়েক মাস পরেই (১ ডিসেম্বর ১৯৩০) নিউইয়র্ক শহরে এক বক্তৃতায় কবি বলেন—

The babe who was born centuries ago, brought exaltation to man. Not machinery, not associations, not organizations, but a human babe, and people were amazed. And when all the machinery will be rusted, he will live.

—*The Modern Review*, July 1931, p 48

শিশুতীর্থ বিচিত্রা মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত পরে, কবি যে নিবন্ধে উহার মর্মব্যাখ্যা করেন বলা যায়, তাহার অংশবিশেষ এ স্থলে সংকলনযোগ্য—

তীর্থযাত্রী

পশু যে যুগে একদা জন্মায়, চিরকাল সেই যুগেই সে থাকে। লক্ষ বৎসর ধরে বাঘ বাঘই আছে। মানুষ যুগে নব নব জন্মের ভিতর দিয়ে আপন আবরণ মোচন করতে করতে চলে। অতীতের খাঁচায় শিকল দিয়ে সে বাঁধা থাকে না। তার অভিসার নবজন্মের অভিমুখে।...

সংসারে যখন শান্তি নেই, দৈন্য মরুবালুকায় অন্নের ক্ষেত লুপ্ত করেছে, অজ্ঞানের স্তূপাকার নিরর্থকতায় আলোকের পথ অবরুদ্ধ, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি, হে নবজাত, হে নবজীবনের দূত, কোথায় তুমি?— মাতার বেদনার ভিতর দিয়ে তুমি কি এসেছ, হে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষ 'তমসঃ পরস্তাৎ'?

যাঁরা মহান্ পুরুষ তাঁরা আপন জন্মে সমস্ত মানুষের জন্যে নবজন্ম এনেছেন। তাঁরা মানুষকে দান করেছেন অমর জীবনের অর্ঘ্য।

কাকে বলে অমর জীবন? মানুষের একটা জন্ম হল দৈহিক জীবনে। কালের দ্বারা সে জীবন পরিমিত, দিন গণনা করে তার দৈর্ঘ্য। তার দ্বিতীয় জন্ম অমিতায়ু। এই জন্মের জীবনকে পরিপূর্ণতার আদর্শে বিচার করতে হয়— জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেশকালের সীমা সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই জীবনকে কোনো মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে ধারণ করে রাখতে পারে না; এইখানে সকল মানুষের চিরজীবনে সে জীবিত।

অমর জীবনের ফল ফলে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সৌন্দর্যসৃষ্টিতে, বিশ্বকর্মে। মানুষ এর জন্যে প্রাণ দিয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, ভুলেছে নিজের স্বার্থ, প্রমাণ করেছে তার দ্বিজত্ব। লাভের লোভে, শক্তির দম্ভে, বুদ্ধির বিকারে যখন তার দ্বিজত্বকে আচ্ছন্ন করে, তখন তার পশুধর্ম একেশ্বর হয়ে ওঠে।

পশু যখন আপন পশুত্বে সম্পূর্ণ বিরাজ করে তখন তাতে তার কোনো ক্ষতিই হয় না। কিন্তু মানুষের সংসারে পশুপ্রভাব সর্বনাশ আনে; হয় জড়ত্বের তামসিকতায় সে জীবনমৃত হয়ে থাকে, নয় বন্যায় গিরিগাত্রের শিলাস্খলনের মতো দুর্নিবার আঘাতে প্রতিঘাতে পরস্পরের মধ্যে প্রলয় ঘটিয়ে তোলে। তখন ভাঙন ধরে তার সমস্ত রচনায়, দেবতার সিংহাসন দখল করে দানবে, পরস্পরের মধ্যে অকারণ ঈর্ষা কলহ আলোড়িত হয়ে ওঠে, উদ্দাম রিপুর বল্‌গা খসিয়ে ফেলাকে মানুষ মনে করে পৌরুষ। এমনি করে কত প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতিষ্ক আপন আলো নিবিয়ে অখ্যাতির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে, কত সভ্যতা এমনিই রুদ্র সংঘাতে আপন চিতা জ্বালিয়ে আত্মহত্যার পথে চলেছে।...

তখনই অমৃতের জন্যে প্রার্থনার সময়। সেই অমৃত যন্ত্রে তৈরি হয় না। দূত জন্মলাভ করেন সেই অমৃত আপন প্রাণপাত্রে বহন ক'রে। বিশ্বাসী ভক্ত অপেক্ষা করে থাকেন নবজন্মের অরুণোদয়ের

জন্যে— কেননা তিনি এই দৈববাণী শুনেছেন : সম্ভবামি যুগে যুগে। সনাতন মানব নূতন জীবনে জন্মলাভ করেন বারে বারে।

মানুষের ইতিহাস এমনি করেই অমৃতের অভিমুখে প্রবাহিত। 'মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়' এই তার বাণী কত নব নব সভ্যতায় রূপধারণ করেছে— মৃত্যুধর্মী যে জীবন তার থেকে জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে, আনন্দের পথে, তাকে সোপানে সোপানে উত্তীর্ণ করে দিল।

'মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়' এই মন্ত্রকে মানবের মাঝে দাঁড়িয়ে যে মন্ত্রদ্রষ্টা উচ্চারণ করলেন অবিশ্বাসী তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, অন্ধ তাঁকে মেরেছে। কিন্তু মৃত্যুর দ্বারাই তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। দুঃখের দ্বারা তিনি সত্যকে প্রমাণ করেছেন।

সেই মৃত্যুঞ্জয় যাঁরা, কোন্ দিকে তাঁরা মানুষকে পথ দেখালেন ? পুরাতন পদ্ধতির দিকে নয়, নূতন ব্যবস্থার দিকে নয়— নবজন্মের দিকে।

আদিকাল থেকে মানব-সংসারে যাত্রীরা চলেছে সার্থকতার তীর্থ খুঁজে। নানা দেশে, নানা কালে। সে তীর্থ কুবেরের ভাণ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়। সে তীর্থ সেইখানে, পুরাতন মানব যেখানে নূতন হয়ে জন্মলাভ করেছেন— যিনি ঘোর দুর্দিনে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানিয়েছেন : সম্ভবামি যুগে যুগে। ক্লান্ত আসছে, পীড়িত আসছে, ক্ষুধাতুর আসছে দীর্ঘ রাত্রি কাটিয়ে দীর্ঘ পথ বেয়ে নগ্ন শিশুর কাছে ; প্রশ্ন করলে, 'তুমি এসেছ ?' মাতা বললেন, 'তুমি আমার ধন।' সকলে বললে, 'জয় হোক নবজাতকের।'

এই কথাটি আছে কালিদাসের কুমারসম্ভবে। দেবতা পরাভূত, স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট।... সুরেন্দ্র প্রশ্ন করলেন— সুরলোককে কে উদ্ধার করবে ? উত্তর এল— মন্ত্রতন্ত্র নয়, দেবসমিতি নয়, কোনো কর্মপদ্ধতি নয়, অমরাবতী অপেক্ষা করে আছে নবজাত কুমারের প্রত্যাশায় ; দৈত্যপীড়িত দেবসমাজের তীর্থ মাতার অঙ্কলীন সেই শিশুর কাছে। শিশু জন্ম নিল, সপ্তর্ষির জ্যোতিরুজ্জ্বল আশীর্বাণী ধ্বনিত হল লোকে লোকান্তরে— 'জয় হোক নবজাতকের !'

—বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ· ২৮৫-৮৬

সাময়িক পত্রে যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, মাস বর্ষ ও সম্ভব হইলে পৃষ্ঠাঙ্কসহ তাহার তালিকা এবং ২, ৬, ১৪ ও ১৫ -সংখ্যক কবিতা সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য নিম্নে দেওয়া গেল।—

১· ক্যামেলিয়া	বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৩৯। ৪৪৩
২· চিররূপের বাণী	পরিচয়। মাঘ ১৩৩৯। ৪৫৫
৩· ছুটি	কবিতা। পৌষ ১৩৪২
৪· ছুটির আয়োজন	বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৯। ৩০৭
৫· ছেলেটা	পরিচয়। কার্তিক ১৩৩৯। ২৮৩
৬· তীর্থযাত্রী	পরিচয়। মাঘ ১৩৩৯। ৪৫৪
৭· পুকুর-ধারে	বিচিত্রা। আশ্বিন ১৩৩৯। ২৯১
৮· প্রথম পূজা	প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৯। ৭৩৭
৯· প্রেমের সোনা	প্রবাসী। ফাল্গুন ১৩৩৯। ৬০৯
১০· ভীরু	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৯। ৫৯৭
১১· মানবপুত্র	প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৯। ৬১২
১২· মুক্তি	বিচিত্রা। ফাল্গুন ১৩৩৯। ১৬০
১৩· রঙরেজিনী	প্রবাসী। চৈত্র ১৩৩৯। ৮০৫
১৪· শাপমোচন	বিচিত্রা। মাঘ ১৩৩৮। ৪
১৫· শিশুতীর্থ	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৮। ১৪৩
১৬· শুচি	প্রবাসী। পৌষ ১৩৩৯। ৩২১

১৭· সাধারণ মেয়ে	প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৯। ১
১৮· স্নানসমাপন	বিচিত্রা। চৈত্র ১৩৩৯। ২৮৯

২ পরিচয় পত্রে শিরোনাম : রূপবাণী। দেহবিমুক্ত রূপের সহিত দেহমুক্ত বাণীর মিলনে কোন্ বিজ্ঞানসংগত প্রযুক্তিবিদ্যার ইঙ্গিত তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন।

৬ এ কবিতাটি টি· সে· এলিয়টের The Journey of the Magi কবিতার অনুবাদ।

১৪ রাজা (পৌষ ১৩১৭) নাটকের কথাবস্তুকে নৃত্যনাট্যোপযোগী এই রূপ দেওয়া হয় ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া ইহার প্রথম অভিনয় হয় ১৩৩৮ সনের ১৫ ও ১৬ পৌষ তারিখে। সে সম্পর্কে সমুদয় তথ্য, পাঠভেদ প্রভৃতি প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাবিংশ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

১৫ বিচিত্রায় শিরোনাম ছিল : সনাতনম্ এনম্ আহুর্ উতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ। অথর্ববেদ।— (ইতি সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্নব।) ইহা মৌলিক ইংরেজি রচনা The Child-এর রূপান্তর তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। The Child বিলাতে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৩১ খৃস্টাব্দে। অমিয় চক্রবর্তীর এক পত্রে জানা যায়, রচনা মিউনিক শহরে ১৯৩০ জুলাইয়ে। চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ১৩৩৮ গীতোৎসব উপলক্ষে (২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন তারিখে) শিশুতীর্থের বিষয়বস্তু লইয়াই কবির পরিকল্পনা ও প্রযোজনা -অনুযায়ী কলিকাতায় সর্বসমক্ষে নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়— ইহা উল্লেখযোগ্য। 'গীতোৎসব' অনুষ্ঠানপত্রে (প্রচল রবীন্দ্রজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত) কবির আপন ভাষাতেই এই পরিকল্পনার একটি ছক পাওয়া যাইবে।

বসন্ত

বসন্ত ১৩২৯ সালের (১৯২৩) ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে উহা 'ঋতু-উৎসব' গ্রন্থে (১৩৩৩) সংকলিত হইয়াছে।

'গানগুলি মোর শৈবালেরি দল' গানটি ঋতু-উৎসবের পাঠে বর্জিত হইয়া থাকিলেও ১৩২৯ সালের পাঠ অনুযায়ী রচনাবলী-সংস্করণ বসন্ত গ্রন্থে যথাস্থানে মুদ্রিত হইল। বলাকার ১৫-সংখ্যক[১৬] কবিতার সহিত গানটি তুলনীয়।

রক্তকরবী

রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে [ডিসেম্বর ১৯২৬] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়াছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। কালানুক্রম অনুসারে রচনাবলীতে রক্তকরবী বসন্তের পরেই মুদ্রিত হইল।

বর্তমান সংস্করণের 'নাট্যপরিচয়' অংশ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রক্তকরবী পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা' ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি 'অভিভাষণ'[১৭]। নিম্নে উহা মুদ্রিত হইল :

"আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা

১৬ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, পৃ· ৩৪ (সুলভ ষষ্ঠ খণ্ড পৃ· ২৬৭)।

১৭ দ্রষ্টব্য, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২— 'রক্তকরবী'।

পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর লেজে করে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ করে এলেন— গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী বলে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে সে ধন-হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কিরকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের ? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা ? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল ?

আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে ; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। বাল্মীকির পক্ষে এ সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।

বারোয়ারির প্রবীণমণ্ডলীর কাছে এ কথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারি নে, বিধাতা তাঁদের এইরকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক করবার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে পুনর্বার হয়তো তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আর-এক বাঙালি কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন, তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনই আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর-একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহ-মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা ; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের ; রাম ও রাবণ এক দিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারি দিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে উর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয়

নন্দিনী সেখানকার নয়— মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"

যাত্রী গ্রন্থে 'পশ্চিমী-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত রক্তকরবী সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল :

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি ; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল ; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

চিরকুমার-সভা

চিরকুমার-সভা উপন্যাস আকারে ভারতী পত্রে (১৩০৭ বৈশাখ - ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে ইহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর (হিতবাদীর উপহার) 'রঙ্গচিত্র' বিভাগের অন্তর্গত হয় এবং 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নাম লইয়া ১৩১৪ সালে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে (গদ্যগ্রন্থাবলী ৮) প্রকাশিত হয়। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ডে) 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানির কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করিয়া এবং কিছু নূতন-লিখিত অংশ যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বা ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে একখানি নাটক রচনা করেন ; অনেকগুলি নূতন গানও ইহাতে যোগ করেন। নাটকটি 'চিরকুমার-সভা' নামে ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ; ইহাই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসটি আর প্রচলিত না থাকায়, 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' হইতে বর্ণনাংশও অনেকখানি এই নাটকে সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া, রচনাবলী-সংস্করণে চিরকুমার-সভা হইতে উক্ত বর্ণনাংশ বর্জিত হইয়াছে ; শুধু যে-সকল অংশ অভিনয়-নির্দেশক সেগুলি রক্ষিত হইল।

চিরকুমার-সভা সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

আমি নানাপ্রকার ছুতোর নানাপ্রকার কুঁড়েমি করে অবশেষে কাল বৈকালে চিরকুমার সভায় হস্তক্ষেপ করেছি— আজ বৈকালে সমাধা করার আশা করচি। অবশ্য চিরসমাধা নয়— কেবল আশ্বিনের কিস্তি।...২৮শে শ্রাবণ [১৩০৭] —চিঠিপত্র ৮। পৃ ১১৮

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল্‌ আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণ বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্ম্মলাও তথৈবচ— এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে

বটে। কিন্তু কোন রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে রকম প্রতীয়মান সেরকম ভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল্ মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে। আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপরবিরোধী ভাবে না দেখে উপায়-পাইনে— কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং কাব্যে যদিচ কোন কোন রিয়াল্ লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছ-সারল্যের ছায়া আছে এবং নির্ম্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে— কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোই নয়। [আশ্বিন ১৩০৭]

—চিঠিপত্র ৮। পৃ ১৩৫-৩৬

কাল চিরকুমারসভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি··· ১১ই চৈত্র ১৩০৭।

—চিঠিপত্র ৮। পৃ ১৬৮

চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল··· যেমন করে হোক্ শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুনলুম্ শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসচে— তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে। সকল সময়ে কি মেজাজ ঠিক থাকে ? চৈত্রের কুমারসভা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেচ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শমতে ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্ত্তন করে দেবার চেষ্টা করব। বৈশাখে কুমারসভার উপসংহারটা পড়ে তোমাদের কি রকম লাগে জান্‌বার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে। নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবল মাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি— মনের সে অবস্থায় কখনো রসনিঃসারণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েচে কি না নিজে বুঝতে পারচি নে। একবার সমস্ত জিনিসটা একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে ওর পরিমাণ সামঞ্জস্য বিচার করা যায়— সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে। [? চৈত্র, ১৩০৭]

—চিঠিপত্র ৮। পৃ ১৭৬

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে চিরকুমার-সভা ইংরেজি করার বিষয় লিখিলে, রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে তাঁহাকে লেখেন—

আমার মনে হয় চিরকুমার-সভার ইংরেজি করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাংলাদেশে শ্যালী-ভগ্নীপতির সম্বন্ধ অনন্যসাধারণ, এমন-কি ভারতের অন্যত্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে।···হয়তো এ সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করে দিলে জিনিসটা কৌতুকাবহ হতেও পারে। আমাদের দেশের একজন সাহিত্য-অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন আমার লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই, দৃষ্টান্তস্থলে চিরকুমার-সভারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গীতিকাব্যলেখকদের কলম হাসতে ও হাসাতে পারে না। অতএব, সাবধান হবেন। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫

—প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৮

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ মজুমদার এজেন্সি হইতে গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১ আশ্বিন ১৩০৭ ; দ্বিতীয় খণ্ড, 'গল্প' নামে, প্রকাশিত হয় ১৯০১ খৃস্টাব্দে।

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে প্রকাশিত 'গিন্নি' গল্পটি অন্যান্য কয়েকটি গল্পের সহিত প্রথম গল্পগুচ্ছে

বাদ পড়ে, যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) বইটিতে উহা ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯০৮-১৯০৯ খৃস্টাব্দে পাঁচ ভাগে প্রকাশিত ইন্ডিয়ান প্রেসের গল্পগুচ্ছেও উহা বর্জিত ছিল। বিশ্বভারতী সংস্করণ গল্পগুচ্ছের (শ্রাবণ ১৩৩৩) প্রথম খণ্ডে গল্পটি পুনরায় সন্নিবিষ্ট হয়।

১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি পত্রে[১৮] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

"সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।[১৯]...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে মুদ্রিত গল্প-ছয়টি হিতবাদীতে সম্ভবতঃ প্রথম ছয় সপ্তাহে বাহির হয়।

পোস্টমাস্টার গল্পটি সম্পর্কে সাজাদপুর হইতে ২৯ জুন ১৮৯২ তারিখে লেখা একটি পত্র 'ছিন্নপত্র' হইতে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল:

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেন্ট্ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল, তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানা রকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ-একটু হাস্যরসও আছে।"

এই প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের সাজাদপুর হইতে লেখা ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ তারিখের চিঠিটিও দ্রষ্টব্য।

'গিন্নি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের সহিত 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত 'নর্মাল স্কুল' এর জনৈক শিক্ষকের নিম্নোদ্ধৃত চিত্রটি তুলনীয়:

"ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।... শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐ কথাটা মনে-মনে আলোচনা করিতাম, তাহা আজও আমার মনে আছে।"

হিতবাদী পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতা-বশতঃ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গল্পগুলির পাঠ প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' ও গল্পগুচ্ছের পূর্বসংস্করণগুলির সাহায্যে সংশোধিত হইয়াছে।

রচনাবলীর এই খণ্ডে সংকলিত নিম্নলিখিত পাঁচটি গল্প ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ-চৈত্র এই পাঁচ মাসে সাধনা মাসিক পত্রে প্রথম প্রকাশলাভ করে। বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক রচনার শেষে সাধনায় প্রকাশের কাল মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮ দ্রষ্টব্য, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮।

১৯ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মে মাসের শেষ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ ও কঙ্কাল 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ভাগে (১৩০১) এবং দালিয়া ও মুক্তির উপায় 'বিচিত্র গল্প' দ্বিতীয় ভাগে (১৩০১) সংকলিত হয় ; গ্রন্থমধ্যে সেই উহাদের প্রথম প্রচার।

'মুক্তির উপায়' গল্প অবলম্বনে লিখিত ঐ নামের নাটক 'অলকা' (আশ্বিন ১৩৪৫) মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মুক্তির উপায় নাটক প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ষড়বিংশ খণ্ডে (সুলভ সংস্করণ ত্রয়োদশ খণ্ডে) সংকলিত।

প্রচলিত চতুর্থ খণ্ড তথা অখণ্ড গল্পগুচ্ছের শেষে অন্যান্য বহু তথ্য সংকলিত।

শান্তিনিকেতন

বর্তমান খণ্ডে শান্তিনিকেতন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনুসারে একাদশ খণ্ড হইতে সপ্তদশ খণ্ড মুদ্রণের ফলে এই রচনাপর্যায় সমাপ্ত হইল।

শান্তিনিকেতন ১৯০৯ হইতে ১৯১৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছোটো ছোটো পুস্তিকার আকারে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ সালের মাঘ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ও অন্যত্র নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষণের তারিখও মুদ্রিত আছে। রচনাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল সব সময়ে পাওয়া যায় না ; যে-সকল ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে (প্রবাসী, ভারতী অথবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়) তাহা রচনাশেষে স্বতন্ত্র ছত্রে সংকলিত হইল। বর্তমানে প্রচলিত দ্বিতীয়-খণ্ড শান্তিনিকেতনের গ্রন্থপরিচয়ে গ্রন্থ সংকলিত রচনা সম্পর্কে নানা তথ্য ও প্রথমমুদ্রণপঞ্জী মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক 'সংশোধিত ও নির্বাচিত' যে বিশ্বভারতী-সংস্করণ শান্তিনিকেতন ১৩৪১-৪২ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তাহাতে অন্যান্য খণ্ডের কয়েকটি উপদেশের সহিত একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডের 'দুর্লভ', 'মাতৃশ্রাদ্ধ', 'সামঞ্জস্য'— এই তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান এবং 'জাগরণ'-এর শেষার্ধ বর্জিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত 'আত্মবোধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নির্মলচন্দ্র দে'কে একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন—

আত্মবোধ প্রবন্ধটা এখানে আমার সম্মুখে নাই, এইজন্য আপনারা যে বিশেষ অংশটির কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। আত্মবোধের শেষভাগে আমি এই কথা বলিয়াছি, যে, ব্রহ্মের প্রকাশ সর্বত্রই পরিপূর্ণ— কেবল মানবের ইচ্ছার মধ্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে ইচ্ছার ধর্মই লোপ হইত। 'হাঁ' ও 'না' দুই না থাকিলে ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। যেখানে 'না' বলিবার সম্ভাবনামাত্র নাই, একেবারেই 'হাঁ', সেখানে অন্ধ শাসন ; সেখানে প্রেম নাই, ইচ্ছা নাই। যেমন জড় প্রকৃতি— সেখানে যাহা না ঘটিলে নয় তাহাই ঘটিতেছে ; অতএব সেখানে ঈশ্বরের নিয়ম প্রকাশ পাইতেছে, প্রেম প্রকাশ পাইতেছে না। প্রেম প্রেমকে চায়, ইচ্ছা ইচ্ছাকে চায়। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে 'না'কে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া যখন তিনি 'হাঁ'কে জয় করেন তখনই আমাদের ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া যখন তাঁহার ইচ্ছাকে স্বীকার করি তখনই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মিলন হয়। সুতরাং ইহার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। একসময় আমাদের যে প্রেম তাঁহাকে চায় নাই, কেবল বিষয়ের রাজ্যে ঘুরিয়াছিল, সেই প্রেম যখন তাঁহাকে চায় তখন তাঁহার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার মিলন হয় ; তখনই আমার প্রেম তাঁহার প্রেমকে উপলব্ধি করে এবং চতুর্দিকে প্রকাশ করে। অতএব মানবাত্মার ইচ্ছার মধ্যে পরমাত্মার ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ জগতে আর কোথাও দেখিতে পাই না, কেবল ভক্তের জীবনে দেখি। এ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে পরিপূর্ণমাত্রায় পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে জীবাত্মার ইচ্ছার একান্ত

যোগ দেখা যায় নাই ; কোথাও বা জ্ঞান প্রবল, কর্ম প্রবল নহে— কোথাও বা অন্যরূপ। কিন্তু, এই আদর্শ যে অসম্ভব তাহা নহে। বিশ্বমানবের চিত্তে এই ইচ্ছাই গূঢ়ভাবে নিয়ত কাজ করিতেছে— সে তাঁহাকে আপনার সকল দিয়া উপলব্ধি করিবে ইহাই তাহার সাধনা। মানুষ আপনার বুদ্ধি প্রীতি ও শক্তি এই তিন পাত্র পূর্ণ করিয়া ভরিয়া তাঁহার অমৃত পান করিবে, এই পরম ইচ্ছাটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যেই আছে ; ক্রমশ এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া উঠাই প্রেমের লীলা, এই লীলা কখনোই শেষ হইয়া যাইতে পারে না— কিন্তু, তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে, এই লীলা কোনো কালে আরম্ভ হইতেও পারে না, অনন্তকাল উহা দূরেই থাকিয়া যাইবে। বাধা-ব্যবধানের ভিতর দিয়া দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা চলিতেছে ; তাহারই মহা আনন্দের রূপ আমরা ভক্তের জীবনের মধ্যে দেখিতে পাই। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, শিলাইদা, নদিয়া।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

সুলভ সংস্করণ

